ভূমিকা

নানা সময়ে নানা বারমাসিকে বাংলা ভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এখানে কয়েকটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হইল। পাঠকের উপকারে আসিলে আমার রচনা সার্থক হইবে। ইতি—

বাঁকুড়া

১৩৬৩।আষাঢ়

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

সূচীপত্র

কি লিখি ?

ইং ১৮৭৭ সালে ৺শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী এক ইংরেজী প্রবন্ধে কথিত ও লিখিত বাংলা ভাষার প্রভেদ দেখাইয়াছিলেন। তাহার সার মর্ম, আমরা যে ভাষা কই, সে ভাষা লিখি না; যে ভাষা লিখি, সে ভাষা পড়ি না। যেমন, আমরা কই ক-র্‌র্যে, খে-য়ে; লিখি ক-রি-য়া, খা-ই-য়া। আমরা লিখি য-দি, ধা-ন্য, পড়ি জো-দি, ধা-ন্ন ইত্যাদি। বাংলা শব্দ থাকিতে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিশেষ আপত্তি ছিল। উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "অনেক স্থলে তিনি [শ্যামাচরণ বাবু] কিছু বেশী গিয়াছেন।" বহুকাল পরে কেহ "সাধুভাষা বনাম চল্‌তি ভাষা"র বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে বিবাদ নাই সেখানে আর নিষ্পত্তি কি? বাদ-প্রতিবাদের নামও ঠিক হয় নাই। কারণ সাধুভাষা,—যে ভাষা সাধু কি-না সজ্জনে বলে; চল্‌তি ভাষা,—যে ভাষা চলিতেছে। এ দুয়ের বিবাদ স্বাভাবিক নয়। 'সাধুভাষা' যে ভাষা ভদ্রলোকে লেখেন, আর 'চল্‌তি ভাষা' যে ভাষা কহেন, এরূপ অর্থ করিলেও নাম ঠিক হয় নাই। চল্‌তি ভাষা অসাধু নয়, সংস্কৃত-বর্জিত নয়।

আমি মৎকৃত ব্যাকরণে 'লিখিত' ও 'কথিত', এই দুই নাম করিয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ দেখাইয়াছি। কেহ কেহ 'লেখ্য' ও 'কথ্য' বলিয়াছেন। কিন্তু এই দুই নাম অপেক্ষা 'লিখিত' ও 'কথিত' স্পষ্টার্থ। আরও স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত এখানে লৈখিক ও মৌখিক, এই দুই নাম করিতে যাইতেছি।

লৈখিক ও মৌখিক ভাষার বিশেষ

লৈখিক ভাষায় প্রবন্ধ রচিত হইয়া থাকে। লৈখিক ভাষা, বহুজন-স্বীকৃত ভাষা। মৌখিক ভাষায় রচিত হইতে পারে না, তাহা নহে। দুইটিকে পৃথক্ ভাষা বলা অন্যায়। লৈখিক ভাষায় ক্রিয়াপদ দীর্ঘরূপে লেখা হয়, মৌখিক ভাষায় হ্রস্বরূপ। যেমন, 'করিয়াছি,' 'লিখিতে-ছিলাম' স্থলে 'করেছি, 'লিখ্‌ছিলাম'। কয়েকটা সর্বনাম পদেও দীর্ঘ ও হ্রস্বরূপ আছে। যেমন, 'আমাদিগের'—'আমাদের,' 'তাহাদিগকে' 'তাদিকে'। বর্তমান লৈখিক ভাষায় সর্বনাম পদের মধ্যস্থিত 'গ' ও 'হ' লোপ করা হইতেছে। অতএব কেবল ক্রিয়াপদে উভয় ভাষায় কিছু ভেদ আছে। ব্যাকরণের অন্যপদে নাই। কিন্তু শব্দের উচ্চারণে দুই ভাষায় বহু ভেদ আছে। এ বিষয় পরে বলিতেছি।

মৌখিক ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে বাধা কি ?

অনেক কাল যাবৎ এই তর্ক চলিয়া আসিতেছে। অধিকাংশ তর্ক যেমন হইয়া থাকে, এখানেও তেমন। গোড়া বাঁধনি না করিয়া তর্ক। প্রথমে "সাহিত্য" নামের অর্থ জানা চাই। দ্বিতীয়ে, "মৌখিক ভাষা" ইহার লক্ষণ চাই। দুই-ই উহ্য রাখিয়া দুইপক্ষ স্বচ্ছন্দে কথা কাটা-কাটি করিয়া আসিতেছেন, তর্কের মীমাংসা দূরে পড়িয়া আছে। "সাহিত্য" শব্দের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিত অর্ধপথে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এক একজন এক এক অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ঠিক, "সাহিত্য" অবশ্য লৈখিক ও স্থায়ী। কেহ উড়া কথাকে সাহিত্য বলিবেন না; যে রচনায় স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই, সেটা সাহিত্য বলিবেন না। অভিধেয় অনুসারে ইহার তিন ভাগ করা যাইতে পারে। (১) জ্ঞান-সাহিত্য, (২) ক্রিয়া-সাহিত্য, (৩) ইচ্ছা-সাহিত্য। যে রচনায় পাঠকের অন্ত-জ্ঞান-বৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা জ্ঞান-সাহিত্য।

যেমন দর্শন। কর্ম শিখাইবার অভিপ্রায়ে যে উপদেশ, সে উপদেশ ক্রিয়া-সাহিত্য। যেমন, ইতিহাস, বিগ্যা ও কলা। যাহাতে মিথ্যা সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের চিত্তবিনোদন হয়, সেটা ইচ্ছা-সাহিত্য। যেমন উপকথা, নাটক। প্রাচীন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিন ভাগ ধরিলে জ্ঞান-সাহিত্য সাত্ত্বিক, ক্রিয়া-সাহিত্য রাজসিক, ইচ্ছা-সাহিত্য তামসিক। ইচ্ছা-সাহিত্য রস-প্রধান। এই হেতু ইহাকে রস-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। যে রচনায় তিন গুণের একটাও থাকে না, সেটা টিকিতে পারে না, সাহিত্যও নয়। অধিকাংশ সাহিত্য মিশ্র। কোনটায় এ গুণ অধিক, কোনটায় অন্য গুণ অধিক। গুণের মধ্যে রূপও ধরিতেছি। রচনায় মাধুর্য না থাকিলে লোকে পড়ে না।

এখন মূল প্রশ্নে আসি। মৌখিক ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে পারে কি না। ইহার উত্তর,—পারে, পারে না। মৌখিক ভাষা অসাধু ভাষা নয়, অশ্লীল ও অশিষ্ট ভাষা নয়। কিন্তু বিবাদের হেতু এখানে নয়। মৌখিক ভাষা মানুষের মুখের ভাষা, মাতৃভাষা। কোন্ মানুষের মাতৃভাষা? যোজনান্তে ভাষা ভেদ হয়। এখন যোজনান্তে না হউক, তিন চারি যোজনান্তে হয়। ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর শব্দে কিছু ভেদ আছে, অর্থাৎ মৌখিক ভাষা অ-স্থির, দেশকালপাত্র অনুসারে বিভিন্ন। লেখক মাত্রেই তাঁহার রচনার স্থায়িত্ব ইচ্ছা করেন; শুধু স্থায়িত্ব নয়, তাহা বহুজনাদৃত, দেখিতে ইচ্ছা করেন। মৌখিক ভাষার সে সম্ভাবনা নাই। কারণ উহা অ-স্থির ও ভেদ-বহুল।

একটা উদাহরণ দিই। একবার আমি চট্টগ্রামে মাস দুই ছিলাম। দেখিতাম, যখন চট্টগ্রামবাসী পরস্পর কথা কহিতেন, আমি তাঁহাদের কথা বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতাম না। আমার সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহারা আমার জানা ভাষায় কহিতেন। আর এক ঘটনা বলি। একদিন বৈকালে আমার এক ঢাকা-নিবাসী বন্ধুর সহিত কর্ণফুলী নদীর ধারে

বেড়াইতে বেড়াইতে মনে করিলাম, একখান পান্‌সীতে—সেখানে বলে শাম্পান—চড়িয়া একটা খালে ঢুকিয়া কিছু দূর যাই, আশে পাশের বন জঙ্গল দেখার ইচ্ছা। সেখানে শতাবধি শাম্পান লইয়া মাঝী অনেক আসিয়া জুটিল। আমাদিকে লইয়া যাইতে পারিবে কি না, কত বেতন লইবে, এই জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না, শাম্পান-যাত্রাও হইল না, 'বেকুব' হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিবেন না, মাঝী অশিক্ষিত মুসলমান বলিয়া আমরা 'বেকুব' হইয়াছিলাম। একবার উত্তর রাঢ়ের (কাটোয়া-বাসী) উচ্চশিক্ষিত বন্ধুর সহিত এক বিস্তীর্ণ নদীর তীরে কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, "নদীর পার দেখা যাচ্ছে।" "পার ?" "পা-া-র"। বহু কষ্টে বুঝিলাম পা-ড়। তাঁহার মৌখিক ভাষায় পা-র, লৈখিক ভাষায় পা-ড়। অনেকে জানেন, বর্দ্ধমানে 'গুড়-মুড়ি' পাওয়া যায় না, পাওয়া য়ায় 'গুর-মুরি'। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়াবিভক্তি নয়, শব্দেরও প্রভেদ আছে। নারীকে ও-লো না বলিয়া ও ট্যা সম্বোধন বিচিত্র ঠেকে। যাঁহারা মৌখিক ভাষায় সাহিত্য-রচনার পক্ষে, তাঁহাদের যুক্তি বুঝি। মৌখিক ভাষা জীবন্ত ভাষা, বক্তার প্রাণের ভাষা। লৈখিক ভাষা কৃত্রিম। ইহার উত্তরে বলি, কৃত্রিমতা বর্জন করিয়া বৃহৎ সমাজের অন্তর্গত থাকা অসম্ভব। অপর সহস্র ব্যাপারে অন্যের মন যোগাইয়া চলিতে হয়; কথাবার্ত্তায়, বসন ভূষণে, আমাদের স্বাধীনতা নাই, ভাষাতেও নাই। পাঠক যে ভাষা সহজে বুঝিবেন, লেখককে সে ভাষায় লিখিতে হইবে, বক্তৃতায় সে ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি না করেন, লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

যখন দেশ ও পাত্র ভেদে মৌখিক ভাষার ভেদ আছে, তখন কোন্ দেশের কোন্ পাত্রের ভাষা আদর্শ ধরা যাইবে ? বাদী বলিয়াছেন, কলিকাতার মৌখিক ভাষা সে আদর্শ।

কথাটা ঠিক নয়। কলিকাতার ভাষা বলিয়া একটা ভাষা নাই। কলিকাতা নানাস্থানের নানা বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র বটে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে বুঝি, সকলের পক্ষে বাইরের ভাষা ও ভিতরের ভাষা এক নয়। অর্থাৎ বাহির বলিয়া এক ভেদ আছে। কাহারও পক্ষে সেটা কৃত্রিম, কাহারও পক্ষে অকৃত্রিম।

তবে দাঁড়াইল এই, যাহাদের পক্ষে অকৃত্রিম অর্থাৎ মাতৃভাষা, সেই অল্প সংখ্যক লোকের ভাষা আদর্শ করিতে হইবে। এখানেও অল্প-স্বল্প ভেদ আছে। শব্দের উচ্চারণে ভেদ আছে। এক এক ভদ্রবংশে 'শ' নাই; সব 'স'। এক এক ভদ্রবংশে ঙ্গ নাই; সব ঁ। ইত্যাদি। শব্দেও ভেদ আছে। 'দিদিমণি', 'কথাখানার ভাবখানা' হইতে 'গানখানা', শুনিলে অনেকস্থলে মেয়েরাও কলিকাতার নগরালীর খোঁটা দেয়। কেহ বলে, 'ছিলাম', কেহ 'ছিলেম', কেহ 'ছিলুম', কেহবা 'ছিনু'। অসংখ্য লোক 'ছেল' বলে।

জাত্যভাষা এক স্থানীয় ভাষা

যত মানুষ তত কণ্ঠ, তত মন, ভাষাও তত বলিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা অন্ধকারে কিংবা দূর হইতে কথা শুনিয়া লোক চিনিতে পারি। বামাকণ্ঠ কি পুরুষকণ্ঠ, সে প্রভেদ ব্যতীত আরও অনেক বিশেষ থাকে, তদ্দ্বারা আমরা চিনিতে পারি। এক একজন এত দ্রুত কথা বলে যেন ঝড় বহিতে থাকে, পদের পরে পরে বিরাম থাকে না, বর্ণের পরে পরেও থাকে না। হাতের লেখার ছাঁদ সকলের সমান হয় না, হইতে পারে না। কিন্তু আমরা বিশেষ ছাড়িয়া মুখ্যরূপ দেখিয়া পরের লেখা পড়িয়া থাকি। সেইরূপ, বহুজনপদবাসী বহুজনের ভাষা অবিকল এক হয় না, হইতে পারে না। যে রূপ সকলে চেনে, মানে, সে রূপই

তাহাদের ভাষা। ইহাকে জাত্যভাষা বলিতেছি। সেটা সকল প্রভেদের মধ্যম নিষ্পত্তি নয়, কোনও এক স্থানের ভাষা। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গের ভাষা মিশিয়া বাঙ্গালা ভাষা নয়, কোনও এক স্থানের চলিত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি। সে স্থান, দক্ষিণ রাঢ়।

রাঢ় বলিতে ভাগীরথীর পশ্চিমস্থিত নদীমাতৃক ভূ-ভাগ বুঝায়। ইহার পূর্বসীমা ভাগীরথী, পশ্চিমসীমা দ্বারকেশ্বর, বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের মাঝদিয়া উত্তর দক্ষিণ এক রেখা করিলে এই রেখার পূর্বে রাঢ় দেশ। রাঢ়েও দুই-ভাগ আছে, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। বর্দ্ধমান ও কালনা দিয়া এক রেখা করিলে সে রেখার উত্তরে উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণে দক্ষিণ-রাঢ়। ভাষা শুনিয়া দক্ষিণ রাঢ়ও দুই ভাগ করিতে পারা যায়। পূর্বে ও দক্ষিণে ভাগীরথী, পশ্চিমে দামোদর। এই ভূ-ভাগ পূর্বকূল। পূর্বে দামোদর, পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর, এই ভূ-ভাগ পশ্চিমকূল। চিত্র দ্বারা মোটামুটি দেখাইতেছি। এই দে দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমকূল, ইহা বর্তমান হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ লইয়া কতকটা দেশ। মংকৃত ব্যাকরণে এই দেশকে মধ্যরাঢ় বলিয়াছি, এবং এই দেশের প্রচলিত শব্দ লইয়া "বাঙ্গালা শব্দকোশ" করিয়াছি। এইটি দক্ষিণ-রাঢ় ছিল, এখন দক্ষিণে গঙ্গা পর্য্যন্ত দক্ষিণ রাঢ় বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সে দিনকার হাওড়া দক্ষিণ-রাঢ়ের দক্ষিণের সীমা হইয়াছে। আমি মনে করি, মধ্য-রাঢ়ের চলিত অর্থাৎ মৌখিক ভাষাই জাত্যভাষা। আমি 'আদর্শ' বলিতেছি না, বলিতেছি প্রকৃতি (type)।

কেন বলিতেছি? ( ) এই অঞ্চলের শিক্ষিত অশিক্ষিতের, উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর, সকলের এক ভাষা। বঙ্গের অন্য কুত্রাপি এই লক্ষণ পাওয়া যাইবে না। যাহাঁদের কান আছে, মৌখিক ভাষা লক্ষ্য করিবার অভ্যাস আছে, তাহাঁরা চমৎকৃত হইবেন। এখানকার নারী-ভাষার শব্দে কয়েকটা প্রভেদ আছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য না করিলে ধরা

পড়িবে না। (২) জাত্যভাষার সহিত এই অঞ্চলের মৌখিক ভাষা মিলাইলে, শব্দে ও ব্যাকরণে, দুই ভাষা প্রায় এক বোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাঁর কৃত বাল-পাঠ্য পুস্তকে এই অঞ্চলের ভাষা লিখিয়াছেন, শুদ্ধ করেন নাই। তাঁহার পিতৃভূমি মলয়পুর, আরামবাগের ৭।৮ মাইল পূ-পূ-উত্তরে, দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের প্রায় মাঝে। বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার মাতুলালয় ছিল, এবং সে-খানেই তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন। মলয়পুরের ও বীরসিংহের ভাষার শব্দে একটু প্রভেদ আছে। কিন্তু তিনি মলয়পুর অঞ্চলের ভাষা লিখিয়াছিলেন। উত্তরে ঘনরাম, পূর্বে ভারতচন্দ্র, দক্ষিণে রামমোহন, পশ্চিমে মাণিকরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ইহাঁদের রচিত বই পড়িলেই ভাষার উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ভাষার ভাল মন্দ বলিলে বুঝি, জাত্যভাষার, মান্য ও আদরণীয় ভাষার তুলনায় ভাল কিম্বা মন্দ। অর্থাৎ প্রকৃতির বিকৃতি (variation from the type) তুলনা করি।

যাহাকে কলিকাতার ভাষা, রাজধানীর ভাষা বলি, এবং যাহাকে বিজ্ঞ জনে আদর্শ করিতে বলিয়া থাকেন, সে ভাষা মূলে এই মধ্য রাঢ়ের ভাষা। তাহাতে দুই পাঁচটা নূতন শাখা গজাইয়াছে। কিন্তু সে শাখা বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ নয়, নদীয়া জেলার ও হিন্দীর উড়া পাতা শাখায় জড়াইয়া গিয়াছে। সে সকল শব্দ না পাইলে ভাষা শুদ্ধ থাকিত।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বুঝি-বা বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল-পাঠ্য বই লিখিয়া তাঁহার দেশের ভাষা চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেটা ভুল, তিনি ভাষা গড়েন নাই, যেমন পাইয়াছিলেন, তেমন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ক-রি-বে-ক রাখিয়া গিয়াছেন, ক-রি-বে করেন নাই। ই-বে-ক, ই-লে-ক এখনও তাঁহার মাতুলালয়ের দিকে চলিতেছে। রামমোহন রায়ের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেশে এক

'না' প্রয়োগ আছে, সেটার অর্থ 'নাই'। "তাকে চিঠি লিখি না" অর্থাৎ "লিখি নাই"। কেমনে অতীত ও বর্তমান কালে প্রভেদ রাখা হয়, অনুসন্ধান করি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দ্ব্যর্থ 'না' বর্জন করিয়া তাঁহার পিতৃভূমির মানরক্ষা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ রাঢ়ের গরিমা নূতন নয়। প্রেমচন্দ্র তর্গবাগীশ শাকনাড়া নামক জন্মগ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

যস্যাভবজ্জননভূঃ কিল শাকরাঢ়া
রাঢ়াসু গাঢ়-গরিমা গুণিনাং নিবাসাৎ।

যাঁহার জন্মভূমি শাকরাঢ়া, যাহা অনেক গুণবান্ লোকের বাসহেতু রাঢ়ের মধ্যে গাঢ়গরিমা হইয়াছে। এই শাকনাড়া বর্দ্ধমান জেলায় রায়না থানার অন্তর্গত, দামোদর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে। তর্কবাগীশ মহাশয় ইং ১৮০৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের কিছু দক্ষিণে এবং দামোদরের পশ্চিমে কবিকঙ্কণের দামিন্যাগ্রাম। কিন্ত ইহাঁর বহুপূর্বে (১২শ খ্রীষ্ট শতাব্দে) শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রকৃত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে দক্ষিণ রাঢ়ার ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামের "দম্ভ" বলিয়াছিলেন,—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা
তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিক নাম ধাম পরমং
তত্রোত্তমো নঃ পিতুঃ।

গৌড়রাষ্ট্র অনুত্তম (excellent) বটে, কিন্তু সে রাষ্ট্রের রাঢ়া পুরী অতুলনীয়া। তাহার মধ্যে ভূমিশ্রেষ্ঠী গ্রাম উৎ-তম। ভূরি বহু শ্রেষ্ঠী বণিকের বাস হেতু ভূরিশ্রেষ্ঠী। বর্তমানে ভূরসুট এক পরগণার নাম। এখানে রায় গুণাকরের জন্ম হইয়াছিল। এই গ্রাম হুগলী জেলায় দামোদরের পশ্চিম কূলে। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র 'রাঢ়াভূমি' না লিখিয়া 'রাঢ়াপুরী' লিখিয়াছেন। পুরী অর্থে নগর বুঝায়। কোন্ রাজার নগর ?

শ্রীকৃষ্ণমিশ্রেরও পূর্বে ইং দশম শতাব্দে "ন্যায়কন্দলী" প্রণেতা শ্রীধর, ভূরিশ্রেষ্ঠী ভূরিস্মৃষ্টি গ্রাম অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

আসীদ্ দক্ষিণ-রাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মনাম।
ভূরিস্মৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠি জনাশ্রয়ঃ॥

কোন্ রাজার আশ্রয়ে দক্ষিণরাঢ়া গুণিগণের নিবাস-ভূমি হইয়াছিল, তাহা অজ্ঞাত।

ব্রাহ্মণেরা যেখানে সেখানে বাস করিতেন না। সেকালে বাস্তুর উপযোগী ভূমিরও অভাব ছিল না। বাস্তুভূমি উত্তর-প্লব কিংবা পূর্ব-প্লব হইবে অর্থাৎ উত্তর কিম্বা পূর্বদিকে ঢালু হইবে; উচ্চ হইবে (এই হেতু ব্রহ্মডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাসের তুঙ্গভূমি); মৃত্তিকা কঙ্করবর্জিত কোমল হইবে; উর্বরা হইবে; নিকটে বৈশ্যবাস থাকিবে ও নীচ জাতির বাস দূরে হইবে; নিকটে নদী থাকিবে; এইরূপ কতকগুলি বাঁধা নিয়ম ছিল। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামক আর্য জাতি রাঢে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এইরূপ দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে পাইয়াছিলেন। এখানেই বঙ্গের আদি ব্রাহ্মণ, সপ্ত-শতী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। দেশটির শোভা দেখিয়া নাম দিয়াছিলেন সুহ্ম। 'রাঢ়া' নামেরও সেই অর্থ, শোভা। পূর্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে বিস্তীর্ণ পলিভূমি। কিন্তু তখন দেশটি কিছু নীচু ছিল। এখন কাটোয়া ৩২ ফুট উচু। বোধহয় তখন ১০।১৫ ফুট মাত্র ছিল। ব্রাহ্মণেরা দ্বীপ দেখিয়া বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণে বাড়িতে বাড়িতে ত্রিবেণী শেষ সীমা করিয়াছিলেন। ত্রিবেণী, দক্ষিণ প্রয়াগ, পুণ্যস্থান। ইহারই কিছু দক্ষিণে সাগরসঙ্গম ছিল। মগরা নাম ও মগরার মোটা বালি দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়। দামোদর পুরাতন পূর্ব্বপথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণগামী হইয়াছে। দ্বারকেশ্বরও সেইরূপ বাঁকিয়া দক্ষিণগামী হইয়াছে। এই দক্ষিণবাহী দামোদরের পশ্চিমকূল, ভাগীরথীর পশ্চিমকূলের সদৃশ। গঙ্গা

নাই, এই দুঃখ। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে বরং উত্তম। দামোদরের পলির তুল্য উর্বরা মৃত্তিকা বিরল। আর্যবংশধরেরা এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ফলে আর্য-কৃষ্টির দেশ দুই স্থানে বিভক্ত হইয়া পড়িল। নবদ্বীপ লইয়া দেশের খ্যাতি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমে দক্ষিণ রাঢ়ের খ্যাতিও বৃদ্ধি হইতে থাকিল। বোধ হয় বাঙ্গালাভাষা দক্ষিণ রাঢ়ে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল। রাজা মানসিংহের সময় পর্যন্ত দক্ষিণ রাঢ় হিন্দুরাজার অধীন ছিল। ভাষার শুদ্ধি ও সমতা রক্ষার পক্ষে ইহা বিশেষ কারণ হইয়াছিল। উত্তর-রাঢ়ে এই সুবিধা ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সে দেশের সকল কবির ভাষা সমান নয়। লোচনদাসের "চৈতন্য মঙ্গল" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে বর্দ্ধমান জেলার ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলের ইং ষোড়শ শতাব্দের বাঙ্গালা ভাষা আছে। কিন্তু দুই ভাষার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। এই শতাব্দের সপ্তগ্রাম-নিবাসী মাধবাচার্যের ও দামিন্যা-বাসী মুকুন্দরামের চণ্ডীর ভাষায় প্রভেদ নাই বলিলেই হয়।

পূর্বে লিখিয়াছি, এখন দক্ষিণ রাঢ় দক্ষিণে বাড়িয়া হাওড়ায় গিয়া ঠেকিয়াছে। এখন যেখানে হাওড়া, পূর্বে সেখানে গঙ্গার একটা হাওর ছিল। হাওর, সাগর অর্থাৎ বিস্তীর্ণ জলরাশি। কিন্তু এই দক্ষিণ ভাগ অধিক পূর্বে বাসযোগ্য ছিল না। হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, বালি প্রভৃতি সেদিনকার। সে সব অঞ্চলে নানা দেশের লোক গিয়া বাস করিয়াছে, ভাষায় উচ্চনীচ ভেদ রহিয়াছে। দুই একশত বৎসর না গেলে এক হইবে না। হুগলীর শিক্ষিত লোকেও বলেন, তা-দে-ঘ-রে, অর্থাৎ তা-দি-কে। নদীয়ায় তা-দে-র। এই তা-দে-র সম্বন্ধপদ কি কর্মপদ, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তখন কর্মপদ বুঝাইতে তা-দের-কে বলিতে হয়।

স্থান নির্ণয়ের প্রয়োজন কি ?

প্রয়োজন দুইটি। (১) কলিকাতার ভাষার শব্দ সংগ্রহ হয় নাই। সংগ্রহ হইলে দেখা যাইবে, শব্দ অল্প, তদ্দ্বারা নগরবাসীর কাজ চলিবে, গ্রামবাসীর চলিবে না। কলিকাতায় মাঠ কই? অগণ্য গাছপালা, জীবজন্তু কই? দেশে যে বিপুল কৃষিকর্ম চলিতেছে, তাহার একটি শব্দও পাওয়া যাইবে না। এইরূপ অন্যান্য ক্রিয়াসাহিত্যের শব্দের অভাব হইবে। কোন্‌টি জাত্য, ইহা না জানিয়া লেখক হাতড়াইয়া বেড়ান, কিম্বা নিজের গ্রামের প্রচলিত শব্দ লেখেন। কিন্তু স্ব-স্ব স্বাধীন হইলে বাঙ্গালা ভাষা নামে ভাষাই থাকিবে না। আমি বুঝি, মাতৃভাষার তুল্য মধুর ভাষা নাই। কিন্তু কি করি, দশজনকে লইয়া সংসার। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কেমনে বাঁচিব? তাঁহাদের মন যোগাইতেই হইবে, আমি স্বাধীন হইলে আমিই ঠকিব। অতএব বছর কতক মাতৃভাষার সঙ্গে বিমাতৃ-ভাষাও শিখিতে হইবে; পরে বিমাতৃভাষাই মাতৃভাষা হইয়া যাইবে।

একটা উদাহরণ দিই। গত বৈশাখ মাসের 'পথ' নামক মাসিক পুস্তক হইতে লইতেছি। ইহাতে "জনৈক পল্লীবাসী" "পাট, খেজুর গাছ ও ইক্ষু" চাষের ক্রম ও চাষে লভ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ মূল্যবান্ মনে করি। কিন্তু সে বিচার এখানে নয়। কয়েকটা শব্দ তুলিতেছি। তিনি শব্দগুলির অর্থ দিয়াছেন, নইলে কয়েকটা বুঝিতাম না। বিঁ-দে (কৃষিযন্ত্র), হইবে বি-দে; বাস্তবিক বি-দা (সং বিদ্ধক)। বা-ই-ন, তিনি লিখিয়াছেন, গুড় পাকের চুল্লী; কিন্তু আমি বুঝি গুড়পাকের গো স্তনাকার বৃহৎ মৃৎপাত্র (সং বা-ণ)। এই অর্থ ঠিক, নইলে 'পাঁচ বাইন' 'সাত বাইন' চুলী বলা চলিত না। খেজুর কিম্বা আখের রসের গাদ, ইনি লিখিয়াছেন ম-লো।* "পল্লীবাসী" গ্রাম ও জেলার নাম দেন

* বর্তমান প্রবন্ধের বাহ্য হইলেও লিখি, পায়রার বক-বক শব্দ হইতে প-য়-ড়া নয়। শব্দটি পয়স্ (জল)+ড়া। যে গুড়ে জলের ভাগ বেশী।

নাই। এইরূপ যদি এক এক গ্রামে প্রচলিত নাম লিখিতে হয়, প্রত্যেক নামের অর্থও লিখিতে হইবে। আর এক লেখক কা-শ্যা ঘাসের আসন করিতে লিখিয়াছেন। তিনি ঠিক বানান করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য, নব্য-শিক্ষিত পড়িবেন 'কাশ্‌শা', আর আকাশ পাতাল ভাবিতে থাকিবেন।

(২) একটা জাত্য ভাষা চাই। নইলে লেখক স্বেচ্ছামত শব্দ লিখিয়া ভাষার বিপ্লব ঘটাইতে থাকিবেন। একটা উদাহরণ তুলি। উদাহরণটি যে-সে লেখনী-প্রসূত নয়। সম্প্রতি শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ" লিখিয়াছেন। এখানে প্রশংসার অবসর থাকিলে পুস্তকখানির বিলক্ষণ প্রশংসা করিতাম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকার প্রশংসার দ্বারা ধৃষ্টতা করিব না। কিন্তু দ্রষ্টব্য এই, তিনি আ-ম না লিখিয়া আঁ-ব লিখিয়াছেন। আঁ-ব বুঝি; কিন্তু "তিনি হাসিতে হাসিতে ন-গি-য়া পড়িতেন। * * তিনি অনেকবার ন-গি-য়া নগিয়া পড়িলেন।" বুঝিতে পারিলাম না। লোকে হাসিতে হাসিতে ঢ-লি-য়া পড়ে, লুটিয়া পড়ে, গ-লি-য়া পড়ে, হাঁ-ফা-ই-য়া পড়ে। কিন্তু ন-গি-য়া পড়িবার হাসি শুনি নাই। ভূমিকায় দেখিতেছি বা-র-গী। লোকে বলে "ব-র্গী-র হাঙ্গামা"। তিনি একই দ্রব্য বুঝাইতে 'চাবি কুলুপ', 'চাবি', 'তালা' লিখিয়াছেন। তাহাঁর ভাষার আরও কিছু বিশেষ আছে, পরে দেখিতেছি।

উপন্যাস হইতে উদাহরণ !

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে 'গল্প' ও 'উপন্যাস' দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বাজার ভরিয়া গিয়াছে। আমি সে বাজার ঘুরি নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনে দেখি, 'সিরিজ' চলিতেছে। কোনটায় ৫০।৬০ খানা, কোনটায়

শতাবধি। মাসিক পুস্তকে 'ছোট গল্প,' 'বড় গল্প' ও 'উপন্যাস' থাকে। একবার তিন চারি মাসের পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয়, তিন চারি পৃষ্ঠায় শেষ হইলে 'গল্প', নয় দশ পৃষ্ঠায় হইলে 'বড় গল্প,' আর শনৈরাগত বর্ষব্যাপী হইলে 'উপন্যাস'। মাসে মাসে একটু একটু পড়িতে আমার ধৈর্য থাকে না, উপন্যাস পড়াও হয় না। কিন্তু "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত ও জ্যৈষ্ঠমাসে সমাপ্ত "বিপত্তি"র শেষ দেখিতে ধৈর্য ছিল, তিন চারি মাস পড়িয়াছি। ইহার লেখক শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া। ইহাঁর উপাধি, সরস্বতী, সার্থক হইয়াছে, "বিপত্তিতে" সরস্বতী মূর্তিমতী দেখিতেছি। ধন্য সাধনা! এমন একটানা ওজস্বীভাব ত দেখি না! সুর সপ্তমে বাঁধা, বিষাদে ভরা, কিন্তু কৃত্রিম নয়। সপ্তম হইতে পঞ্চমে নামিতে পারা যায়, কিন্তু একবারে খাদে নামিতে গেলে সুর বিকৃত হইয়া পড়ে। বিনয় নামধারী যুবকটির চপলতা বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে সে বিচারের অবসর নাই। মৌখিক ভাষার উদাহরণ নিমিত্ত "বিপত্তি" ধরিতেছি। জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষে" ৩৫ পৃষ্ঠা আছে, সাধারণ বইর আকারে ছাপিলে ৭০ পৃষ্ঠা হইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "ভূমিকা" ২৫ পৃষ্ঠা। ইহাতেও মৌখিক ভাষা আছে। "বিপত্তির ভাষা শুদ্ধ বাংলা, জাত্য বাংলা বলিতে পারি। ইহাতে বাক্যের ঘূর্ণিপাক নাই, ইংরেজীর তর্জমা নাই, খাঁটি বাংলায় বড় বড় তত্ত্বের আলোচনা আছে। লেখিকা একাগ্রমনে লিখিয়া গিয়াছেন, বোধহয় ভাষা দেখিবার মন পান নাই; কিন্তু আশ্চর্য, ব্যাকরণ ভুল নাই! অল্প রচনাই এই পরীক্ষায় পাশ হইয়া থাকে। "ভূমিকা"ও পাশ হইতে পারে নাই। শুধু পদবিন্যাসে নয়, লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের রূপে বিসম্বাদ ঘটিয়াছে। অত্যল্প জনে শাস্ত্রী মহাশয়ের তুল্য সোজা বাংলা লিখিতে পারেন, তথাপি মতান্তর ঘটিয়াছে। "বিপত্তি"র একটি স্থানে 'সিংহ'

স্থানে 'সিংহরা' হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী বাক্যে ভুল সংশোধিত হইয়াছে। বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকে 'গোরুরা,' 'গাছেরা' দেখিয়াছি।

"বিপত্তি"র কয়েকটি শব্দ পরীক্ষা করি। ঠা-কু-র্দ্দা অবশ্য ঠা-কু-র-দা-দা, সংক্ষেপে রাঢে ঠা-কু-দ্দা, নদীয়ায় ঠা-কু-র্দ্দা, তৎপূর্বে ঠা-উ-র্দ্দা। লেখিকা শব্দের মূল রূপপ্রকাশের পক্ষে। অনেক শব্দে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি রাঢের ভাষায় লিখিয়াছেন, সেই সূত্রে ঠা-কু-দ্দা লিখিলে ভাল হইত। বিশেষতঃ যখন দ-এর দ্বিত্ব হইয়াছে, তখন রেফ থাকিতে পারে না। 'গ্রা-ম্ভা-রী চালে সম্মানের পাত্র সাজা'—গ্রা-ম্ভা-রী শুনিয়াছি মনে হইতেছে। গম্ভীর নয়, স্বাভিমানী অর্থ। কিন্তু কেমনে? বিক্রম-ভারী? 'রসনা ত-ড়-পা-চ্ছে,' শুনি নাই; অর্থ, জিহ্বা লাফাচ্ছে। হিন্দী হইতে কলিকাতায় নাকি ত-ড়-পা-চ্ছে আছে। কিন্তু হিন্দী হইলেই পাঙ্‌ক্তেয় হয় না। বোধ হয় 'তল-প্রহার' হইতে; জিহ্বা তল দ্বারা প্রহার করিতেছে। রসনার তড়পানা, অশিষ্ট ভাষা। 'আজে বাজে কাজ'—'বাজে কাজ', কর্তব্য-বাহ্য কাজ বুঝি; কিন্তু আ-জে? আদ্য? প্রধান কাজ ও অপ্রধান কাজ, এই অর্থ হইতে পারে। তাহা হইলে এখানে আ-জে হইবে না, শুধু বা-জে থাকিবে। অলস লোক আ-জে বা-জে কিছুই করে না, এরূপ প্রয়োগ থাকিবার কথা। যদি না থাকে, আ-জু বেগারের কাজ, বা-জে বাহ্য কাজ, প্রয়োগ দেখিলে এই মূল মনে হয়। আ-জু-র্ শব্দ সং, প্রচলিত নয়। 'নানা-বাহানা' ছাপায় এক পদ। বা-হা-না, ছল বুঝি, কিন্তু 'নানা-বাহানা? বা-য়-না-ক্কা নারী ভাষায় স্নেহে ভর্ৎসনা। কিন্তু মূল কি? 'স্কন্ধে কাটা পেত্নী'? পেত্নীর সর্বাঙ্গ থাকে, কিন্তু দেহ শুষ্ক শীর্ণ। বা-রে-ণ্ডা, "ভূমিকা"র বা-রা-ণ্ডা ঠিক। কেহ কেহ মনে করেন, বুঝি ইংরেজী ভে-রা-ণ্ডা হইতে বা-রা-ণ্ডা, কিন্তু ঠিক উল্‌টা। কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষিতা মহিলার মুখে ভ্রে-ণ্ডা হইয়াছে। গিঁ-ট গ্রাম্য, গাঁ-ঠ

জাত্য। নইলে গাঁ-ঠরি পাই না। গাঁ-ট কাটাও আছে। হা-য়-রা-ণ হইবে হ-য়-রা-ন। "হায় হায়" বলিতে বলিতে গ্রাম্য হা-য়-রা-ণ। এইরূপ একটা জানা শব্দের উচ্চারণ বশে বালকেরা অন্য শব্দ রূপান্তরিত করিয়া ফেলে। যদি তে-র তাহা হইলে প-নে-র, স-তে-র, আ ঠে র। "বিপত্তি"তে প-নে-র, "ভূমিকায়" প-ন-র। 'রো' নাই। বা-র তেও ওকার নাই, "বিপত্তি"তে ম-তো নাই। ট-লা-ন, এ-গো-ন আছে, কিন্তু অন্য শব্দে 'নো' হইয়াছে। "ভূমিকা"য় কেবল 'নো'। "ভূমিকা"য় উ-প-র ও-প-র, ভি-ত-র ভে-ত-র আছে। "বিপত্তি তে ভি-ত-র নাই, সব ভেতর।

'নাই', 'নেই', 'না', 'নে', 'নি', এই কয়েকটির প্রয়োগ বাঙ্গালীকে শিখাইতে হয় না, কিন্তু দেশভেদে অর্থভেদ আছে। রাঢ়ে পুরুষের ভাষায় 'নাই', নারী ভাষায় 'নেই', এক সাধারণ নিয়ম। ইদানী এই প্রভেদ অস্পষ্ট হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'নেই' জানিতেন না। শব্দানুষঙ্গে নে-ই উচ্চারণের উৎপত্তি। সে (এ) নে-ই, ঘরে (এ) নে-ই। এই প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়িয়া এক এক লেখককে নে-ই-মুগ্ধ করিয়াছে। "ভূমিকা"য় না-ই, নে-ই দুই আছে, কিন্তু প্রভেদ স্পষ্ট নয়। 'বিদ্যাসাগর নেই', 'ঘর নাই', 'পুকুর নাই'। "বিপত্তি"তে 'বল্‌তে নে-ই', বিশ্বাস নে-ই, 'সন্দেহ না-ই'। 'না' স্থানে 'নে' হইবার কারণ ভিন্ন। 'ই' পরে 'আ' থাকিলে মৌখিক ভাষায় 'আ' স্থানে 'এ' হয়। 'উ' পরে 'আ' থাকিলে 'আ' স্থানে 'ও' হয়। এই দুইটি মুখ্য নিয়মে অসংখ্য শব্দের দুই দুইরূপ হইয়াছে। যেমন, চিঁড়া চিঁড়ে ("ভূমিকা য় চিঁ-ড়া), বু-ড়া বু-ড়ো। "বিপত্তি" ও "ভূমিকা"য় বু-ড়া, বু-ড়ো দুই-ই আছে। "বিপত্তি"তে পূ-জা পূ-জো, দুই-ই আছে। কিন্ত গু-লা, গুলো হয় নাই। "না" স্থানে "নে" উক্ত নিয়মে হইয়াছে। যেমন, 'আর পারি না'—'আর পারি-নে', 'বলিস্ না'—'বলিস্ নে'।

'যাস্‌নে'—এখানে যা-ই-স মনে করিয়া 'নে'। অতীতকালে 'নি', যেমন "বলি নি"—'নাই' সংক্ষেপে, কিন্তু প্রয়োগে নিশ্চিত অভাবে না-ই, সামান্য অভাবে 'নি'। 'বলি নাই', 'বলি নি', দুয়ের অর্থে প্রভেদ আছে।

দ্বিরুক্ত ধাতুশব্দ ও যুগ্মশব্দ বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পত্তি। মৌখিক ভাষায় অধিকার না থাকিলে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। এখানে পুনরুক্তি করিব না। যথাস্থানে প্রয়োগ কঠিন বটে, কিন্তু ধাতু চিন্তা করিলে প্রায় ভুল হয় না। "ভূমিকায়" 'হন্ হন্ হাঁটা', 'দর্ দর্ ঘাম'। "বিপত্তি"তে 'মাথা টন্-টন্', 'থর-থর কাঁপা', 'চোখ ঢুলু-ঢুলু', 'মিটি-মিটি, মিট্-মিট', 'প্রাণ ছট্ ফট', 'থতমত খাওয়া,' 'গ্রাম তোল-পাড়', 'হুড়-মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়া' ঠিক হইয়াছে। কিন্তু প্রদীপ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে, নিভিতে পারে না। 'দুচোখে টস্-টস করিয়া' জল পড়িতে পারে না, দু-চোখ 'হইতে' পড়িতে পারে। ভয়ে 'বুক ধড়্-ফড়' করে কি? দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতায় বুক ধড়্-পড়্ ধড়্-ফড়্ করে। অজীর্ণরোগে ধড়-ফড়্ করে; কিন্তু ব্যাকুলতা সে রোগের এক লক্ষণ। মনে হয়, এইবার বুঝি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে। ইহাতে ভয় থাকে বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা মাত্রেই ভয় নিহিত। ভয়ে বুক দুর-দুর করে, কি জানি কি ঘটে। অতি-ভয়ে বুক ঢিপ্-ঢিপ ধড়াস্-ধড়াস করিতে থাকে, যেন হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচ প্রসারণের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মচারিণী টল-মল করিতেছিলেন', এখানেও প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। ব্রহ্মচারিণী মেঝেয় বসিয়াছিলেন, যোগাভ্যাসে তাঁহার দেহ দুর্বল ও অতি লঘু হইয়াছিল, টল্‌টল করিতেছিল, অর্থাৎ 'টলিয়া পড়ে পড়ে' হইয়াছিল। 'টলি' আর 'মলি' মর্দিত করিতে গুরুভার চাই (তু° দল্-মল)। বোঝাই না থাকিলে জলের তরঙ্গে

নৌকা টল্-টল করে, বোঝাই থাকিলে টল্-মল করে। কিম্বা, স° মল ধাতু ধারণে। (ঝল্-মল শব্দে মল ধারণে।) টলি আর মলি, পড়ি আর ধরি, পড়িতে না পড়িতে স্থির হই। টল্-টল যন্ত্রবিদ্যার ভাষায় অ-স্থায়ী ভাব (unstable equilibrium), টল্-মল স্থায়ী ভাব, ভার-কেন্দ্র নড়িলেও আধারের বাহিরে যায় না, টলিতে টলিতে আপনি স্থির হয়। দ্বিরুক্ত ধাতু শব্দ এইরূপ অনেক আছে, মৎপ্রণীত কোশে দুইশত আড়াইশত আছে। বৃষ্টি কত রকম ? টপ্-টপ, তড়্-তড়, ঝম্-ঝম, ঝিম্-ঝিম, টিপ্-টিপ, ফোঁটা-ফোঁটা, ফিন্-ফিন। কবিরা ঝিম্-ঝিম্-কে রিমি-ঝিমি করিয়াছেন। বাতাস কত রকম ? শোঁ-শোঁ, ফুর্-ফুর, ঝির্-ঝির, হুল্-হুল। সাধু ভাষায় অর্থাৎ কেতাবী ভাষায় 'অল্প অল্প বৃষ্টি' কিম্বা 'মুষলধারে বৃষ্টি', এই দুইটি আছে। 'প্রবলবেগে বায়ু' কিম্বা 'মৃদু মন্দ বায়ু' এই দুই সম্বল। "বিপত্তি"র 'জপিয়ে-সপিয়ে' না 'জপিয়ে-টপিয়ে' ? স° সপ্ ধাতু সম্যক অবরোধ ; স্তুতি। 'জপিয়ে-সপিয়ে' ঠিক ; ভুলিয়ে-ভালিয়ে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। জপিয়ে-টপিয়ে লিখিলে ভাবান্তর হইত। বাংলায় সপ্ ধাতুর পৃথক প্রয়োগ পাই না। এমন আরও আছে।

চন্দ্রবিন্দু এক বিপত্তি। এটির নাম অর্ধ-অনুস্বার। কোথাও বহুল, কোথাও বিকল, কোথাও অল্প। মধ্যরাঢ়ে অল্প। কিন্তু ঘোঁড়া, খোঁকা আছে, আশ্চর্য বটে। আরও কয়েকটা আছে। সে দেশে কুঁয়ো, কঁচি, বোঁচকা, ঢেঁকুর, কুঁড়ে (অলস), আঁটি (শাগের। আমের আঁঠি), বাঁসা, হাঁসি, ঘাঁস নাই। "বিপত্তি"র ঢোঁক, বাঁখারি, শিঁটকানো নাই। খোঁ-জ এর অধানুস্বারও গ্রাম্য। গ্রাম্য কি-না জাত্য নয়। পোঁটলা-পুঁটলীও তদ্বৎ। পুঁথী, পুথী, দুই-ই জাত্য ; পুঁ-থী ছাড়িতে পারিলেই ভাল। চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগের সোজা নিয়ম নাই। বাঁকুড়া জেলা হইতে উত্তররাঢ় এবং গঙ্গার পূর্বপার চন্দ্রবিন্দুর দেশ।

চল্লিশ বৎসর হইল, ঙ্গ স্থানে ঙ প্রথম দেখা দিয়াছে। এখন নব্য-লেখকে ঙ্গ বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহাঁরা ভা-ঙ্গা না লিখিয়া ভা-ঙা লিখিতেছেন। কেন লিখিতেছেন, কেহ তাহা ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু ঙ অক্ষরের চির-প্রচলিত উচ্চারণে ভা-ঙা হয়, 'ভাঁ-ওঁ-আ'। ইহাতে ভা-ঙ্গার ধ্বনি-সাম্য কই? ঙ-অক্ষরের নামেই ইহার উচ্চারণ পাই, ওঁঅ বা উঁঅ। এই উচ্চারণ বলিয়া কাঙুর পড়ি, কা-ওঁ-উ-র। মাণিক গাঙ্গুলী,—কা-ঙ-রে কামিক্ষা চণ্ডী,—কা-ঙ-রে =কাউঁরে। ঘনরামে, ধাঙ ধাঙ ধাঙসা বাজে,—ভাঙ ভাঙ রণশিঙ্গা বাজে। এখানে ধা-ঙ কদাপি ধাং নয়, ভাঙ ভাং নয়। চৈতন্য-চরিতামৃতে, পিঙো পিঙো তভু করে,—পিঙো পিওঁ (পান কর, ঙ-তে ওকার অনাবশ্যক ছিল)। চৈতন্য-মঙ্গলে, মো যাঙ আমারে দেহ সংহতি করিয়া,—এখানে 'মো' কর্তা, ইহার স্বর তুল্য যা-ওঁ। জ্ঞানদাসে, কেন গেলাঙ জল ভরিবারে,—এখানে গে-লা-ঙ, কর্তা 'মো'। গেলাঙ—গেলাং নয়। কবি-কঙ্কণে, ভেরী বাজে ধোঙ ধোঙ। শূন্য-পুরাণে, কার্ত্তিকের সোলুঙেতে,—ষোলুঙ-এতে, ষোলউঁ-এতে, অর্থাৎ ষোড়শ দিবসে। সে কালের কবি স্ম-রি না বলিয়া সো-ঙ-রি বলিতেন। এখানে 'ম' স্থানে 'ঙ' বটে, কিন্তু উচ্চারণ সো-ওঁ-রি বা সো-উঁ-রি। এখনও গ্রাম্যজন স-ঙ-র-ণ বলে। 'ম' স্থানে 'ঙ' বলিয়া শব্দ কোমল করা হইত। যথা, জ্ঞানদাসে, ডাকে সভে সা-ঙ-লি বলিয়া,—সাঙলি সা-ওঁ-লি, শ্যামলী (গাই)। এইরূপ, কু-ঙা-র=কুমার। 'কুমার' হইতে কুমর, কু-ঙ-র, হিন্দীতে কুঁবর বাস্তবিক কু-বঁ-র। এই বঁ দেখিলেই ঙ উচ্চারণ পাওয়া যায়। জ্ঞানদাসে, রজনী সা-ঙ-ন ঘন দেয়া গরজন। সা-ঙ-ন শা-বঁ-ন, শা-ওঁ-ন। অতএব ভা-ঙা=ভা-বাঁ, ভা-ওঁ-আ।

তর্ক উঠিতে পারে, আমরা সং-খ্যা লিখি, যদিও স-ঙ্খ্যা বানান শুদ্ধ। এই রূপ, গ-ঙ্গা না লিখিয়া গং-গা লিখিতে পারি। এবং যেহেতু ং

উচ্চারণ ঙ্গ্, সেহেতু ঙ্=ং=ঙ্গ্। কিন্তু এই সমীকরণে দোষ আছে, হেতুটি ঠিক নয়। কারণ, ং, অনুস্বারের চিহ্ন, অনুস্বারে ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত থাকিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সংস্কৃতে ঙ বর্ণের দ্যোতক ০। এই চিহ্ন কিম্বা বাংলা ং চিহ্নের আকারেও ঙ অক্ষরের পাগড়ীটি সাক্ষী। ক বর্গের অনুনাসিক ঙ। অপর চারি বর্গেরও এক এক অনুনাসিক আছে। কিন্তু য র ল ব শ ষ স হ এই আট বর্ণের কই ? সেটি ০ বা ং, অর্থাৎ ঙ। আমার মনে পড়িতেছে, আমরা বাল্যকালে পাঠশালায় ঙ্ক, ংশ লিখিয়া পড়িতাম আওংক, আওংশ। অর্থাৎ প্রায় অঙ্ক, অঙ্শ। অদ্যাপি ওড়িয়াতে অং-শ উচ্চারিত হয় অঙশ। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুরে লিখিত এক সংস্কৃত পুথীতে অঙ্শ বানান দেখিয়াছি। বংশ (বাঁশ) হইতে ওড়িয়া বা-উ-শ শব্দ চলিতেছে। নাগরী লিপিতে ব্যঞ্জন অক্ষরের মাথায় বিন্দু দিয়া অনুনাসিক জ্ঞাপিত করা হয়! যেমন শং, সংশয়। এই বিন্দুর নাম পূর্ণ অনুস্বার। পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর না পাইলে কোন্ অনুনাসিক, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। হিন্দীতে বং-শ, উচ্চারিত হয় বন্স, সিং-হ সিন্হ। বোধ হয়, হিন্দীভাষী পণ্ডিতের নিকট হইতে 'সং-স্কৃত', ইংরেজীতে সন্স্কৃৎ (Sanskrit) হইয়াছে। * মরাঠীতে লেখা হয় হিন্দীর তুল্য, সং-স্কৃত ; কিন্তু বিজ্ঞজনে বলেন, উচ্চারিত হয় যেন সর্ঁস্কৃত, অর্থাৎ সঙ্স্কৃত। সং-সা-র মরাঠীতে সং-ব-সা-র রূপেও আছে।

---

* সংস্কৃতে স ম্ম-ত সং ম-ত, দুই বানান আছে। পূর্ণ অনুস্বার উচ্চারণে না হইয়া বাংলা ওড়িয়া মরাঠী হিন্দীতে সন্-ম-ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্যদিকে, 'ম' সহিত 'ঙ' উচ্চারণের সাদৃশ্য হেতু স্ম-র-ণ, স-ঙ-র-ণ হইয়াছে। উৎ+মুখ=উন্মুখ ; আবার ফলানাম্ ফলানাং দুই আছে। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই সকল পরিবর্তন ও ব্যাখ্যা করিবেন। ব্যাখ্যা যাহাই হউক, সন্-মুখ, সন্ মত, সন্-মান অশুদ্ধ বলিতে পারি না। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিচার করা যাইবে।

সংস্কৃত-প্রাকৃতে ং চিহ্নের উচ্চারণ ঙ্ হইয়াছিল। তান্ত্রিক বীজ অং বং ইত্যাদির উচ্চারণ অঙ্গ বঙ্ করিয়া থাকি। ফোর্ট বিলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা ইংরেজ ছাত্রকে 'সঙ্‌স্কৃত' শিখাইতেন. ছাত্র ইংরেজীতে 'ঙ্গ' বানান করিতেন। পূর্বকালাবধি রঙ্=রং বানান চলিয়া আসিতেছে। এই হেতু রং, র-ঙ্গে-র, রঙ্গিন্ স্বাভাবিকক্রমে লিখিয়া আসিতেছি। ব-ঙ্গ মূল শব্দ হইতে ব-ঙ্গা-ল. ব-ঙ্গা-লা, ব-ঙ্গা-লী। ব-ঙ্গা-লী, নাম দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ। ব-ঙ্গ-লা দেশ ও ভাষাও প্রসিদ্ধ। ঙ্গ উচ্চারণে ঙ্, কারণ পরে 'লা'-তে দীর্ঘস্বর আছে। অতএব বং-লা লেখাও চলে। 'ব' পরে যুক্ত ব্যঞ্জন আছে বলিয়া আমরা বা-ঙ্গা-ল, বা-ঙ্গা-লা বা বা-ঙ্-লা, বা-ঙ্গা-লী বলি। অতএব বাং-লা=বাঙ্‌লা। বোধ হয়, এক কালে কোথাও কোথাও দেশের নাম ব-ঙ্গ-লা ছিল।

নদীয়া জেলায় এবং মুর্শীদাবাদ জেলার কিয়দংশে ভা-ঙ্গা শব্দের গ ক্ষীণ উচ্চারিত হয়। লোকে বলে ভাঙ্-আঁ (প্রায়ই ভাঁঙ্-আঁ)। এইরূপ, আ-ঙ্গি-না তাহাদের মুখে আঁঙ্গ-ইঁনা। দক্ষিণ রাঢ়ে ভাঁ-গা, আঁ-গি-না। ভাঁ-গা শব্দে গ প্রবল নয়, ক্ষীণও নয়। অ-ঙ্ক আঁ-ক, শ-ঙ্খ শাঁ-খ, আ-ঙ্গু-ল আঁ-গু-ল, লা-ঙ্গ-ল লাঁগল বা নাগল ইত্যাদি ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী। নদীয়াবাসীর মুখে ভা-ঙ্গা শব্দের গ লুপ্ত নয়। নদীয়া ও রাঢ়ে প্রভেদ, বর্ণবিচ্ছেদে। যেমন উদ্-যোগ, উ-দ্যোগ, কিম্বা অবি-নাশ, অ বিনাশ। অবি-নাশ, নদীয়ায় ওবি-নাশ। অ-বিনাশ, রাঢ়ে অ বিনাশ। দেশভেদে সহস্র সহস্র শব্দের উচ্চারণ-ভেদ আছে। বানান দ্বারা সে সব শব্দ সকল লোকের বোধ্য হইয়াছে। মূল শব্দ ভ-ঙ্গ। ইহা হইতে ভ-ঙ্গা, বাং ভাং, ভা-ঙ্গ-ড়; ভ-ঙ্গ হইতে বাং ভাঁ-গা, ভাঁ-গা-নি, ভাংচা বা ভেং-চা, ভাং-চি ইত্যাদি। লোকের কান ও বাগ্-যন্ত্রভেদে শব্দের উচ্চারণ-ভেদ হয়। সে ভেদ সাহিত্যে স্বীকৃত হয়

না। কোন্ জাতীয় শব্দে কি সূত্রানুসারে ঙ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা জানিলে সকলে শিখিতে পারিতাম। রাঢ়ের উচ্চারণ-মত লিখিলে বাঁ-গা-ল, বাঁ-গা-লী, বাং-লা, রাঁ-গা, ভাঁ-গা লেখা উচিত। র-ঙ্গি-ন্ পরিবর্তে রঁগিন্ লিখিতে পারি, কিন্তু র-ঙি-ন লিখিলে র-ইঁ-ন হইয়া যায়। এই উচ্চারণ যে অভিপ্রেত নয় তাহা জানাইবার নিমিত্ত র-ঙী-ন দীর্ঘ ঈ লেখা হয়। নতুবা ঈ স্বরের কোন হেতু ছিল না।

"বিপত্তি"তে আ-ঙুল, ডা-ঙা, ভা-ঙা, ভা-ঙ্, রূপ তাহার ভাষার সহিত 'মিট' খায় নাই। কিন্তু তবে ভাং-চি কেন? কা-ঙা-রু জন্তুটির ইংরেজী নামে গ লোপের জো নাই। "ভূমিকা"য়, দুই দুই রূপ আছে, বা-ঙ্গা-লী বা-ঙা-লী, টং টঙ্। পা-ঙ্গা-স, ডা-ঙ্গা আছে, ট-ঙে-র, র-ঙে-রও আছে। "এক পাকের তৈরী," এক রকম "তার" নয় কেন? চা-ক-রি ঠিক, কারণ চা-ক রের কর্ম চা-ক্‌রি। চা-কু-রি ও খি-চু-ড়ি দুই-ই ভুল। কারণ চা-ক-রে চা-কু নাই, খি-চ-ড়িতে চু-ড়ি নাই। এক পাকের তৈরিতে অ্যা-ক্‌ট, এ্যা-নু-ই-টি, এ-না-ট-মি তিন রকম 'তার' পাইতেছি। "বিপত্তি"র এ্যা-য়-সে, ক্যা-য়-সে হিন্দীতে ঐ-সে কৈ-সে। 'ঐ' হিন্দী উচ্চারণে 'এই'। অতএব বাংলায় 'এয়সে কেয়সে' হইবে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের কিম্বা শ্রীমতী সরস্বতীর ভাষার সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। মৌখিক ভাষা কোন্ দিকে কোন্ কূল ভাঙ্গিতেছে, কোন্ কূল গড়িতেছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত দুই রকমের রচনা লইয়াছি। কোনটাই যেমন-তেমন লেখা নয়। ক্রিয়া-পদ ধরি নাই। কিন্তু 'বলে কয়ে চলে গেল' ইত্যাকার লিখিয়া গেলেই মৌখিক ভাষা হয় না। মৌখিক ভাষা চলিত্ ভাষা; নানা জাতীয় শব্দ, সংস্কৃত, অ-সংস্কৃত, বাংলা, অ-বাংলা দ্বারা এই ভাষা পুষ্ট হইয়াছে। দেশ ভাষায় অধিকার না থাকিলে এই ভাষায় রচনা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

বিপদ এই, নানা দেশ, নানা দেশ ভাষা। কেতাবী ভাষায় এই বিপদ নাই। দেখা গেল, চলিত ভাষায় কেবল ক্রিয়াপদ নয়, বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের ভেদ আছে।

বাংলা ভাষার লিখন ও পঠন *

(১) লিখন।

ভাষার শব্দের মূল ধ্বনির নাম বর্ণ। 'কদম্ব' একটি শব্দ; ইহাতে ক-অ, দ-অ, ম-ব-অ, ৫টি বর্ণ আছে। কি কি বর্ণের যোগে শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার বর্ণের নাম বানান।

বর্ণের চিত্র বা আকৃতির নাম অক্ষর †। ক দ ম ব, এক এক অক্ষর। এখানে অ-বর্ণের অক্ষর উহ্য। বাংলা ভাষায় বর্ণের যে আকৃতি, অন্য ভাষায় সে আকৃতি নাই। কিন্তু আকৃতিভেদে বর্ণের ও বানানের ভেদ হয় না। 'গ ু র ু' শব্দের আকৃতি গুরু লিখি, কিম্বা গ ু র ু লিখি, কিম্বা গুরু লিখি, কিম্বা guru লিখি, বানানের ইতর-বিশেষ হয় না।

বর্ণ ও অক্ষর এক নয়, এই সামান্য কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে এক পুরুষ কাল গিয়াছে। বাংলা ভাষার লিখন সোজা করিবার অভিপ্রায়ে ২৫ বৎসর পূর্বে আমি কতকগুলি বর্ণের বাংলা অক্ষর ও অক্ষরের যোগ পরিবর্তন করিয়াছিলাম। জ্ঞ, ঞ্চ, ক্ষ, এই তিন অক্ষর সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ হইয়াছে, এই হেতু পরিবর্তন করি নাই।

* চন্দননগরের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের নিমিত্ত লিখিত।

† এই প্রবন্ধে বর্ণ ও অক্ষর শব্দের এই অর্থ স্মরণ রাখিতে হইবে।

সে সময় বহু বিজ্ঞজনে এই কর্ম উপহাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবেচনায় আমি বাংলা বানানের 'দফা রফা' করিতে বসিয়াছি। রাজশাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বর্ণমালার অভিযোগ" উপস্থিত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে হাসাইয়াছিলেন। তিনি যুক্তাক্ষরের অভিযোগ লিখিলে আমার দুঃখ হইত না।

আমি বাঙ্গালী শিশুর কষ্ট দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" দুইভাগ পড়িতে পাঁচ ছয় মাস লাগে। তথাপি সে সম্বাদ-পত্র পড়িতে পারে না। ওড়িয়া ও বিহারী শিক্ষিত লোককে বাংলা অক্ষর পরিচয় করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা অগণ্য যুক্তাক্ষর মনে রাখিতে পারেন না। যে পরিশ্রম লঘু করিতে পারা যায়, তাহার মূল পিতামহ-প্রদত্ত হইলেও তাহাকে ধরিয়া বসিয়া থাকিলে তাঁহাদের কালে যাইতে হইবে।

সম্প্রতি 'লাইনো টাইপ' যন্ত্রে বাংলা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে, পরে পরে আরও কত কি হইবে, কে জানে। কিন্তু অক্ষর চিনিতে মানুষের চোখ ও লিখিতে হাতের আঁগুলের কর্ম যন্ত্রদ্বারা সম্ভবিতে পারে না। বুদ্ধিমান্ কর্মনিপুণ কর্মকার আমাদের লেখার অনুকরণ করিতে পারিবেন, যন্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র প্রতিলিপি উৎপাদন করিতে পারিবেন।

অক্ষর কতগুলি ও অক্ষরের আকৃতি কেমন লইবে।

(১) যতগুলি বর্ণ, ততগুলি অক্ষর অবশ্য চাই। একই অক্ষর দ্বারা একাধিক বর্ণ জ্ঞাপন করিলে অক্ষরের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়।

(২) এক বর্ণের অক্ষরের সহিত অন্য বর্ণের অক্ষরের ভ্রম হইবে না।

(৩) একটি অক্ষর লিখিতে একবারের অধিক কলম তুলিতে হইবে না। এক কলমে একটি শব্দ লিখিতে পারিলে শ্রম ও কাল লাঘব হয়।

(৪) অক্ষর সুন্দর হইবে, দেখিলে পড়িতে ইচ্ছা হইবে। কেহ কদাকার লিপি পড়িতে চায় না।

বাংলা অক্ষরমালায় এই চারি সূত্র প্রয়োগ করিলে প্রচলিত অক্ষরের দোষগুণ বুঝিতে পারা যাইবে। কয়েকটি দোষের উল্লেখ করিতেছি।

(১) ব বর্ণ দুইটি, কিন্তু অক্ষর একটি, অন্তঃস্থ ব অক্ষর চাই না, এমন নয়। এই অক্ষর থাকিলে 'হওয়া, খাওয়া, দেওয়া' প্রভৃতি শব্দের 'ওয়া' সেই ব অক্ষর দ্বারা লিখিতে পারা যাইত। কলিকাতা অঞ্চলে 'ওয়ালা' প্রত্যয় বহু প্রচলিত। অনেক আর্বী, ফার্সী, ইংরেজী শব্দেও অন্তঃস্থ ব আবশ্যক হয়।

(২) ব এর তলে বিন্দু দিলে র কেন হইবে, তাহার কারণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ পূর্বকালে র অক্ষর অন্যবিধ ছিল। এইরূপ, অন্তঃস্থ য এর তলে বিন্দু দিয়া য় লেখা অবিধি। কারণ এই দুই অক্ষরের উচ্চারণে সাদৃশ্য নাই।

(৩) য এবং ষ এর ছাপার অক্ষরে ভ্রম হয়।

(৪) যুক্তাক্ষর চিনিতে আমাদের শিশুর ও অন্যপ্রদেশবাসীর বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিবিধ ই, দ্বিবিধ উ, দ্বিবিধ ঋ এবং বহু ব্যঞ্জন অক্ষরের প্রচ্ছন্ন কিম্বা লুপ্ত অঙ্গ থাকাতে শ্রম বৃদ্ধি হয়। আমার প্রদর্শিত যুক্তাক্ষরে এই দোষ সংশোধন করিয়াছিলাম।

বিশ পঁচিশ বৎসর যে কামনা করিয়া বসিয়া ছিলাম, তাহা এক্ষণে 'টাইপার' ও 'লাইনো টাইপ' প্রবর্তনের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। বুঝিতেছি অক্ষরের দোষ অন্যের চোখও এড়ায় নাই, তাহাঁরা 'দফা রফা' করিতেও বসেন নাই। আমি টাইপারে ছাপা দেখিয়াছি, অন্য দোষ না ধরিলেও সুন্দর মনে হয় নাই। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র কর্ণধার শ্রীযুত সুরেশ-চন্দ্র মজুমদার ও "বেঙ্গল কেমিক্যালে"র স্থিতিকারী শ্রীযুত রাজশেখর বসু মিলিয়া বাংলা লাইনো টাইপ নির্মাণ করাইয়াছেন। ইহাঁদের বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি, অদম্য উৎসাহ, অবিশ্রান্ত যত্ন ও কর্মকুশলতা অক্ষর মুদ্রণে

ও অচিরে লিখনে যুগান্তর আনয়ন করিবে। "আনন্দবাজার পত্রিকা" এখন লাইনো টাইপে প্রত্যহ ছাপা হইতেছে। সহস্র সহস্র পাঠকের চক্ষু সেই অক্ষরের আকারে ও যোজনায় শিক্ষিত হইতেছে। দেখিতেছি, বেঙ্গল গবর্মেণ্ট প্রেসেও লাইনো টাইপ যন্ত্রে বাংলা ছাপা হইতেছে। মূল অক্ষরগুলি সুন্দর হইয়াছে। কিঞ্চিৎ স্থূলতা হেতু পঠন সুগম হইয়াছে।

যে কোনও বিষয়ে নূতন প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ কঠিন। প্রথমে সে পথ সর্বাঙ্গপূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। বর্তমান লাইনো টাইপের অক্ষরের গোটা কয়েক দোষ দেখাইতেছি।

কয়েকটি অক্ষর ভাল হয় নাই। শ অক্ষরের দুইটি পুটলি ক্ষুদ্র ও ঊর্ধ্বগত করিবার কারণ ছিল না। ভ ত অক্ষর উদরস্ফীতি দ্বারা কদাকার হইয়াছে। খ ও থ অক্ষরে ভ্রমের সম্ভাবনা হইয়াছে। বিসর্গ বৃহৎ হইয়াছে। দ-অক্ষর দক্ষিণে হেলিয়াছে। অঙ্কের শূন্য চিহ্ন বামে বাঁকিয়াছে। যে চিত্রকর অক্ষর লিখিয়া-দিয়া ছিলেন, বোধ হয় তিনি সুন্দর ছাঁদের হাতের লেখা পুথী দেখেন নাই। ভ ত অক্ষরে বৃন্ত ছিল। এখন বৃন্তহীন হইয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকে।

ব্যঞ্জন অক্ষরে স্বরবর্ণ যোগে ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই পাঁচ অক্ষরের মধ্যে ি অক্ষরটির পৃথক্‌স্থিতি বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু ব্যঞ্জন অক্ষর হইতে ী দূরে পড়িতেছে। এই অন্তরহ্রাসের চিন্তা কর্তব্য। ু ূ ৃ এত ক্ষুদ্র না করিয়া দীর্ঘ করা যাইতে পারিত, ব্যঞ্জন অক্ষরের মধ্য ভাগ হইতে নামাইয়া দিলে ক্ষতি হইত না। দেখিতেছি কু তু ভু অক্ষরে প্রচলিত ু বসিয়াছে, কিন্তু অন্য অক্ষরে পৃথক্ আছে। একই অক্ষরের দ্বিবিধরূপ বিধিসঙ্গত নয়। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরে প্রত্যেক মূল অক্ষর স্পষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা যুক্তাক্ষর পরিচয়ের কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। এই একটী পরিবর্তন দ্বারা বাংলাভাষা লিখন ও পঠনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। শিশু ও শিক্ষক অনাবশ্যক কষ্ট হইতে নিস্তার পাইলেন।

আমি এখানে কয়েকটি নূতন অক্ষর প্রস্তাব করিতেছি। আশা করি, বাংলাভাষাপ্রসারকামী গ্রাহ্যতা চিন্তা করিবেন।

(১) অন্তঃস্থ ব অক্ষরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে অসমীয়া ভাষার ৱ অক্ষর লেখা ও ছাপা হইতেছে। কিন্তু এই অক্ষরের দুইটি দোষ আছে। (ক) অক্ষরটি লিখিতে কলম তুলিতে হয়। (খ) ইহাতে র ফলা যোগ অসাধ্য।

বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত পুস্তক লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে। তখন র-ফলা যোগ করিতে হয়। এক কলমে লিখিতে পারা যাইবে অথচ বর্গীয় বএর সদৃশ হইয়াও পৃথক্ হইবে এমন অক্ষর চাই। বিশ বৎসর পূর্বে আমি নাগরী ব লইয়াছিলাম। এখনও দেখিতেছি সে ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই অক্ষরের দোষ এই যে, অন্য অক্ষরের মত সকোণ নয়। কিন্তু কোণ দিয়া নূতন অক্ষর কল্পনা কঠিন নয়।

যদি অন্তঃস্থ ব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আপত্তি থাকে, তাহা হইলে ওয়া পরিবর্তে 'ওা' লেখা চলে। অনেক দিন হইল "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে 'ওা' লিখিয়াছিলেন। আমি ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলাম। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণ যোগ অবিধি মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু 'ঐ' এবং 'ঔ' যুক্তস্বর। সেইরূপ 'ওা' একটা যুক্তস্বর। "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথীতে 'ওয়া' স্থানে সর্বত্র 'ওা' আছে, পড়িতে বুঝিতে কিছুই কষ্ট হইতেছে না। অনেক পুথীতে 'আওাস' (আৱাস) আছে।

(২) বাঁকা এ। বহু লোকে 'এক, এখন, এমন,' বলিতে গিয়া এধ্বনি এ্যা করে। ইংরেজীতেও অনেক শব্দের আদ্যে এই বাঁকা এ আছে। ব্যঞ্জনবর্ণে ও যোগ করিতে হয়। বাংলা ভাষায় বাঁকা এর প্রয়োজন ছিল না, অক্ষরও ছিল না। এ, আ, ্যা দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সাধারণ লোকে ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ ও লিখন বাংলা করিয়া লইয়াছে, কিন্তু কতিপয় ইংরেজী শিক্ষিত জনের নিকট

ইংরেজীর বালাই গুরুতর বোধ হইয়াছে। তাঁহাদের বিচার নিমিত্ত এা (এ+া) এই স্বরবর্ণ উপস্থিত করিতেছি, যেমন এাসিড্, এাক্ট্ ইত্যাদি। ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত করিতে হইলে একটু রূপান্তর কর্তব্য, তখন -্যা, যেমন ম-্যানেজার। কেহ কেহ নূতন টাইপ নির্মাণ বহু ব্যয়সাধ্য মনে করিয়া প্রচলিত টাইপ দ্বারা যা নয় তা লিখিতেছেন। তাহাঁদের চোখে অ্যা বিসদৃশ ঠেকিতেছে না। স্বরাক্ষরে য-ফলা যোগ অদ্ভুত। দেখিতেছি অ অক্ষরে য-ফলা; কিসে মনে করি, অ-অক্ষরে য-ফলা নহে। কোনও বাংলা অক্ষরে এইরূপ নাই। ইহা অপেক্ষা য়া লেখা ভাল। অ অক্ষরকে বাহন করিয়া ফল কি ?

(৩) ঈষৎ ই। বহু চল্তি শব্দে ঈষৎ ই উচ্চারিত হয়। 'চাউল, ডাইল' 'চাল, ডাল' নয়। মেদিনীপুর হইতে চট্টগ্রাম এবং হিমালয় হইতে বঙ্গোপসাগর, এই ভূভাগ নিবাসী 'চাল, ডাল' জানে না; তাহারা ই-হ্রস্ব করিয়া 'চাইল, ডাইল' বলে। ইহাই শুদ্ধ। উ, ই লোপের হেতু নাই। 'হারি, মারি' প্রভৃতি শব্দে ই বলি। না বলিলে 'হার, মার' হইয়া পড়ে। তথাপি কেহ কেহ আলস্য হেতু এই শব্দপ্রভেদ অস্বীকার করিতেছেন, কিম্বা এক উধ্ব´ কমা চিহ্ন দ্বারা ঠারে কাজ সারিতেছেন। ভুলিতেছেন, পাশ কাটাইবার বুদ্ধি দ্বারা পথ সুগম হয় না। উধ্ব´ কমা (') উদ্ধার চিহ্ন। সাঙ্কেতিক চিহ্নের বিবিধ অর্থ, বিভ্রান্তির উৎপাদক। আমি ঈষৎ ই বর্ণের দ্যোতক (ˆ) লিখিয়া দেখাইয়া আসিতেছি। যেমন চা˚ল, ডা˚ল, ক˚লকাতা। এই ঈষৎ ই দুই অক্ষরের মাঝেও বসাইতে পারা যায়। এই চিহ্নের নাম শৃঙ্গ।

(৪) র-অক্ষরের পরিবর্তে নাগরী র স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

(৫) য, য় এই অক্ষরের বিসম্বাদ চিন্তনীয়। মাত্র ৭০।৮০ বৎসর পূর্বের হাতের লেখা পুথীতে য দ্বারা য় বর্ণ ব্যক্ত হইত। সেই রীতি প্রবর্তনে দোষ দেখিতে পাইতেছি না। যএর নিমিত্ত নাগরী য

রহিয়াছে, যেমন 'যদি সে যায়'। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য শব্দে য স্থানে জ লিখিতে হইবে। এ বিষয় পরে বলিতেছি।

(৬) ড়, ঢ় অল্প লাগে। এই দুই অক্ষরও পূর্বে ছিল না।

(৭) ত-অক্ষরে হস্‌চিহ্ন জুড়িয়া ৎ অক্ষরের উৎপত্তি। অন্য ব্যঞ্জন অক্ষরেও হস্ চিহ্ন লাগে। অতএব ত্ নিমিত্ত বিশেষ অক্ষর অনাবশ্যক।

(৮) হসন্ত চিহ্ন আছে, কিন্তু অকারান্ত চিহ্ন নাই। এই চিহ্নের অভাবে কেহ কেহ 'অ' অক্ষর স্থানে 'ও' অক্ষর লিখিতেছেন, যেমন, কালো, বড়ো ; কারণ 'কাল, বড়' শব্দের অর্থ ভিন্ন। কিন্তু বানানে ও-যোগে ও-উচ্চারণ দ্বারা শব্দটি নূতন হইয়া পড়িতেছে। পুরাতন বহু প্রচলিত শব্দকে রূপান্তরিত করিলে স্বেচ্ছাচারিতা হয়। কিন্তু অকারান্ত উচ্চারণ জানাইবার প্রয়োজনও আছে। অক্ষরের দক্ষিণনিম্ন কোণে বিন্দু চিহ্ন দ্বারা সে প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতে পারে, যেমন, কাল-বৈশাখীর কাল. মেঘ, বার. বার।

(৯) বর্তমানে হস্ চিহ্ন ব্যঞ্জন অক্ষরের নিম্ন-দক্ষিণ কোণে লিখিবার রীতি। তৎপরিবর্তে চিহ্নটি দক্ষিণ পার্শ্বের মধ্য ভাগে বসাইলেও ক্ষতি নাই। এই রীতি ধরিলে যুক্ত ব্যঞ্জন অক্ষরের প্রথম অক্ষরটি ক্ষুদ্র করিবার প্রয়োজন হইবে না। একই আকারের ব্যঞ্জন অক্ষর দ্বারা যাবতীয় যুক্তাক্ষর লিখিতে পারা যাইবে। হাইফেন চিহ্নদ্বারা যেমন দুইটি শব্দ জুড়িয়া থাকি, হস্ চিহ্ন হাইফেনের স্থানে বসিয়া দুইটি ব্যঞ্জনাক্ষর জুড়িবে। হাইফেন চিহ্ন পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ, হস্ চিহ্ন অগ্নিকোণে বসিবে। অতএব ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না।

(১০) একটি সম্বোধন চিহ্নের অভাব আছে। সম্প্রতি বিস্ময় চিহ্নের দ্বারা সম্বোধন জ্ঞাপিত হইতেছে। কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। সম্বোধনে ও, ভো, ওহে, ওগো, ওলো বসে। অতএব ওকার মূলস্বর। ইংরেজী O অক্ষরটি পাশে চেপ্টা করিয়া লইলে মন্দ হইবে না।

উপরের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলে বাংলা অক্ষর সংখ্যা হ্রাস পাইবে। বাংলা শব্দ চিনিতে, লিখিতে ও ছাপিতে যথেষ্ট সুবিধা হইবে, নানা প্রমাণের টাইপ নির্মিত হইতে পারিবে, মানুষের ও দেশের নামের আদ্যাক্ষর ও কোন শব্দকে বিশেষ করিবার ইচ্ছা হইলে ভিন্ন আকারের অক্ষরে লিখিতে পারা যাইবে। উপন্যস্ত হস্‌ চিহ্ন যোগে যুক্তাক্ষর লিখিয়া দেখাইতেছি।

(১) ফলা যোগ।

পদ্‌ম, আত্‌ম ; শত্‌রু, রাত্‌রি ; সত্‌য়, বাক্‌য় ; পক্‌ব, স্‌বাদু। এইরূপ লিখন দ্বারা এক মহোপকার হইবে, ফলার উচ্চারণ শুদ্ধ হইবে। পদ্‌ম দেখিলে পদ্দঁ আসিবে না, শত্‌রু শৎত্রু, সত্‌য় সোত্ত ইত্যাদি পঠন অসম্ভব হইবে

(২) ব্যঞ্জন যোগ।—

গ্‌রাসিতে অবনী উথলে সি্‌নধু গর্‌জনে কাঁপে হিয়া,

গণ্‌ডূষ তরে কুম্‌ভজ কত তাণ্‌ডবে তাথিয়া থিয়া।

প্রথম প্রথম পড়িতে নূতন ঠেকিবে, কিন্তু পাঁচ সাত মিনিটে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাতে নূতন কিছু নাই। বোধ হয় ভবিষ্যতে ি ে চিহ্ন ব্যঞ্জনাক্ষরের পরে বসিবে। তখন বাংলা লিখন-রীতি ইংরেজী তুল্য হইবে, শিশু বাঁচিবে, ছাপাখানার কম্পোজিটর বাঁচিবে। একটি হস্‌ চিহ্নের টাইপ পাইলে সকল ছাপাখানায় এই রীতিতে বাংলা ও সংস্কৃত ছাপা হইতে পারিবে। মুদ্রা-যন্ত্রের কর্তারা মনোযোগী হইলে লেখকেরাও হইবেন। এই প্রবন্ধের পরিণাম 'বাংলা নবলিপি' দ্রষ্টব্য।

(২) পঠন

অর্থব্যঞ্জক প্রত্যেক শব্দের (ধ্বনির) একটা প্রমাণ আছে। সে প্রমাণের বহির্ভূত শব্দের নাম ভাখা। লোকে কথায় বলে, যোজনান্তে

ভাখা। যোজনান্তে না হউক, যোজনত্রয়ে বটে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নানা জেলার কহতা ভাষার শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল শব্দ দ্বিবিধ, (১) একই অর্থব্যঞ্জক শব্দের ভেদ, (২) নূতন দ্রব্য ও কর্মবাচক নাম। লিখন ও পঠন শিক্ষা দ্বারা প্রথমোক্ত ভেদ যথাসম্ভব লুপ্ত না হইলে সে শিক্ষা ব্যর্থ। বিদ্যালয়ে পাঁচ সাত বৎসর আনা-গনার পরেও স্বগ্রামের ভাখা, যেমন বাঁসা ঢেঁকুর কুঁয়ো বোঁচকা খোঁজা ঝিঙা বের বেঁকা শ্যাল স্যাল গিছলুম, ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে দেখিলে বুঝি শিক্ষা পাকা হয় নাই। ভাষা ব্যবহার দ্বারা সামাজিকতার হানি হয়, কভু অহঙ্কারও প্রকাশ পায়। অভিজ্ঞ শিক্ষক স্বীকার করিবেন, প্রথমে শব্দশিক্ষা, তারপর বর্ণশিক্ষা, তারপর বানানশিক্ষা, তারপর অক্ষর-শিক্ষা করিলে লিখন ও পঠন জ্ঞান সুলভ্য ও স্থায়ী হয়, জেলায় জেলায় ভাখা-ভেদ বহু পরিমাণে হ্রাস হয়। শিশুকে যে-কোন বর্ণ শিখাইতে পারা যায়, বুড়াকে পারা যায় না।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বর্ণমালার ঋ, অসংযুক্ত ণ ও য নাই। অবশিষ্ট বর্ণ আছে। অনেকে অক্ষর ও বর্ণ এক মনে করিয়া বলেন, বাংলা ভাষায় য নাই, ব নাই। কথাটা ঠিক নয়। জ, য দুইটা অক্ষর, কিন্তু বর্ণ এক। ফলার মধ্যে ব-ফলা নাই। বিশ্ব বিশ্‌শ; পক্ব, পক্‌ক। ম-ফলা অর্ধানুস্বারে পরিবর্তিত হয়; আত্মা, আত্তঁা; পদ্ম, পদ্দঁ। এই দুই ব্যতীত অনেক শব্দের উচ্চারণে ই ঈ, উ ঊ, ভেদ নাই। অনেক শব্দের অন্ত্য অক্ষরে অ থাকে, কিন্তু উচ্চারণে থাকে না, যেমন জল। অনেক শব্দের আদ্য অক্ষরে অ থাকে, কিন্তু পরে ই কিম্বা উ থাকিলে সে অ প্রায় ওকার হয়। যেমন, হরি, মধু। সমাসে অভাবাত্মক অ-বর্ণের পরিবর্তন হয় না। যেমন, অ-কিঞ্চন, অ-টুট। সমাসবদ্ধ পদের মধ্যস্থিত অ উচ্চারিত হয়। যেমন, বিষ-বৃক্ষ, জল-প্রবাহ, ধন-জন-মান। কেহ কেহ মনে করেন, বাংলা ভাষায় 'এক'

শব্দ এ্যাক, 'এখন' এ্যাখন, 'কেন'. ক্যান.। এটা ভুল। বহু বহু বাঙ্গালী 'এক, এখন, কেন.' বলে। ইহা ভুল বলিতে পারি না। বরং এ্যাক, এ্যাখন, ক্যান, উচ্চারণ ভুল। বহুলোকে হরি, মধু বলে। অতএব হোরি, মোধু বরং ভুল বলিতে হইবে। এ সকল বাদ দিয়া কতকগুলি সাধারণ রীতি আছে, তার ব্যতিক্রমে পঠন অশুদ্ধ হয়। যদি ছাত্র ও ছাত্রী তৃণ্, অতীত্, প্রাকৃত্, সিবু, সসী বলে, বুঝিতে হইবে তাহাদের শিক্ষক কিম্বা শিক্ষিকা বাংলা বানান জানেন না। কলিকাতা-নিবাসী কেহ কেহ মনে করেন, রাজধানীর উচ্চারণ শুদ্ধ ও অপরের শিক্ষণীয়। ইহা আত্মপ্রীতি মাত্র। গ্রামের ভাখা একই রকম, কলিকাতার ভাখা নানারকম। কয়েকটা উচ্চারণ দোষ দেখাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে উত্তরে প্রায় ৩০ মাইল স্থানের লোকে শব্দের আদ্যের ও অন্তের অ-কার স্থানে ও-কার করে। গঙ্গার পূর্ব্বপার্শ্বে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও যশোহরের কিয়দংশে ও-কার অতিশয় প্রবল। শিক্ষিত লোকেও বলেন, "সোপ্তোমী, ওষ্টোমী দিনে ঘোনো দুধ খেয়ে ওবিনাশের ওসুখ হোয়েছিলো।" এই প্রবণতা-হেতু বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ছাপায় গম, যম, বন দেখিলেও গোম, যোম, বোন, এবং পাঠানো, করানো, যতো, ততো, ছোটো, বড়ো ইত্যাদি বলে। 'ইত, ইল, ইব' ক্রিয়াবিভক্তি নিত্য অকারান্ত। ওকারান্ত উচ্চারণ ভাষার বিরুদ্ধ। পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ পঠনে ভুল ধরেন না। ছাত্র ছাত্রী 'এগারো, বারো, পনেরো (পনর), সতেরো (সতর)' শিখে, বড় হইয়াও বাল্যশিক্ষা সংস্কার ভুলিতে পারে না। দেখিতেছে 'কাল, ভাল ;' পড়িতেছে 'কালো, ভালো'। এটি পঠন শিক্ষার দোষ। কলিকাতা বিস্তীর্ণ নগর। এখানে নানাদেশের নানাজাতি বাস করিতেছে, এইহেতু জাতি, কুল ও গোষ্ঠীভেদে শব্দের (ধ্বনির) ভেদ দেখা যায়। বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদিগের মুখে কথা শুনিলে

কলিকাতার ভাষা বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ হয়। কেহ র লোপ করিয়া, ঘড়ীতে 'এগাঅটা, বাঅটা' বাজিতে শুনে। কেহ 'আক, কাঁটাল খায়, ফুল শোঁকে, অনেক কিছু করে'। তাহারা মনে করে শুদ্ধ বাংলা বলিতেছে। অসংখ্য বালক বালিকা 'আঙ্গুর' কিম্বা আঁগুর' বলিতে পারে না, আঁউর বলে। সংস্কৃত অঙ্গুল হইতে আঁগুল হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী এইরূপ বলে। বস্তুতঃ অনুনাসিকযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হয় না। যথা, অঙ্ক আঁক, অঞ্চল আঁচল, দণ্ড দাঁড়, দন্ত দাঁত, কম্প কাঁপ। অর্থাৎ অনুনাসিকবর্ণ কোমল হইয়া অর্ধানুস্বার হয় এবং পূর্বস্বরকে দীর্ঘ করে। এই সূত্রানুসারে 'ভাঙ্গা' হয় 'ভাঁগা,' 'বাঙ্গালী' হয় 'বাঁগালী'। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় এককোটি বাঁগালী এইরূপ বলে। কিন্তু কলিকাতাবাসী কোন কোন লেখক স্বীয় ভাখাপ্রীতিবশে বানান বিভ্রাট ঘটাইতেছেন, 'বাঁগালী' শব্দকে 'বাঙালী' করিতেছেন। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন, বাংলা ভাষায় শ আছে, ষ বা স নাই। আমি এই উক্তির প্রমাণ পাই নাই। পূর্বকালে বাংলা প্রাকৃতে মাত্র স ছিল, এখনও আছে। এ নিমিত্ত গ্রামে যাইতে হইবে না। কলিকাতার ছাত্রছাত্রীদিকে দুই ভাগ করিতে পারা যায়। একভাগে শ-ধ্বনি, অন্যভাগে স-ধ্বনি। শ-ভাগের সহিত মিশিয়া বয়োবৃদ্ধিতে অনেকের স ছাড়িয়া যায়, কিন্তু অসাবধানে, 'রামসসী, এলোকেসী, বিস' বাহির হইয়া পড়ে। ঢাকার ভদ্রঘরের যুবকের মুখে, "সই, কেবা সুনাইল সামনাম" শুনিয়াছি উপরে যে শ-ধ্বনি বলিয়াছিল, সেটা ঠিক শ নয়, অধিকাংশস্থলে শ ও ষ এর মিশ্রণ। অনেকস্থলে খাঁটি ষ শুনি, কদাচিৎ শ। বাস্তবিক বাংলা ভাষায় বর্ণ-মালার কয়েকটি মৃতপ্রায় হইলেও সকল বর্ণই আছে। ট-বর্গের সহিত যুক্ত হইয়া ণ ও ষ এখনও প্রায় আছে। কোথাও কোথাও য-ফলা, ব-ফলা ও ম-ফলা অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। সেখানেও কিন্তু 'সত্য' প্রায় ঠিক উচ্চারিত হয়, 'সত্ত' হয় না। আহ্লাদে ছেলে, কপালো পুরুষ,

তিল্যে কোকিল, তেল্যে ঝিলাপি আর বস্যে (বসিয়া), কর্যে (করিয়া) প্রভৃতিতে য-ফলা উচ্চারণ না করিলে সহজে অর্থবোধ হয় না, লিখনে য-ফলা না দিলে বিশেষণ শব্দ বিশেষ্য হইয়া পড়ে। 'বরকন্যে' কদাপি 'বরকনে' কিম্বা 'বরকোনে' নয়। বাংলাশব্দে সংস্কৃত বর্ণমালা পূর্ণরূপে আনিবার জো নাই, কেহ সে চেষ্টা করিতে বলে না। কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দকে 'কৃস্‌ন' বলিতে শুনিলে বাংলা বর্ণজ্ঞানের অভাব মনে হয়। ছাত্রেরা শব্দের অর্থ শিখিবে, কিন্তু বানান শিখিবে না ; এবিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দু যত উদাসীন, বাঙ্গালী মুসলমান তত নয়। ভদ্র বাঙ্গালী মুসলমান মন দিয়া বর্ণ শিক্ষা করে। কলিকাতাবাসী উচ্চপদস্থ এক মুসলমান বলিলেন, 'এখন বিশ্রাম করুন'। সেই কলিকাতাবাসী উচ্চপদস্থ হিন্দু বলিলেন, 'হাঁ, এখন বিস্রামের সোময় হোয়েছে।'

বাংলা পঠন শিক্ষা অবহেলার ফলে সংস্কৃত পাঠ অশুদ্ধ হইতেছে। অন্য প্রদেশের পণ্ডিত বুঝিতে পারেন না, কদাচিৎ মনে মনে হাসেন ও বাঙ্গালীর বিদ্যাবত্তায় সন্দেহ করেন। বাঙ্গালীর পূজামণ্ডপে চণ্ডীপাঠ হয়, কিন্তু সেটা বাংলা পাঠ। শাস্ত্রে আছে, চণ্ডীপাঠে একটি বর্ণ অশুদ্ধ হইলে কাম্যফল লাভ হয় না।

ছাত্রছাত্রীকে পঠন শিখাইবার পূর্বে, দেখিতে হইবে, শব্দটি ঠিক আছে কিনা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাঁর "কথামালা," "বোধোদয়," "আখ্যানমঞ্জরী"র ভাষা আদর্শ ভাষা, যেমন প্রাঞ্জল তেমন ললিত।

শুনিতেছি ইংরেজী মাষ্টারদিকে ইংরেজী শব্দের উচ্চারণের পরীক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু বাংলা শব্দের উচ্চারণ শিখাইবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। লোকে মনে করে, যেটা মাতৃভাষা, সেটা অমনই শেখা হইয়া যায়।

শুদ্ধভাবে ভাষণ ও লিখনের নিমিত্ত বানান শিক্ষার প্রয়োজন।

শব্দ (ধ্বনি) ভাষার প্রাণ, বর্ণদ্বারা ব্যক্ত না হইলে ভাষার বিয়োগ ঘটে। কিন্তু যত মানুষ, তত কণ্ঠ। লিখনে শব্দ, মূর্তি গ্রহণ করে, আমার তোমার তাহাঁর কণ্ঠ নিরপেক্ষ হইয়া দেশ ও কালের ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া দর্শকের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু যে বর্ণের যে অক্ষর, সে অক্ষর না থাকিলে, চক্ষুষ্মান্ হইলেও পাঠক অন্ধ। অর্থাৎ লিখনে ধ্বনি-সম্বাদী বানান উচিত।

উচিত বটে কিন্তু অসম্ভব। বাংলা ভাষা নূতন নয়। কোন ভাষা নূতন নয়, কৃত্রিম নয়। একজাতি অন্যের ভাষা লিখিতে ও গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু সে ভাষা নূতন নয় কৃত্রিম নয়। বাংলা ভাষার প্রাণ সংস্কৃত, দেহও সংস্কৃতজাত। ছয়শত বৎসর পূর্বে চণ্ডীদাস "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গাহিয়াছিলেন। তাহাঁর গীতে শত শত সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত অর্থে স্বচ্ছন্দে বসিয়াছে, পাশে তেমনই শত শত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রায় শত বর্ষ পরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত "রামায়ণ" গান করেন। তাহাঁর ভাষা সম্পূর্ণ পাই নাই, কিন্তু তাহাঁর শিষ্যদের ভাষা দেখিলেই বুঝি সংস্কৃত ও সংস্কৃত-মূলক শব্দে পরিপূর্ণ। কৃত্তিবাসের প্রায় শতবর্ষ পরে মুকুন্দরাম-চক্রবর্তী শুভচণ্ডীর "অষ্টমঙ্গলা" গাহিয়াছিলেন। তিনি কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ অবলীলায় সাজাইয়া গিয়াছেন। তিনই কবি, তিনই গীত রচিয়াছেন, সহস্র সহস্র নরনারী সে গীতামৃত আকণ্ঠ পান করিয়াছে, সংস্কৃত শব্দ শুনিয়া, ভীত হইয়া, আসর হইতে উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু এই সকল সংস্কৃত শব্দ বানানে সংস্কৃত, শতকে আশিটা পঠনে বাংলা। 'পাষাণ' লিখিলে কে বলিবে সংস্কৃত নয়? শব্দটি শুনিলে কে বলিবে সংস্কৃত? দোকানী পাষাণ ভাঁগিয়া দাঁড়ী ধরিতেছে, নারী ষাণের ঘাটে কলশী রাখিতেছে। দোকানীর পাষাণ আর ঘাটের ষাণ, 'পাসান' আর 'সান' লেখা চলে। কিন্তু সে দুইটা শব্দ নূতন হইয়া দাঁড়াইবে, চিনিতে পারা যাইবে না। কে জানে কে 'সান' বলে

কে 'শান' বলে। আর, সংস্কৃত শব্দের বানানের নিমিত্ত চিন্তাও নাই, সংস্কৃত কোষ আছে।

কিন্তু সংস্কৃত ব্যতিরিক্ত শব্দের কোষ ছিল না। আমার "বাংলা শব্দকোষে" প্রায় বার হাজার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ গুলি মূল শব্দ। এই সকলের ডাল পালা আছে। বোধ হয় কুড়াইয়া বাড়াইয়া আর হাজার দুই জড় করা যাইতে পারে। এই সকল শব্দ তিন জাতির, (১) সংস্কৃত-ভব শব্দ, (২) দেশজ শব্দ, (৩) বিদেশজ শব্দ। দুই চারিটা বাদে যাবতীয় বাংলা ধাতু সংস্কৃতমূলক। প্রায় নয় শত। তদ্‌ব্যতীত প্রায় আড়াই শত সংস্কৃত ধাতু জোড়া জোড়া আকারে বাংলা ভাষার বলাধান করিয়াছে। কড়্-কড়, খড়্-খড়, গড়্-গড়, ঘড়্-ঘড়, চড়্-চড়, জড়্-জড়, তড়্-তড়, দড়্-দড়, ধড়্-ধড়, পড়্-পড়, ফড়্-ফড়, বড়্-বড়, ভড়্-ভড়, মড়্-মড়, লড়্-লড়, সড়্-সড়, হড়্-হড় শব্দের প্রতিশব্দ নাই। ফোড়া আউরে চড়্-চড়, টন্-টন, দপ্-দপ, ধক্-ধক করে, কিন্তু কখনও কড়্-কড়, মড়্-মড়, কন্-কন করে না। এই সকল দ্বিরুক্ত শব্দের ধাতু সংস্কৃত; এই হেতু ধাতুর অর্থ ধরিয়া ঠিক প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

বৃক্ষের ও জীব জন্তুর নামে দেশজ শব্দ পাই। সেকালের পণ্ডিতেরা কতকগুলির সংস্কৃত রূপ দিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত ধাতু আবিষ্কারে রত হন নাই। দেশজ শব্দ চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকিবে। বৃক্ষের এক নাম পিপ্পল অমরকোষে আছে। শব্দটি দেশজ। হিন্দীতে পিপল। পুরাতন বাঙ্গালাতেও পিপল ছিল। এখন অশ্বত্থ নামের অপভ্রষ্ট প্রচলিত আছে। বাঁকুড়ায় নাম আসত, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় আসোত, চব্বিশ পরগনায় অশদ, নদীয়ায় অশথ। বীরভূমে ও পূর্ববঙ্গে অশ্বত্থের অপভ্রষ্ট নাই, লোকে পাঁকুড় বলে। লেখক চল্‌তি ভাষায় অশ্বত্থ লিখিয়া কাঁটাপথ ত্যাগ করেন। কচুগাছের

সাদৃশ্যে কচুরী (পানা) শব্দ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কচুড়ী নাম হইত। যেমন হাতুড়ী। ফুলরী শব্দও আছে। সংস্কৃতজ শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ব্যাকরণ পুরাতন রূপ অন্য শব্দের সহিত সাদৃশ্য বিচার করিয়া প্রকৃত বাঙ্গালা শব্দ নির্ণয় কঠিন নহে। কিন্তু কয়েকটি বর্ণের দ্বিবিধ আকার আছে, লিখনে কোন্ অক্ষর গ্রাহ্য ? বানান বিভ্রাট, বানান বিভীষিকা ইত্যাদি যে কলরব শুনিতে পাওয়া যায়, সে এই যুগল মূর্তির। অই ঐ, অউ ঔ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ রি, অ য়, জ য, ণ ন, ব ব়, শ ষ স। দোকানী দৈ, থৈ, পৈতা, খৈল, লেখে। গউর (নিতাই), গউর (চন্দ্রিকা), 'গৌর' নয়। কারণ 'গৌর' অকারান্ত। বউ মউ বানান ঠিক। কিন্তু চৌ স্থানে চউ লিখিলে পারম্পর্ষ রক্ষা হয় না। পূর্বে খৃ়ট-আঁখুরে লিখিত, পৃয়, পৃওজন। এখন কি কারণে জানি না, কেহ কেহ খৃষ্ট, খৃষ্টাব্দ, বৃটেন, বৃটিশ লেখেন। তাহাঁরা ভুলিয়া যান, ঋবর্ণ বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে। অন্য যুগ্ম অক্ষরের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য, সে বিষয়ে ধ্বনি ও ব্যাকরণ পথপ্রদর্শক আছে। যেমন, 'কিংবা', না 'কিম্বা', কি লেখা উচিত ? আমরা 'কিম্বা' বলি, ঠিক বলি। ব্যঞ্জনবর্ণের পাঁচ বর্গের পাঁচ অনুনাসিক বর্ণ আছে। অতঃস্থ য—হ এই আট বর্ণের নিমিত্ত অনুস্বার আছে। এত সোজা নিয়ম থাকিতে 'সংখ্যা, সংগ্রাম' লেখা ঠিক নয়। তেমনই 'কিংবা, বশংবদ, বারংবার' লেখা ঠিক নয়, কারণ অন্তঃস্থ ব অক্ষর নাই। লোকে বাদ বিসম্বাদ করে। এই সূত্রানুসারে জংলা, বাংলা সিদ্ধ। আমার মতে, 'যে, যাহা, যেমন, যেন' প্রভৃতি কয়েকটা শব্দের য স্থানে জ বানান কর্তব্য। পূর্বকালে এই বানান ছিল। এখন সে বানান ধরিলে ক্রমভঙ্গ হইবে না।

নবাগত য় অক্ষরটি বিপদে ফেলিয়াছে। আদালতের বটতলায় বসিয়া দরখাস্ত নবিশ লিখিয়াছিল, "য়ামরা ৫১ বর্তী পরিবার।" উকীল বলিলেন, "ওহে, একি লিখ্‌লে ?" "আজ্ঞে, ঠিক লিখেছি, পড়ে দেখুন।" ব্যুৎপত্তি ও ধ্বনি অনুসারে 'কুআ, গআ, কেআ,' হয় ;

ব্যাকরণ-অনুসারে 'ধোআ, শোআ' বানান শুদ্ধ। বেআড়া, জানুআরি ইত্যাদি শত শত শব্দের প্রচলিত য় বানান ভুল বলিতে পারা যায়। আমার শব্দকোষে কতকগুলা সংশোধন করিয়াছি। কিন্তু দুই বানান দেখাইতে হইয়াছে। ই পরে য়া স্বভাবতঃ আসে। 'করিয়া, যাইয়া' বানান তত ভুল বলিতে পারি না। *

বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়া-বিভক্তির বানান ভুল হয় না। 'আমি করি, তুমি কর, সে করে; আমি করিলাম, তুমি করিলে, সে করিল' ইত্যাদিতে ভুলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চল্‌তি ভাষায় ক্রিয়াবিভক্তি সংক্ষিপ্ত হয়,

---

* আমি য়-অক্ষরের প্রবর্তন হেতু ও কাল অনুসন্ধান করি নাই। কয়েকখানা পুথী দেখিয়া মনে হইয়াছে, বঙ্গের সর্বত্র এককালে প্রবর্তিত হয় নাই। বাঁকুড়ায় শত বর্ষ পূর্বের পুথীতে য় পাই নাই। বোধ হয়, প্রবর্তনের দুই হেতু ছিল (১) য়-লুপ্ত ব্যঞ্জন। যেমন, সং কূপক হইতে কুঅঅ-কুআ-কুয়া; খদির-খঅির—খয়ির—খয়ের; কতেক-কএক-কয়েক। মায়ের, গায়ের, গাঁয়ের লিখিয়া জানাই, একটি ব্যঞ্জন বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। (২) স্বরসন্ধির আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত য় আসিয়াছিল। যেমন, রান্ধ ধাতু ইআ প্রত্যয় যোগে পূর্বকালে রান্ধিআ বানান প্রচলিত ছিল। ই+আ সন্ধি দ্বারা রান্ধ্যা। এই দ্বিতীয় রূপ পূর্ববঙ্গে অদ্যাপি প্রচলিত আছে কিন্তু রান্ধিয়া লিখিলে সন্ধির শঙ্কা থাকে না। কেহ কু+আ=কা করিত কি না সন্দেহ। সকলে এত পণ্ডিত ছিল না। 'কহিও' পরিবর্তে 'কহিয়ো' দেখি নাই। এখন য়, অসংযুক্ত স্বরাক্ষরের আশ্রয় হইয়াছে। প্রকৃত উচ্চারণও ত্যাগ করিয়াছে। সং খাদ ধাতু হইতে খা ধাতু। খাই, খাও, খায়। আ প্রত্যয় যোগে খাআ। পশ্চিম বঙ্গে খাআ, ণিজন্তে খাআন্‌, খাআনা প্রচলিত। বোধ হয় সন্ধির শঙ্কায় খাওয়া, খাওয়ান্‌, খাওয়ানা হইয়াছে। খাওয়া বাস্তবিক খাবা। সং তব্য হইতে খাইব, করিবা প্রভৃতি রূপ অদ্যাপি চলিতেছে। খাইবার দ্রব্য খাদিতব্য, করিবার আছে, কর্তব্য আছে। ওড়িয়াতে 'খাইবা করিবা' শব্দে তব্য প্রত্যয়ের অর্থ আরও স্পষ্ট। আমরা সন্ধি করি না, ইউরোপ বা ইওরোপ লিখিতেছি। আমার মতে অনাবশ্যক য় বর্জন একান্ত আবশ্যক। অন্য প্রদেশবাসী য়-হেতু শব্দ পড়িতে ও বুঝিতে পারে না।

কেহ কেহ লিখিতে ভুল করেন। বিভক্তিটি কি, অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত হইল কি না ; ইহা স্মরণ রাখিলে ভুল হয় না। সে করেছে, সে করবে ইত্যাদি বানান অশুদ্ধ। কারণ বর্ণলোপ হইয়াছে। এইরূপ ইয়া, ইলে, ইতে প্রত্যয়ান্ত পদে বর্ণলোপ, আর শিরসঞ্চালন দ্বারা সম্মতিজ্ঞাপন একই কথা। 'সে বলে চলে গেল', ধ্বনিসম্বাদী নয়, ব্যাকরণ-সম্মত নয়।

লোকে চিরকাল গতানুগতিক। সংসার যাত্রানির্বাহ এই নিয়মে করিয়া থাকে। ঈয় প্রত্যয় সংস্কৃত, যেমন স্বকীয়, দেশীয়। বঙ্গীয়, ইউরোপীয় সে সাদৃশ্যে আসিয়াছে। বাঙ্গালা ইয়া, ই, ঈ প্রত্যয় দ্বারা অসংখ্য শব্দ রচিত হইয়াছে, হইতেছে! এই সকলে প্রত্যয় প্রয়োগের নিয়ম আছে, সুতরাং বানান ও নির্দিষ্ট আছে। অঙ্গহানি হইলে প্রত্যয় অবোধ্য হয়। 'প্রথমতঃ, স্বভাবতঃ, ফলতঃ' ইত্যাদি বিসর্গহীন হইলে প্রত্যয়হীনও হয়।

বিদেশীশব্দ জ্ঞাতিবন্ধু না লইয়া একা একা আসিয়াছে। এক একটি শব্দ এক একটি সঙ্কেত। আমরা নূতন বস্তু পুরাতনের সহিত গাঁথিয়া মনে রাখি। বিশ, চল্লিশ, বিয়াল্লিশ ; অতএব পুলিশ, বালিশ, মালিশ, পালিশ, বার্ণিশ, সালিশ, সুপারিশ, নবিশ, নোটিশ ইত্যাদি লিখিতেছি। এই সকল শব্দের মূলধ্বনি, কে জানে। ইস্কুল জানি, স্কূল জানি না। পোষ্ট, ষ্টাম্প, ষ্টাট, ষ্ট্রীট, রেজেষ্টরি, মেজেষ্টরি, মাষ্টার জানি। ইষ্টিসেন চিনি। শুনিতেছি রেল পণ্ডিতেরা সে্টশন' লিখিতেছেন। কিন্তু আমরা গ্রামবাসী, ষ্টেশন পর্যন্ত যাইতে পারি স্‌ট, ষ্‌ট দ্বয়ের ভেদ ভাবিতে হইলে, 'টেরেন লেট' হইবে। আমাদের ইংরেজী বুলি গঙ্গার ভাটা, তৃণটিও উঠে না, ডুবে না। আমাদের কথিত আর্বী ও ফার্সী জবানে আরব্য ও ও পারস্য দেশের মরুভূমির বাষ্প গন্ধও নাই। সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্যে পোষাক, তোষাক, পাপোষ, বালাপোষ, তক্তাপোষ প্রভৃতি শব্দের ষ বানান আসিয়াছে, মূল শব্দে কি আছে, কে জানে। দৈবক্রমে ফার্সী

পো-ষ, পো-ষা-ক, পোষা-কী শব্দে ষ আছে। দৃষ্টান্তের অভাব হইলে স চলিয়াছে। যেমন, পেষা-পেসা, ইষ্‌তেহার-ইস্‌তেহার। ইদানী আমরা 'শরম শহর' লিখিতেছি, কিন্তু বাঙ্গালা বানান 'সরম, সহর।'

দুই দশটা শব্দ বিচার করিয়া নিয়ম বাঁধিলে পারম্পর্য ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। তখন সে নিয়ম সাধারণে প্রচারিত হইবে না। কর্ণ-কান, স্বর্ণ-সোনা বটে, কিন্তু 'কর্ণআলিশ ষ্ট্রীট' লিখিবার সময় কর্ণ চলিয়া আসে। শৃঙ্গাটক-শিঙ্গাড়া, মহিষা—ভয়সা বটে, কিন্তু সরিষা না সরিসা ? সর্ষপ না থাকিলে ভাবিতে হইত না।

বাংলা শব্দ ও বানান

পূর্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি, মৌখিক ভাষার স্থিরতা নাই। মৌখিক ভাষা চল্‌তি ভাষা। চলন্তের ধর্মই চলা। প্রবল নদী এক পাশে বাঁকে না, এক কূল খায় না। অতএব যদি আজ সে নদীর অল্প পথের মাপ-চিত্র করি, পঞ্চাশ বৎসর পরে সে চিত্র দেখিয়া নদীটির সে পথ চিনিতে পারিব না। নদীর বহুদূর গেলে পূর্বাপর পথ দেখিয়া অবশ্য চিনিতে পারিব। শাব্দিকেরা ভাষার শব্দের ব্যুৎপত্তি চিন্তা করিয়া কিম্বা পরপর পরিবর্তন পাইয়া একত্ব নিরূপণ করেন। কিন্তু সকল পাঠক শাব্দিক হইতে পারেন না, পুরাতন বাংলা বইর সব শব্দ বুঝিতেও পারেন না।

পূর্বপ্রবন্ধে গুটিকতক শব্দ লইয়াছি, সেও মাত্র-দুই জনের লেখা হইতে। ক্রিয়াপদ ধরি নাই। সে দুই রচনায় ক্রিয়াপদেও অনেক ভেদ আছে। মৌখিক ভাষায় শব্দ-ভেদ, বিভক্তি ও প্রত্যয় ভেদ থাকিতে সে ভাষার স্থায়িত্ব চিন্তা নিষ্ফল। কারণ আজ এই ভেদ, কাল আর এক

ভেদ হইতে থাকিবে অতএব কোন্ বুদ্ধিমান্ লেখক চল ভাষায় অচল গ্রন্থ রচনা করিবেন ? যে গ্রন্থে মনোহারী উপদেশ আছে, সে গ্রন্থ টিকিবে, লোকে কষ্ট করিয়া শাব্দিকের সাহায্য লইয়া পড়িবে। আর যত সব অ-সার অ-রস গল্প লেখা হইতেছে, তাহার একখানাও কেহ পড়িতে চাহিবে না, কালক্ষেপের জন্যও না। অতএব হয় নিত্য ন-তূ-ন ভাষার মোহ কাটাইয়া একটু সেকেলে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের ভাষা ধরিতে হইবে, কিম্বা নূতনকে সূত্রদ্বারা বাঁধিতে হইবে। বাঁধিলে নূতন হাঁপাইয়া দম আট্‌কাইয়া মরিবে না, তাহার লম্ফ-ঝম্প রুদ্ধ হইবে। উপস্থিত প্রবন্ধে এই বিষয় চিন্তা করিতেছি।

(১) বাংলা শব্দ

যাবতীয় ভাষায় তিন জাতীয় শব্দ আছে। দ্রব্য-বাচক, গুণবাচক কর্মবাচক। 'খড়' এক দ্রব্যের বাচক, 'পাণ্ডুর' এক গুণের বাচক, 'আচ্ছাদন' এক কর্মের বাচক। এক দ্রব্য বুঝাইতে একাধিক শব্দ থাকিলে ভাষার লাভ নাই ক্ষতি আছে। ৺শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী এই ক্ষতির প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মাথা' থাকিতে 'মস্তক' কেন ? দুইই ত এক দ্রব্যের বাচক। কিন্তু (১) আমাদের পক্ষে সংস্কৃত-বর্জন অসম্ভব। (২) দুইটি শব্দ থাকাতে রচনা-কলা-সৌন্দর্য বাড়াইবার সুযোগ হয়। আট-পৌরে কাপড়ে সভায় বসিতে পারা যায় না। একই দ্রব্য বুঝাইতে দুইটি শব্দ শেখাতে শক্তিক্ষয় হয় বটে, কিন্তু কেবল শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ দ্বারা, কেবল অর্থবিস্তার উপযোগ বিচার দ্বারা, মানুষ কর্ম করে না। মানুষের সৌন্দর্য-বোধ-আছে, মানুষ কলের পুতুল নয়।

কিন্তু এই তর্কের সীমা আছে। কেহ বলিল 'খড়,' কেহ 'খেড়,' কেহ 'বিচালী,' কেহ 'নাড়া'। কার কথা কে বুঝে ? কিম্বা সকলকেই

একটা দ্রব্যের চারিটা নাম শিখিতে হইবে। ইহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণের ভাষা বিজ্ঞানের পরিভাষা-তুল্য হইতে পারে না। এক নির্দিষ্ট অর্থে বিজ্ঞানের এক পরিভাষা; এই হেতু দ্ব্যর্থ, ত্র্যর্থ নাই, বুঝিতে কষ্ট নাই। সাধারণ ভাষা এত সূক্ষ্ম হইতে না পারিলেও যে ভাষা যত পারে সে ভাষা তত উত্তম। ইহাতে বুঝি সে ভাষা কহিবার লোকেরা সংযত-চিত্ত চিন্তাশীল। ইদানী ইংরেজীর ফাঁপা অনুকরণে বাংলা ভাষা অসংহত, ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে। এটা মুখ্যতঃ লেখকের দোষ বটে, বলিবার কিছু নাই, দেয় কিছু নাই, প্রভাতে মেঘ-ডম্বর, শব্দপুঞ্জ। সংস্কৃত শব্দকোশের পর্যায়-শব্দ অনেক লেখকের বাগাড়ম্বর-প্রিয়তা উৎসাহিত করিয়াছে। সংস্কৃতে পর্যায়-শব্দ আছে বটে, বাংলাতেও আছে; কিন্তু পর্যায়-শব্দ আর প্রতি-শব্দ এক নয়। এক পর্যায়ের এক এক শব্দ এক এক গুণ প্রকাশ করে। সংস্কৃত দর্শন ও বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিই, সংস্কৃত কাব্যের ভাষা দেখুন; ভাষার সংযম দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাংলায় 'ত্রস্ত, ভীত, চকিতনেত্রে' পড়িলে বুঝি লেখকের শব্দ-জ্ঞান নাই, কিম্বা তাহাঁর মন ধূম্রময়, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। শব্দ ভাবের বাহন; ধনীর পাঁচসাত রকম বাহন থাকিতে পারে, কিন্তু একটা দ্বারা তাঁহার গমন নিষ্পন্ন হয়। সাধুভাষায় বাহন অনেক, চলিত্ ভাষায় একটি মাত্র।

ইহা-ই ঠিক, একটা কর্মের জন্য পাঁচটা যন্ত্র অনাবশ্যক। পরন্তু পাঁচটায় হাত পাকাইতে শক্তি-ক্ষয় হয়। 'ভাত-রাঁধা, ব্যন্নন রাঁধা'। 'রাঁধা'কে 'রন্ধন করা' বলায় কিছুমাত্র লাভ নাই, 'অন্নপাক ব্যঞ্জনপাক' বলিলে অন্ন-ব্যঞ্জনের স্বাদ বাড়ে না। কিন্তু 'অন্নব্যঞ্জন-পাক' বলিলে বক্তার ও শ্রোতার গৌরব বাড়ে। লোকে বলে, 'ছেলের ভাত,' কিন্তু পণ্ডিত বলেন 'অন্নপ্রাশন'। অতএব সকলে বলুক না বলুক, তাহাকে 'অন্নপ্রাশনে'র অর্থ বুঝিতে হইবে। 'মাথা' ঠিক রাখিতে পারিলেই ভাবা-

চিন্তা চলে, 'মস্তক' না থাকিলেও ক্ষতি নাই। লোকে মাথায় তেল মাখে, মাথায় করিয়া মোট বহে, স্বজনের বিপদে তাহাকে মাথা দিয়া রাখে, শত্রুর মাথাও খায়। তাহার মস্তক কখনও 'চর্বিত' হয় না, 'ধৃত'ও হয় না। পাগলে 'মাথা-মুণ্ড' কি বকে, বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কবিরাজ-মহাশয় বলেন, রোগটি শিরঃপীড়া, অতএব 'শির' যে মাথার আর এক নাম, তাহা না শিখিলে নয়।

এইরূপ অসংখ্য দুইটা দুইটা শব্দ দ্বারা দ্রব্য গুণ কর্ম বুঝিতে হয়। এই হেতু শিখিতে হয়, শ্রমলাঘবের উপায় নাই। সাধারণ ভদ্রলোকে যে শব্দ বলেন, বুঝেন, সে শব্দ প্রথম শিখিতে হইবে। মৌখিক ভাষার শব্দও এই। কিন্তু বিপদ এই, দেশভেদে ভদ্রলোকের ভাষার ভেদ আছে। ক্রমে ক্রমে এই ভেদ অদৃশ্য হইবে; একই ভাষা-শিক্ষা যত প্রসারিত হইবে, ভাষা-ভেদের মূলও তত ক্ষয় পাইবে। শুনিতেছি, আদরিদ্র সকলেই আত্মশিক্ষা পাইবে, পাইলে ভাষাও এক হইয়া দাঁড়াইবে।

সে ভাষা কেমন হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ পাঠ্যপুস্তক-নির্ধারক-মহাশয়েরা মদনমোহনের "শিশুশিক্ষা" ও বিদ্যাসাগরের "বোধোদয়" অ-পাঠ্য বিবেচনা করিয়াছেন। আমার বিবেচনায়, জাত্যবাংলার এমন বই আর হয় নাই। "শিশু-শিক্ষা"র ভাষার লালিত্য এবং "বোধোদয়ে"র বোধের উদয় নর-রচিত একখানি বইতেও নাই। আশ্চর্য এই, সেদিন দেখিলাম "শিশুশিক্ষা"র "পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির," কে এক পণ্ডিত কাটিয়া "নিশার শিশির" করিয়াছেন! "বোধোদয়ে"র কাঁ-ঠা-ল, কাঁ-টা-ল, এবং 'রং,' র-ঙ্ হইয়াছে কি না, দেখি নাই।

(২) বাংলা অভিধান

ছোট বড় বাংলা অভিধান পাঁচ সাতখানা আছে। যার যেমন প্রয়োজন, তার তেমন অভিধান আছে। অভিধান সঙ্কলন বিষম কাজ। অতি গুরুতর কাজ, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের গুরু হইবার কাজ। কোন্ শব্দ লইব, কোন্‌টি না ; কোন্ অর্থ ধরিব, কোন্‌টি না ; কেমন বানান করিব, কেমনটি না। শব্দপূর্ণ বৃহৎ কোশ পাইলে এই চিন্তা। কিন্তু যদি সে কোশ না থাকে, ভাষা শুনিয়া ও পড়িয়া শব্দ চয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমের ও বিচারণার অবধি থাকে না। সংস্কৃতকোশ হইতে কতক শব্দ তুলিতে পারি। কিন্তু বাংলাভাষা সংস্কৃত নয়। অসংখ্য দেশী শব্দ বিস্তীর্ণ দেশে ছড়াইয়া আছে, ধীর মনে নিজের গজে মাপিয়া জুখিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। সে শব্দের মূলার্থ কে জানে, বানানই বা কে জানে। দেশের দুর্ভাগ্য যে, এই বিষম কাজ এক জনকেই করিতে হয়, সাহায্য পাইবার জো নাই। পাইলেও গজটি নিজেরই থাকে। নিজের গজ নিশ্চয় নিজের আঙ্গুলে মাপা। সে গজে নিজের জানা-শোনা প্রিয় মাতৃভাষার শব্দ সমান, অন্য শব্দ ছোট। মানুষের সকল কাজেই আত্ম-প্রীতি, আর আত্ম-তৃপ্তি না থাকিলে কাজও হয় না।

দুইখানি বাংলা অভিধান দেখি। একখানি শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস করিয়াছেন। এই অভিধানের নূতন সুখ্যাতি কি আর করিব ? ইনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গ্রাম্য শব্দ হইতে বিশুদ্ধ প্রাদেশিক শব্দ নির্বাচন করা কঠিন। কোন্ শব্দ কোন্ প্রাদেশিক এবং কোন্‌গুলি সাহিতে স্থান পাইতে পাইতে প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহা নির্ণয় করাও সহজ নহে।" অর্থাৎ এই অভিধানের সকল শব্দ জাত্য নহে, লেখককে শব্দের জাত্য-অজাত্য বিচার করিতে হইবে। না বাছিয়া দুই একটা শব্দ দেখি। "তড়পা (তড়্পা) [প্রাদে] আটি, মুষ্টি-

প্রমাণ। প্রয়োগ—এক তড়্পা বিচালি।” ২৪ পরগণা জেলায় (যেমন বজ বজে) ৩২ আটি খড়ে এক ‘তড়্পা’ হয়। বহু প্রচলিত নাম তা-ড়া। ছোট তাড়া, তা-ড়ী। প্রায়ই ২০ আটিতে, এক পণের বিভাজ্য অংশ। “বিচালি, বিচিলি, বিচুলি, [হি বিচালি] ধান্যের শুষ্ক গাছ। প্র—“খোল বিচিলি ঘাস”—ঈশ্বর গুপ্ত।” এখানে দ্রষ্টব্য, অভিধান-কার মনে করেন, হিন্দী হইতে বি-চা-লি। আরও দ্রষ্টব্য, তিনি “ধান্যের শুষ্ক গাছ” লিখিয়াছেন, ‘খড়’ লেখেন নাই। ‘খড়’ কি ? “খড়, ভঙ্গ। ১। ক্ষুদ্রতৃণ। স্ত্রী, খড়ী—খড়ীমাটি ; খটী।” অর্থাৎ, এই অভিধানমতে দূর্বাঘাসও ‘খড়,’ এবং এই খড় শব্দ হইতে খড়ী, ও খড়ীমাটি। ‘ভঙ্গ’ অর্থে খড় শব্দের প্রয়োগ বাংলায় নাই। “তেলাকুচা (ত্যালাকুচা) [প্রাদে] বিম্বফল।” অর্থাৎ ‘তেলাকুচা’ নাম চলিবে না, বিম্বফল বলিতে হইবে। “তেতালা [ত্রিতল শব্দজ] তিনতালা ঘর। ২। বাদ্যের তাল বিশেষ।” শব্দটি তে-তলা, গ্রাম্য তে-তালা। ইহার সহিত বাদ্যের ‘তে-তালা’র কোন সম্বন্ধ নাই।

এই অভিধানে বহু শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দও আছে। পাঠক শব্দ পাইলে এই অভিধানে অর্থ পাইবেন। অভিধান-কার শব্দের উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এই পরিশ্রম অনাবশ্যক ছিল, কি বানানের কি উচ্চারণ, তাহা গোটাকয়েক সূত্রে বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক শব্দে দেখাইতে গিয়া ভাষাকে ভীষণ করা হইয়াছে। “ধর্ম্মভয়,” উচ্চারণে “ধর্‌মোভয়,” “ধর্ম্মব্রত,” উচ্চারণে “ধর্‌মোব্‌ব্রোতো,” এইরূপ উচ্চারণ সে সূত্রের বিরোধী, শুনিও না। “ত্রিবেণী” উচ্চারণে “তৃবেনি,” এটা আরও বিষম, ‘খ্রীষ্টাব্দ’ বা ‘খ্রিষ্টাব্দ’ না লিখিয়া খৃ-ষ্টা ব্দ এই ভুল বানান করার তুল্য। এইরূপ অসংখ্য উচ্চারণ স্বীকার করিতে পারি না।

দ্বিতীয় অভিধানখানি শ্রীযুত রাজশেখর বসু-সঙ্কলিত “চলন্তিকা”।

ইহার ভূমিকায় শ্রীযুত বসু লিখিয়াছেন, "যাঁহারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা প্রধানতঃ যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন, বিনা বাহুল্যে তাহা সাধিত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য। * * আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত শব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। * * মনে রাখা আবশ্যক যে চলিত ও কথ্য ভাষার শব্দ সর্ব্বত্র একপ্রকার নয়। চলিতভাষা সাধুভাষার তুল্যই সাহিত্যিক ভাষা, সেজন্য চলিত শব্দের রূপ ক্রমশঃ সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কথ্য শব্দে প্রাদেশিক বিকৃতি থাকিবেই। 'সত্যি,' 'নতুন' প্রভৃতি চলিত ভাষায় অর্থাৎ সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু 'অবিশ্যি, বিষ্টি, রাত্তির' এখনও তেমন চলে নাই, এবং 'কুচ্ছিত, আঁব, বে, পোলোয়া, ব্যায়রা, গেশ্‌লো (গিয়াছিল)' প্রভৃতি শব্দ কথ্য ভাষাতেই আবদ্ধ।"

অতএব দেখা যাইতেছে, "চলন্তিকা"য় "চলিত"-ভাষার ও "কথ্য" ভাষার শব্দের প্রভেদ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে মতভেদ অবশ্য থাকিবে, কিন্তু মোটের উপর বহু বহু শব্দ ঠিক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। "চলন্তিকা"য়, খড়ের তাড়ি অর্থে 'তড়পা' নাই, 'তেলাকুচা' প্রাদেশিক হয় নাই, 'তেতলা' তে-তা-লা হয় নাই। ইহাতেও খ-ড়, "শুষ্ক তৃণ"। কিন্তু বি-চা-লি (বিচুলি, বি-চি-লি নাই) ধান ইত্যাদির খড়। "পগার সং প্রাকার, ডোবা, খানা।" প-গা-র অর্থে যদি কোথাও ডোবা, খানা থাকে, সে অর্থ স্বীকার করিতে পারি না। লোকে প-গা-র তুলিয়া বেড়া দেয়, মাটি কাটিয়া লওয়াতে খানা হইতে পারে, কিন্তু প্রা-কা-র 'খানা' হইতে পারে না, 'ডোবা' কদাপি না। জল-নালা, জল-জাঅনা, নর্দমাকে প-গা-র বলিতে শুনি না। আর এক শব্দ দেখি। "পড়েন, পোড়েন কাপড়ের প্রস্থের দিকের সুতা (টানা-পড়েন)।" কিন্তু দাঁড়ি-পাল্লা দিয়া ওজন করিবার প্র-তি-মা-ন, প-ড়ি-য়া-ন শব্দ বাদ পড়িয়াছে। প-ড়েন বানানও ঠিক নয়।

কোশ কখনও সম্পূর্ণ হয় না। "চলন্তিকা"য় ২৬ হাজার শব্দ আছে। অল্প নয়। ৬×৩।। ইঞ্চি আড়ার ৫৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে এত শব্দ পোরা সামান্য কথা নয়। শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু স্পষ্ট। বহুতর সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা এত শব্দের স্থান করা হইয়াছে।

"চলন্তিকা" কেবল কোশ নয়, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণও বটে। মন দিয়া পড়িলে পাঠক এই ব্যাকরণ হইতে অনেক বিষয় শিখিতে পারিবেন। সাহিত্য পড়িয়া ব্যাকরণ-শিক্ষা অল্পশ্রমে ঘটে না। "চলন্তিকা"র দোষ এই, ইহার ধাতুরূপের সংজ্ঞা "মুগ্ধবোধে"র সংজ্ঞাকে হারাইয়াছে, মনে হয় যেন 'কৈমিতিক বীজ'। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের বাংলা পারিভাষিক রচনা অতিশয় কঠিন। "চলন্তিকা"য় বাংলা পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বহু বহু লেখকের উপকার হইবে। মোটের উপর, "চলন্তিকা"র তুল্য যথা-সম্ভব সম্পূর্ণ শব্দকোশ আর নাই। আমি "চলন্তিকা"র সব বানান স্বীকার করিতে পারি না। এ বিষয় পরে দেখিতেছি।

(৩) দেশী নামমালা

লেখা-পড়া করিতে হইলে, বাংলা শব্দ শিখিতে হইলে, বাংলা কোশ পড়িতে হইবে। 'কথার মানে' দেখা নয়, কথা শেখা। চারিবার পাঁচবার নয়, অনেকবার কোশ পড়া, মুখস্থ করা। বড় কোশ নয়, ছোট কোশ। বড় কোশের নানাবিধ প্রচলিত অপ্রচলিত শব্দ শিখিবার প্রয়োজন কদাচিৎ ঘটে ; ঘটিলেও মুখস্থ রাখিতে পারা যায় না। আর, যদি কোশ মুখস্থ না রাখি, শব্দ কোথায় পাইব' সাহিত্যে অল্প পাইব, অধিক পাইব না। কতক ভুলও পাইব। বালকে মনে করে, মনে করা অন্যায়ও নয়, ছাপা বইতে যা থাকে সব শুদ্ধ। জ্ঞান হইলে ভ্রম চলিয়া যায়। শব্দটি সংস্কৃত হইলে তাহার বানান শুদ্ধ হইয়া থাকে, গ্রন্থকার কোশ দেখিয়া

লেখেন। কিন্তু শব্দটি দেশী হইলে বানানে ভুল থাকিতে পারে। উভয় স্থলে প্রয়োগভুলও পাওয়া যায়। বিস্তালয়-পাঠ্যপুস্তকেও দেখিয়াছি। আর, কয়খানা ক্রম-বদ্ধ পাঠ্যপুস্তক আছে? এমন ক্রম-বদ্ধ যে, বালক আট বৎসরে পাঁচ হাজার শব্দ শিখিতে পারিবে। পাঁচ হাজার বাছা শব্দ। আমি ইস্কুল হইতে "সাহিত্য" এই নামটা উঠাইয়া দিতে চাই। বালকেরা "সাহিত্য" নয়, ভাষা শিখিবে, সে ভাষা বাংলা হউক, ইংরেজী হউক, সংস্কৃত হউক, উর্দু হউক, যাহাই হউক, ভাষা।

পড়িতে ভাল লাগিবে, বালকের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে, অথচ পাঁচ হাজার নিত্য প্রয়োজনীয় বাছা শব্দ থাকিবে, এমন বই রচনা কঠিন। অতএব একখানি কোশ চাই। সে কোশে অমরকোশের পদ্ধতিতে এক এক বর্গ ধরিয়া শব্দ সঙ্কলিত হইবে। কারণ, কোশের তিন প্রয়োজন, (১) কোশ ভাষার শব্দকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না, (২) শোনা কিম্বা পড়া শব্দের অর্থ বলিয়া দেয়, আর (৩) অ-শোনা, অ-পড়া শব্দ শেখায়। এক এক শব্দ এক এক জ্ঞানের আকর। যেকোন কোশ বারবার পড়িতে পড়িতে তিন-ই পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত কোশে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও নানা অর্থ থাকাতে সমগ্র কোশ মুখস্থ করা কঠিন। আবশ্যক নামটি কি, কোথায় আছে, তাহা স্মরণ না হইলে প্রয়োগ করিতে পারি না। অমরকোশ দ্বারা তিন প্রয়োজনই সহজে সিদ্ধ হয়। শোনা কিম্বা পড়া শব্দের মোটামুটি অর্থ পাই, অ-শোনা অ-পড়া শব্দও পাই। প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা অভিধান দ্বারা প্রথম দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তৃতীয় প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে এক এক জেলায় একই দ্রব্যের এক এক নাম প্রচলিত আছে। অবশ্য বহু নামে প্রভেদ নাই। কিন্তু অন্য বহু নামে আছে। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"য় এই সকল নাম অমুক জেলার কিম্বা অমুক গ্রামের "গ্রাম্য শব্দ" অথবা "প্রাদেশিক শব্দ" নামে সঙ্কলিত

হইতেছে। একই শব্দের বিভিন্ন রূপ কিম্বা একই দ্রব্যের বিভিন্ন নাম বিলুপ্ত করিয়া এক রূপ এক নাম প্রচলিত করা বাংলা ভাষার উন্নতি-কামীর প্রথম কাজ। সে কাজ এক দেশী নাম-মালা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। 'টাকা গণিয়া লও', স্থান-বিশেষে শিক্ষিতজনেও বলেন, 'গু-ণি-য়া লও'। ছাপাতেও দেখি, 'গো-না—গুন্তি'। কিন্তু বিপদ এই, দশ-দশ 'গণিলে' যে ফল, দশ-দশ 'গুণিলে' সে ফল হয় না। একবার এক গল্পে পড়ি, 'সে দিন গোনে'। আমি বার বার পড়িয়া অর্থ বুঝিতে পারি নাই। দেশী-নাম-মালা অবশ্য জাত্য-নাম-মালা হইবে, এবং এইরূপ বহুতর জঞ্জাল হইতে ভাষাকে মুক্ত করিবে। এই নাম-মালায় অর্থ দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু প্রথম প্রথম পৃথক টীকাও করিতে হইবে। এই টীকায় ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত নাম থাকিবে। যেমন, "কা-শিমুলা বৃক্ষ স" কু-শাল্মলি। নদীয়ায় জিওলী, শ্রীহট্টে ঝিঁকা," ইত্যাদি। দেশে পদ্য-রচকের অভাব নাই। নামগুলি পদ্যে বাঁধিয়া দিলে বারবার পড়িতে পড়িতে মুখস্থ হইয়া যাইবে। নাম মুখস্থ না থাকিলেও নাম-মালার কোথায় পাইব, তাহা অক্লেশে বাহির করিতে পারা যাইবে।

(৪) বানান

"চলন্তিকা"র পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে, "সংস্কৃত শব্দের বানান সুনির্দিষ্ট, কিন্তু অসংস্কৃত শব্দে এখনও যথেচ্ছাচার চলিতেছে। এই অভিধানে বহুস্থলে একাধিক প্রচলিত বানান দেওয়া হইয়াছে। অস্থির বানানকে স্থির রূপ দেওয়া অভিধানকারের কাজ নয়, তাহা লেখকগণের প্রভাব ও সাধারণ রুচি-সাপেক্ষ।" এই সামান্যোক্তির বিশেষ অবশ্য আছে। কে অ-স্থির বানান স্থির করিবেন ? যিনি যথার্থ জানিয়াছেন। কে জানিয়াছেন ? যিনি ব্যাকরণ ও কোশ একত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন,

তিনিই ভাষার শব্দ, বিভক্তি, প্রত্যয় অবলোকন করিয়া সামান্য বিধি বলিতে পারেন। কোশের প্রামাণ্যের কারণই এই।

ভাষার যাবতীয় শব্দ যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যে উঠিবে, এমন কথাও নয়। লেখক কত বই পড়িবেন ? অভিধান-কার লেখককে সাহায্য না করিলে, কি জন্য অভিধান ? বর্তমানে অভিধান-কারকে বহু বহু শব্দ নিজের বিবেচনায় বানান করিতে হয়। তিনি দেখেন, (১) পারম্পর্য, (২) শব্দের ব্যুৎপত্তি, (৩) উচ্চারণ। ভাষণ, হাওয়ায় উড়িয়া যায় ; লিখন, ভাষণের দেহ বাঁধিয়া রাখে। অজ্ঞাত-মূল শব্দ যেমন শুনি, তেমন বানান করি। যেমন, শুনি ইংরেজী একটা মাসের নাম, জা-নু-আ-রি। শব্দের মধ্যে কিম্বা অন্তে আ স্বর লিখিতে বাঙ্গালীর কলমে বাধে, লেখে জা-নু-য়া-রি। দেখিতে গেলে, জা-নু-আ-রি বানান উচ্চারণ-অনুযায়ী, অর্থাৎ ধ্বনি-সম্বাদী। কিন্তু বলি, ল-ব ন, লিখি ল-ব-ণ। যেহেতু ল-ব-ণ বানান পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। আমরা কথায় বলি, সংস্কৃত শব্দের বানান সংস্কৃত রাখা বিধেয়। কিন্তু ল-ব-ন শব্দ সংস্কৃত নয়, বাংলা। সংস্কৃত শব্দটি ল-ব-ণ, কদাপি ল-ব-ন নয়। বলি, ষু-স্রী, লিখি সু-শ্রী। সু-শ্রী সংস্কৃত, কিন্তু এই ধ্বনি বাংলায় নাই। ধ্বনির সহিত মিলাইলে সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অত্যল্প আছে। তথাপি পারম্পর্য-রক্ষা হেতু আমরা সংস্কৃত বানান করিয়া থাকি। কারণ পারম্পর্য দ্বারা ঐক্য রক্ষিত হয়, এবং ঐক্য রক্ষিত হইলে ভাষা স্থায়ী হয়, সাহিত্যও হয়। ইংরেজী শব্দের বানান দেখিলে এই বিধির গুরুত্ব স্পষ্ট হইবে। ইংরেজী 'থ্' লিখিতে ইংরেজেরা তিনটা অনাবশ্যক অক্ষর জুড়িয়া দেন। তাহাঁরা দিবারাত্র সময়ের ও শক্তির মূল্য কষেন, কিন্তু বালক বৃদ্ধ সকলেই বানানে অনাবশ্যক অক্ষরের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছেন। কারণ, বানান একবিধ না হইলে, লেখা পড়া অসম্ভব। অর্থাৎ পারম্পর্য যত গুরু, ধ্বনি-বিচার তত নয়।

বাংলা ভাষায় আরও অসংখ্য শব্দ আছে। সে সকল শব্দ বানানেও সংস্কৃত নয়, কিন্তু উৎপত্তিতে সংস্কৃত। "সংস্কৃত-প্রাকৃত" ভাষার পণ্ডিতেরা এই সকল শব্দ 'তদ্ভব' অর্থাৎ সংস্কৃত-ভব বলিতেন। বাংলা ভাষায় পূর্বকালের সংস্কৃত-প্রাকৃত নিজের গতিতে বর্তমান রূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে রূপে সংস্কৃত বানানের প্রভাব আছে, নাইও। কিন্তু পারম্পর্য-বিধি এখানেও প্রযোজ্য। যেমন, "সারি সারি কাঁঠাল গাছ পনরটা, আম গাছ সাতটা। বড় বড় গাছ, ভাল ভাল আম। এ বছর কাঁঠাল ছোট হয়েছে। কিন্তু মধুর মত মিষ্টি। পগারে আশুদ গাছ না থাকিলে গাছগুলি বাড়িতে পারিত।" এখানে প্রত্যেক শব্দ দেশী। পূর্বাগত বানান দেখিয়া শব্দগুলি বুঝিতেছি। দ্রষ্টব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁ-টা-ল (-পাড়া) তাহাঁর প্রভাবে জাত্য হইতে পারে নাই। এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অশ্বত্থ বৃক্ষের বাংলা নাম কি ? নদীয়ায় বলে অ-শ-থ। "চলন্তিকা"য়, "অশ্বত্থ পিপ্পল, বা° অশ্বত্থ গাছ।" শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিয়াছেন, "অশদ গাছ"। রাঢ়ে বলে, আ-শু-দ। কেন বলে ? 'অ' পরে যুক্ত ব্যঞ্জন আছে ; কাজেই 'আ'। 'শ'তে অন্তঃস্থ ব, কাজেই 'শু'। শেষের 'থ' বাংলায় 'ত্' হইবার কথা, যেমন স° তু-থ, তু-ৎ, তু-তি-য়া। কিন্তু পরিষৎ, আপৎ, উপনিষৎ ইত্যাদির ৎ বাংলায় দ্ হইয়া থাকে। এই হেতু আ-শু-দ। শুধু রাঢ়ে নয়, শ্রীহট্ট পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে আ-শু-দ। কারণ পরিবর্তনটি বাংলাভাষার নিয়মে হইয়াছে। কিন্তু পাছে কেহ বুঝিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় অ-শ্ব-ত্থ লেখা হইতেছে। এইরূপ কারণে, অনেক সংস্কৃত শব্দ ইদানী বাংলায় চলিয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত দেশী-নামা-মালা খুজিতেছি।

(৫) বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের বানান

শ্রীযুত রাজশেখর বসু "চলন্তিকা"য় বানান বর্ণনা দ্বারা উত্তম কাজ করিয়াছেন, বহু লেখক উপকৃত হইবেন। এখন যে 'যথেচ্ছাচার' চলিতেছে, তাহার কারণ 'ইচ্ছা' নয়, অজ্ঞতা। নিয়ম জানিলে কেহ তাহা ভাঙ্গিতে চায় না।

কয়েকটা বানান আলোচনা করি। কে-রা-ণি ঠিক, কারণ সং ক-র-ণি-ক। কিন্তু ণ বানান অনাবশ্যক। শা-ড়ী ঠিক, কারণ শা-টী-র ট স্থানে ড়। বা-ড়ী ঠিক, কারণ সং বা-টী। স' বা-টি-কা মূল হইলে বা-ড়ি-য়া হইত। যেমন, 'বাঁশবেড়িয়া'। দী-র্ঘি-কা হইতে দী-ঘি। আমি হা-তী, পা-খী বানানের পক্ষে। কিন্তু বিদেশী 'কমি বেশি বাকি পাজি রাজি' লেখা ঠিক মনে করি, কারণ এখানে উচ্চারণই প্রমাণ।

কু-আ, তু-লা, সু-তা, ধুঁ-আ, রু-পা প্রভৃতি যে সকল শব্দে উ পরে দীর্ঘস্বর আছে, সে উকার ঊকার হইতে পারে না। কিন্তু পূ-ব, চূ-ন, তূ-ল, সূ-চ বা ছুঁচ। ("চলন্তিকা"য় ধুঁ-আ নাই ; আছে ধোঁ-য়া।) বিদেশী উ-ল, ফ্লূ-ট শব্দে উ বানান কর্তব্য। নূতন শব্দে ধ্বনি-সম্বাদী বানান যত রাখিতে পারা যায়, ততই ভাল।

ইদানী কেহ কেহ অকারান্ত বিশেষণের অ-কার স্থানে ও-কার লিখিতেছেন। যেমন, ভা-লো। কিন্তু ভা-ল বানানে দোষ কি ? কেহ বলেন নাই, বলা আবশ্যক মনে করেন নাই। বোধ হয়, তাহাঁরা ভা-লো বলেন, এবং এই হেতু সারা বাংলা দেশকে ভা-লো কা-লো বলিতে হইবে ! পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় ভা-ল বলে। সে উচ্চারণ কেন ছাড়িব ? যে তিন সূত্র অনুসারে বাংলা শব্দের বানান নিয়মিত হয়, সে তিন সূত্রই ছিঁড়িয়া যায়। যদি কোথাও অকারান্ত স্পষ্ট করিতে হয়, সেথায় অক্ষরের

পাশে একটা চিহ্ন দিলেই চলে। আমি আমার গ্রন্থে অক্ষরটির তলে রেখা দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে শোভা নষ্ট হয়। এখন মনে করি, অক্ষরের পাশে বিন্দু বসাইলে সে দোষ হয় না। যেমন, ভাল যেমন, 'কাল অজ্ঞাত বলিয়া কাল-রঙ্গে কালী চিত্রিত হইয়া থাকেন।' যাবতীয় তা-ন্ত শব্দ অকারান্ত। এই নিয়মে ম-ত বিশেষণ, ম-ত্ বিশেষ্য। এইরূপ, চলিত্ উচিত্ লেখা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন হয় না। অ-র্থা-ৎ এই শব্দের ত মূলেই ৎ। এই আকৃতি-ভেদ দ্বারা ম-ত্ ও মৎ এর অর্থভেদ করা যাইতে পারে। "ব-ড়্ গাছ বড় হয়। বিচালির ব-ড়্ হয়, খড়ের হয় না, খড়ে পালা থাকে।" এইরূপ আবশ্যক শব্দে হসন্ত দিলেই বিশেষ্য বুঝিতে পারা যায়।

প্রয়োজক অর্থে ধাতুর উত্তর আ-ন প্রত্যয় হয়। যেমন, ক-র্ ধাতু হইতে ক-রা-ন। ইদানী নব্যেরা ক-রা-নো লিখিতেছেন। ক-রা-ন বিশেষণ, সুতরাং অকারান্ত। অত্যল্প দেশ ব্যতীত লোকে আ-নো বলেও না। বিশেষণ শব্দ বিশেষ্য-রূপেও চলে। তখন ন্। যেমন দুধের যো-গা-ন্। বিশেষণের বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ অল্প। এই অল্পের জন্য বহুর বানান-বিকার কর্তব্য নয়। ইহাতেও মনস্তুষ্টি না হইলে আ-না প্রত্যয় ধরা যাইতে পারে। যেমন, ক-রা, ক-রা-না। দুইই বিশেষণ। আ দৃষ্টান্তে আ-না। রাঢ়ে আ-না অজ্ঞাত, অপ্রচলিতও নয়। যাহাই করি, সাধারণ সম্পত্তিতে নিঃশব্দে আপ্তরুচি চালানাই "যথেচ্ছাচার"।

নূতন স্বরযোগ দোষাবহ, আবশ্যক স্বরলোপও দোষাবহ। 'আজ কাল চাল ডাল' ইত্যাদি বানান ঠিক নয়। 'কাল কাল হয়েছে, চালে খড় নাই, নবাবী চালে ক-দিন চলে', ইত্যাদির দুই কা-ল, চা-ল এক নয়। ক-ল্য হইতে কা-লি, কা-ই-ল ; চা-ল্ হইতে চা-উ-ল, চা-ই-ল। আর, চা-লি (চলন) হইতে চা-ই-ল। এই ই ঈষৎ উচ্চারিত হইলেও

স্পষ্ট। ইহার অক্ষর করিতে আপত্তি দেখি না। তখন 'আজ কাল চাল ডাল। হালের চাল-চলন ভা-ল নয়, হালেও পানি পায় না'। ক্রিয়ার পে এই ঈষৎ ই-কারের বহু প্রয়োজন আছে।

'এমন, কেমন, এক' প্রভৃতি শব্দে এ উচ্চারণ নিন্দার কথা নয়। এ উচ্চারণ দ্বারা ভাষা বিকৃত হয় না। দেশের অনেক স্থানে এ-ম-ন বলে। এইরূপ, বিদেশী 'কেমিকাল, মানেজার, মেলেরিয়া' লিখিলে কোন দোষ দেখি না। লোকে 'মাজিষ্টর' সাহেবকে ভয় করে, 'বেং, বেঙ্গাচি' চেনে। যদি বিদেশী শব্দে ধ্বনি-সাম্য চাই তাহা হইলে একটা নূতন অক্ষর করাইলেই হয়। নূতন অক্ষরের অভাবেই কেহ অ্যা, কেহ এ্যা, য়্যা, কেহ আরও কত কি বুদ্ধি খাটাইতেছেন। ফলে, যে য়, য অক্ষরের পুনরুদ্ধার প্রয়োজনীয় হইয়াছে, সেটাকে আরও বিকৃত করা হইতেছে। স্বরবর্ণে কোনও ফলা বসে না। 'আ', 'এ' অক্ষরে য-ফলা দিতে পারি না। বাংলা ভাষায় কোন শব্দে আদ্য অক্ষর 'য়' নাই, হইতে পারে না। এই কারণে য়ূ-রো-প বানান ভুল, অভিধানে ইহার স্থান নাই। লিখিতে হইবে, ই-য়ূ-রো-প, আরও ভাল ই-য়ো-রো-প। শ্রীযুত বসু লিখিয়াছেন, "দেবনাগরীতে অ অক্ষরে ও কার লাগাইলে ঔ অক্ষর হয়, বাংলাতেও সেই রীতিতে অ্যা হয়।" কিন্তু দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই, স্বরাক্ষরে য-ফলাযোগ ত নয়। তিনি লিখিয়াছেন "এখানে ্যা চিহ্নকে য ফলা + আকার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যাইতে পারে।" কিন্তু এত গণ্ডগোলে কেন যাই ? এত ব্যাখ্যাই বা কেন ? একটা চিহ্নের দুইটা অর্থ, বিজ্ঞানসম্মতও নয়। ধ্বনিটি এ-আ। 'এ্য' ছাপিলে 'ত্রা' মনে হইতে পারে। নাগরী এ-তে ৷ দিলে চলে (এ)। সে অক্ষর শব্দের আদ্যে মধ্যে একই রূপ হইবে। দুই রূপ রাখিয়া অক্ষর বৃদ্ধি না করাই ভাল।

কয়েক মুসলমান লেখক যি-লা, না-যীর, নি যা-ম লিখিতেছেন।

তাহাঁরা শব্দগুলির আর্বী উচ্চারণ রাখিতে চান। কিন্তু বাংলা অক্ষর দ্বারা ইংরেজী z অক্ষরের ধ্বনিপ্রকাশের উপায় নাই। য অক্ষর দ্বারা সে ধ্বনি প্রকাশ করিতে বসিলে হিতে বিপরীত হইবে, কোথায় জ, কোথায় z, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। য-দি, যুগ, যো-গ ইত্যাদিতে z আসিয়া পড়িবে।

ছাপার হরপের অভাবে অন্তঃস্থ ব উঠিয়া গিয়াছে। এই অক্ষর থাকিলে 'ওয়া' লেখায় একটি অক্ষর কম হইত, সংস্কৃত বই বাংলা অক্ষরে শুদ্ধ ছাপা হইতে পারিত। আসামী ৱ অক্ষর মন্দের ভাল। কিন্তু ু ৃ যোগ করিতে গেলে স্বরূপ অদৃশ্য হয়। ৱ ফলাও ত চাই। মুদ্রাকর মহাশয়েরা অভাব পূরণ করুন। বর্তমানে যখন অন্তঃস্থ ব নাই, উচ্চারণও নাই, তখন 'কিম্বা কিম্বদন্তী বশম্বদ' প্রভৃতি অশুদ্ধ বলিতে পারি না। পারম্পর্যও এই। এই হেতু, 'সন্মান, সন্মত' অশুদ্ধ নয়।

বানানের কথায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাও তুলি। বড় বড় পণ্ডিত দোষ দিয়াছেন, আমি বানান বদলাইতে বসিয়াছি। কথাটা একটুও সত্য নয়। আমি কয়েকটা বাংলা অক্ষর-সংস্কারের পক্ষে, কিন্তু বানানে রক্ষণশীল। বানানের মধ্যে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন, একটি লিখিতে বলি। যেহেতু (১) বহুকাল পূর্বে পারম্পর্য ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আমরা তর্ক্ক, দুর্গ্গা, নির্ন্নয় ইত্যাদি লিখি না। এক শত বৎসর পূর্বেও বিকল্পে ছিল। (২) বাংলার বাহিরে ছাপা সংস্কৃত ও নাগরীতে নাই। (৩) আমরা দ্বিত্ব উচ্চারণ করি না। ভাষায় আমরা ধ-র-ম্ বলি, ধ-র্‌-ম্, বলি না, বলিলে 'ধরম করম' পাইতাম না! (৪) দ্বিত্ব দ্বারা অক্ষরের আকৃতি ক্ষুদ্র করিতেও চাই না। আর যে রু রূ শু গু ইত্যাদি লিখি, তাহাতে বানান পরিবর্তিত হয় না। এ বিষয়ে মৎকৃত ব্যাকরণে সবিশেষ বলা গিয়াছে।

"চলন্তিকা"-কার ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, কিন্তু একটি প্রত্যয়ের পাশ ঘেঁষিয়াও যান নাই। বিশেষ্য শব্দে ইয়া প্রত্যয় যোগ, যেমন, বারমাসিয়া ; সংক্ষেপে বারমাস্যা, বারমেস্যে ; চাকর চাকরিয়া চাকর্যে। 'চাকর্যে বাবু,' কদাপি 'চাকরে বাবু' নয়। "চলন্তিকা"য় "চাকরে যে চাকরি করে।" 'চাকরে' বানান ভুল। ইহাতে প্রত্যয় কই ? বিনা প্রত্যয়ে অর্থবিস্তার হইতে পারে না, উচ্চারণও আসে না। অসংখ্য ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ আছে। 'আলস্যে, আমোস্তে, গল্প্যে, কুড়্যে, খুঁৎখুঁত্যে, টন্-টন্যে (বুদ্ধি), পাহাড়্যে, বেল্যে, (বালিয়া), গুড়্যে 'চোলশ্যে' ইত্যাদি। এই ইয়া প্রত্যয় দ্বারা নানাবিধ অর্থ প্রকাশিত হয়। ই পরে আ থাকাতে বর্তমানের উচ্চারণে আ স্থানে এ হয়, কিন্তু য় লুপ্ত হয় না। 'গুড়ে বালি, গুড়্যে সন্দেশ' দুই-ই 'গুড়ে' উচ্চারিত হয় না। 'ইয়া' ব্যতীত 'উয়া' আছে। এখানে উ পরে আ থাকাতে উস্থানে ওকার হয়। যেমন, জল জলুয়া জল্যো। 'জোলো' লিখিলে ধ্বনি পাই বটে, কিন্তু শব্দ বুঝিতে কষ্ট হয়। 'জলো' একবারে ভুল। (সংস্কৃত ব্যাকরণে ইয়া উয়া দেখিতে পারেন।)

ভি-জা, ভি-জে ; খু-ড়া খুড়ো, প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের দুই দুই রূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমরাঢ়ের উচ্চারণ ভুলিলে চলে না। ভি-জে, খু-ড়ো না লেখাই ভাল। গল্পের কথ্য-ভাষায় অবশ্য ভি-জে খু-ড়ো লিখিতে হইবে।

(৬) ক্রিয়াপদের বানান।

মৌখিকভাষায় ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। গল্পে ও উপন্যাসে ক্রিয়াপদ না লিখিলে চলে না। কেহ কেহ প্রবন্ধেও লিখিতেছেন। কিন্তু বানানে নিয়ম দেখিতে পাই না। এখানেও "যথেচ্ছাচার" নয় ;

কেহ নিয়ম বাহির করিয়া দেন নাই। অনেক লেখক ব্যাকরণ পড়েন না।

প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, 'ইব', 'ইল,' 'ইত,' এই তিন বিভক্তি সর্বত্র অকারান্ত। 'যাবো', 'গেলো', 'বলিতো', লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। আরও বলিতে পারি, শব্দের অন্তরে ত সর্বত্র অকারান্ত। অত্যন্ত চলিত বিশেষণ পদে হসন্ত উচ্চারিত হয়। যেমন, উচিত্, চলিত্। এই সুযোগে কেহ কেহ ফ-ল-তঃ স্থানে ফ-ল-ত লিখিয়া থাকেন। কিন্তু ক্র-ম-শঃ এর বেলা কি হইবে ?

'ইব, ইল, ইত', বিভক্তির ই-কার ক্ষীণ উচ্চারিত হয়, কিন্তু লুপ্ত নয়। সাবধান লেখকেরা ঈষৎ ইকার স্থানে অক্ষরের মাথায় ' উর্দ্ধ কমা চিহ্ন দিতেছেন। অর্থাৎ তাহাঁরা বলিতে চান, ' চিহ্নটি ঈষৎ ইকারের, কিম্বা একটা গ্রস্ত বর্ণের। সে বর্ণটি কি, তাহা দেখাইতে ক্ষতি কি ?

আমার বিবেচনায় এখানেও ি চিহ্ন দিলে ভাল হয়; অক্ষরটি যে 'ই' তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়, একটা নিয়মও দাঁড়াইয়া যায়। ইংরেজীর এত অন্ধ অনুকরণই বা কেন? করিব,—ক ির্ব। র-এ হসন্তচিহ্ন না দিলেও চলে। কারণ, শেষ অক্ষর স্বরান্ত, বাংলা শব্দের উচ্চারণ নিয়মে হসন্ত হইবেই। যেমন, 'ঘর-করনা, ঘর-কর্না'। ি চিহ্নের পক্ষে হইবার আর এক হেতু আছে। ' উর্দ্ধ কমা চিহ্নটি শব্দ উদ্ধারের চিহ্ন, কোন শব্দকে বিশেষ করিবার চিহ্ন। এক চিহ্নের নানা অর্থ ভাষার পক্ষে ভাল নয়। 'করিয়া, করিতে', প্রভৃতি পদের ইয়া, ইতে বিভক্তির ই-কার ক্ষীণ হয়, কিন্তু লুপ্ত হয় না। অতএব ক-রে, ক-র্-তে বানান ঠিক নয়। ক'-রে বানানও নয়। নিয়মানুসারেও প্রকৃত উচ্চারণ ক-র্যে। ইদানীং লেখকেরা য-ফলা যোগ করিতে ভয় পান, মনে করেন ক-র্যে লিখিলে পড়িতে হইবে কো-র্-রে। য-ফলা

উচ্চারণের এই বিকার অল্প দিন হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে 'ক কিয়' (ক্য) পড়িতাম। এখনও রাঢ়ে হ-ল্য (হইল) বলে। কবিকঙ্কণের জন্ম-গ্রাম দা-মি্‌-ন্যা, কেহ দা-মি-ন্না বলে না।

কিন্তু ক'-রে বা ক'·রে বানানে দোষ কি? দোষ এই, ইহার উচ্চারণ, ক-ই-রে। পূর্ববঙ্গে ক-ই-রা বটে, কিন্তু সে উচ্চারণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ধ্বনি-সম্বাদী বানান করিতে গেলে সে দেশেও য়-ফলা চাই। ক-রি-তে—ক য়্তে। এখানে ই ক্ষীণ দেখান উদ্দেশ্য। করিয়াছি,—করেছি, করিতেছি—ক'রতেছি বা ক'র্তেছি॥ 'আছি, আছে' পদকে 'আচি আচে' বলা চলে না। কাজেই 'করেচি, কর্তেচি' লেখা অশুদ্ধ। গ্রাম্য চ বটে, কিন্তু লেখায় চ নাই। প্রাচীন ক-রি-হ, বর্তমান ক-রি-ও সংক্ষেপে ক রো। "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "মরণ ভোল" লিখিয়াছিলেন। আমি বারবার 'ভোল্' পড়িয়া বিষয় অনুমান করিতে পারি নাই। 'ভোলো' লিখিলে এই অনর্থ ঘটিত না। কিম্বা 'ভোল' লিখিলে চলিত। 'ভোল্' শব্দ আছে এবং প্রবন্ধের শিরনামে অনুজ্ঞা থাকে না, এই কারণে ভ্রমের উৎপত্তি।

'ছিলাম, ছিলুম, ছিনু', এই তিনের মধ্যে ছি-নু প্রাচীন, কবিভাষায় এখনও চলে, দক্ষিণ রাঢ়ে প্রচলিতও আছে। ছি-নু বস্তুতঃ ছি-লুঁ, ইহা হইতে ছি-লু-ম। মৌখিক ভাষায় হ্রস্বরূপ লিখিবার কথা। যখন ছি-লা-ম লৈখিক রূপ চলিতেছে, তখন ছি-লু-ম লেখার হেতু নাই। এই 'লুম' শব্দ পূর্ববঙ্গবাসীর কানে বিকট শোনায়। সেটাও ভাবিতে হইবে। রাঢ়ের পশ্চিমেও 'ছিলাম'। কেবল মধ্যরাঢ়ে ছি-নু, ছি-লু-ম। তথা-কথিত কলিকাতার ভাষায় লু-ম পাকিয়া বসিয়াছে। করিলাম—ক'রলাম,—করিতাম—ক'র্তাম। যে সকল ধাতুর আদ্যস্বর অ, সে সকল ধাতুরূপে ক্ষীণ ই-কার চিহ্ন দিতে হইবে। অন্ত্য-স্বর

থাকিলে অনাবশ্যক। 'শুনে, শুন্‌বার, দেখ্‌বার' বানান ঠিক। হসন্ত চিহ্ন না দিলেও ক্ষতি নাই।

"চলন্তিকা"য় শ্রীযুত বসু ধাতুরূপ দেখাইয়া বাংলাভাষাকে "যথেচ্ছাচার" হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখন আমরা তাহাঁর তন্ত্র বিচার করিতে পারি। তিনি বলিতে চান, 'লোকটি ব'লে ক'য়ে চ'লে গেল,' অর্থাৎ 'বই্‌লে কই্‌লে চই্‌লে গেল।' আমি বলিতে চাই, 'বল্যে কয়ে চল্যে গেল।' ক-য়ে পদে য় আছে বলিয়া য-ফলা অনাবশ্যক।

(৭) মুদ্রাকর।

একশত বৎসর পূর্বে "সমাচার দর্পণ" নামক বার্তাবহ প্রকাশিত হইত। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা হইতে সমাচার প্রকাশ করিতেছেন। তাহার ভাষার সহিত বর্তমান কালের ভাষা তুলনা করিলে দেখি বাংলাভাষা নিজের স্বচ্ছন্দ গতিতে তেজাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুদ্রাকর যেখানে ছিলেন, সেখানেই স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। নানা চিত্রকর নানা রঙ্গের ও ঢঙ্গের চিত্র যোগাইতেছেন, কিন্তু ছাপার অক্ষরে সেই শতবর্ষের প্রাচীন মাপের ব্যতিক্রম হয় নাই। কলিকাতায় ধনাঢ্য মুদ্রাকর আছেন, গণ্যমান্য লেখক আছেন, বিলাতী অনুকরণে বইর মলাট ও বই বাঁধা হইতেছে, কিন্তু ভিতরে সেই "থোড় বড়ী খাড়া"। এ বিষয়ে নাগরী মুদ্রাকর অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীযুত বসুকে নূতন ছাঁদের চন্দ্রবিন্দু করাইতে হইয়াছে। আমাকেও গোটাবার করাইতে হইয়াছিল। কিন্তু কই এমন কঠিন ও ব্যয়-বহুল কর্ম নয়। অন্ততঃ ব্যক্তিবাচক নামের আদ্য অক্ষর মোটা অক্ষরে ছাপিলে অর্থ ধরিতে সুবিধা হইত। এই প্রবন্ধে "চলন্তিকা" লিখিয়া ডবল কমা বসাইতে হইয়াছে। চ অক্ষরটি বিশেষ করিতে পারিলে এই দুর্ভোগ

ঘটিত না, চিহ্নটির প্রয়োগ-ব্যভিচারও করিতে হইত না। অন্যের বাক্য তুলিতে গেলে ডবল কমা। কোন বিশেষ অর্থে শব্দ বসাইতে হইলে একটে্য কমা। অপ্রচলিত অর্থে দেশীশব্দ এবং অপ্রচলিত বিদেশী শব্দ একটে্য কমার মধ্যে লেখা ভাল। এই নিয়মে এই প্রবন্ধে এক এক শব্দ একটে্য কমার মধ্যে দেওয়া গিয়াছে। কোন শব্দের প্রতি দৃষ্টি করাইতে শব্দের অক্ষর 'হাইফেন' দিয়া জুড়িয়াছি। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 'হাইফেন' দেন না, ফাঁক ফাঁক বসান। আমার বিবেচনায় সে রীতিতে শব্দপাঠ সুগম হয় না। কারণ বাংলায় সমাস আছে, শব্দের পর 'ই' 'ও' যোগও করিতে হয়। ভা র ত ব র্ষে রও অপেক্ষা ভা-র-ত-ব-র্ষে-রও ভাল বোধ হয়। সমাস দেখাইতে হইলে —এই চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, গু-ণ—মুগ্ধ। বিলাতে মুদ্রাকর-সমিতি আছে। সে সমিতি কেবল অর্থ-চিন্তা করেন না, গ্রন্থ ছাপাইবার সুষ্ঠ রীতিও চিন্তা করেন। বহুকাল পূর্বে সমিতির কার্য-বিবরণে পড়িয়াছিলাম, সমিতি গ্রন্থকারের বানান ভুল, বিরামচিহ্ন প্রয়োগ ভুল বিচার করিতেছেন, কোথায় বড় অক্ষর বসিবে, কোথায় কমা চিহ্ন বসিবে, কোথায় 'কোলন' চিহ্ন বসিবে, ইত্যাদি আলোচনা করিতেছেন। কারণ এটি মুদ্রাকরের কাজ, গ্রন্থকারের নয়। বাঙ্গালা মুদ্রাকর মনে করেন, বাংলা আর ইংরেজী শব্দ একই প্রকার, শব্দগুলি সমান সমান দূরে বসাইতে পারিলেই গুণ-পনা। কিন্তু বাংলায় যে পদে পদে সমাস। সমস্ত পদকে ব্যস্ত করিলে পাঠককেও ব্যস্ত হইতে হয়। প্রায়ই দেখি, গ্রন্থকার ছাপার ভুলের জন্যে পাঠকের ক্ষমা চাহিতেছেন। যখনই দেখি, তখনই এক ঘটনা মনে পড়ে। ৺প্রফেসার কে পি-বসুর একখানি গণিতের বই বিলাতে ছাপা হইয়াছিল। বই ছাপা হইয়া আসিলে তিনি দেখিলেন, একটা অঙ্কে তাঁহার কষা নাই, নূতন কষা ছাপা হইয়াছে! তিনি কুপিত হইলেন। পরে দেখিলেন

তিনি ভুল করিয়াছিলেন, যে কথা ছাপা হইয়াছে, সেটাই শুদ্ধ। আর সেই কে-পি বসুর কলিকাতায় ছাপা বীজগণিত দেখিলে হা-হুতাশ করিতে হয়। অথচ তিনি নিজে 'প্রুফ' দেখিয়া দিতেন। "চলন্তিকা"র অশুদ্ধি দুই পৃষ্ঠা! রাজশেখর বাবুকেও এই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। "অন্যে পরে কা-ক-থা।"

ইংরেজীর বাংলা

[মৌখিক ভাষায় লিখিত]

যখন কলেজে পড়ি, তখন একদিন রেভ্‌রেণ্ড লালবিহারী দে বলছিলেন, "দেখ, যখন তোমরা ইংরেজীতে ভাবতে পারবে, স্বপ্নে ইংরেজীতে কথা কইবে, তখন জানবে ইংরেজী শিখেছ।" দে-সাহেব আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের এক প্রোফেশর (অধ্যাপক নয়, অধ্যাপক টোলের) ছিলেন, তাঁর ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অসাধারণ ছিল। তিনি স্বপ্নে ইংরেজীতে "লেকচার" দিবেন, আশ্চর্য কি! কিন্তু আমরা বাংলা তর্জমা করে ইংরেজী বলতাম। আমাদের কাছে কথাটা অসম্ভব ঠেকেছিল।

পরে বুঝলাম ইংরেজীভাষার অল্প বিদ্যাতেও ঐ ভাষায় ভাবা, এমন কি স্বপ্নে ইংরেজী বলা, অসম্ভব নয়। তা না হ'লে ইংরেজের ছেলেরা, যারা ইংরেজী শেখে নাই, দু-লাইন লিখতে গেলে দুগণ্ডা ভুল করে, তাঁরা করে কি? অশুদ্ধ ইংরেজীই তাদের মাতৃভাষা।

শৈশব হ'তে আমরাও ইংরেজী পড়তে পড়তে লিখতে লিখতে, বলতে বলতে, ইংরেজীতে ভাবি, স্বপ্নেও ইংরেজী আওড়াই। এই অভ্যাসে আমরা বিজাতীয় হয়ে পড়েছি। কারণ দেহের দাসত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারা যায়, মনের দাসত্ব মনে গাঁথা থাকে। এখানে shall কি will বসবে, এখানে idiom ঠিক হ'ল, না ভুল হ'ল, দেখি ইংরেজেরা কি বলে,—এই চিন্তা বাল্যকাল হ'তে অষ্টপ্রহর করতে করতে, ইংরেজকেই শাস্ত্রকার মানতে মানতে, যা কিছু করি, যা কিছু ভাবি, শাস্ত্রকারের মুখের পানে চাই। ইংরেজ বলেন, আমরা কোন গুরু কর্মের সূচনা (initiative) করতে পারি না। এই অক্ষমতার মূল এখানে। আমাদের যে বুক দুর-দুর করে, কি জানি বিলাতী শাস্ত্রে কি বলে। আমরা গবেষণা করতে বসলে আগে দেখি, কোন্ বিদেশী কি বলেছেন। আমরাও যে মানুষ, আমরাও যে পারি, এই আত্ম-প্রত্যয় গেলে মেষত্ব ঘটে। কে কি বলে, কে কি করে, জানতে দোষ নাই। বরং যত জানা যায়, ততই ভাল। জাপানী ভাষা শিখলে, জাপানী আচার-ব্যবহার জানলে, হিত হ'তে পারে। অনেক শিক্ষিত ইংরেজ জার্মানভাষা, সাহিত্য, বিদ্যা জানেন, কিন্তু মনে খাঁটি আছেন।

ইস্কুলে ও কলেজে ছেলেদিকে বাংলায় পাঠ দিলে তারা সহজে বোঝে, ভাল বোঝে, একথা কলেজে শিক্ষক হবার নয় দশ বছর পরে বুঝিলাম। কিন্তু নিরুপায়। কলেজে ধুতি চলবে না, বাংলা চলবে না। ছাত্রেরা নির্বোধ নয়। এ দুটা তুচ্ছ কথা নয়, অবরতা-বুদ্ধির (inferiority complex) তুচ্ছ উপাদান নয়। ছাত্রের বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী, আর্বী পরীক্ষা হবে, প্রশ্ন কর ইংরাজীতে উত্তর লেখ ইংরাজীতে। কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয় ইংরেজীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখালেন, পড় সে ব্যাকরণ, উপক্রমণিকা চলবে না! (এখন শুন্‌ছি সে ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ হয়েছে।) বাংলাকে ইংরেজী কতদিকে আক্রমণ ও গ্রাস করছে,

চক্ষুষ্মানকে বলতে হবে না। বর্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলন আমাকে দিয়ে ইস্কুলে কলেজে বাংলায় পাঠ দিবার প্রস্তাব করিয়েছিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণগোচর করা হয়েছিল। সে বোধ হয় পনর ষোল বছর হবে। এখনও কিন্তু বিচারণার বিরাম নাই। মজার কথা এই, যাঁরা এই ব্যবস্থা সমর্থন করছেন, তাঁরা বলেছেন, বাংলাকে শিক্ষার "বাহন" কর। সিন্দবাদের দৈত্য ঘাড়ে চেপে আঁকড়ে বসেছে, "না" বললেই বাহনত্ব ঘুচবে না। medium শব্দের বাংলা যে চাই, "বাহন" যে বলতেই হ'চ্ছে! আর, বাহন শব্দও ত ঠিক। বাহনের আরোহী যে বড়, এখন চিন্তার সময় হয়েছে। এখন "বাহন" গেছে, 'মাধ্যমে' এসেছে। কিন্তু ইংরেজীর বোটকা গন্ধ ছাড়ছে।

এত গুরুতর কথা পাড়ব না। আমরা বাংলা ভুলতে চাই না, বাংলা বার্তাপত্র ও বাংলা মাসিক পুস্তক, তার সাক্ষী। এই সবের সম্পাদকের জন্যে পাঠকের করুণা হবার কথা। তাঁরা প্রত্যহ নূতন নূতন ইংরেজী শব্দের অজস্র বর্ষণ মাথায় পেতে নিয়েছেন। বাংলা কাগজ বাংলায় লিখতে হবে। উপরিক (superior) রাজপুরুষ কোথায় কখন কি সংবাদ (address) বলছেন, প্রজ্ঞাপক (publicity officer) কখন কি প্রজ্ঞাপন (communique) করছেন, এঁদিকে তার বাংলা বলতে হবে। ইংরেজী ভাষাটা ফাঁপা, বুদ্‌বুদের ন্যায় বেশ ভাসতে থাকে, শুনতে বেশ, পড়তে বেশ। বার্তা-পত্রের এক পাটি (স্তম্ভ নয়, column ক্ষেত্র নয়) পড়ি, ফেনপুঞ্জ শুখালে দেখি, মাত্রিক (material) অর্ধরতি। ইংরেজী ভাষার এটা মস্ত গুণ, কিছু না বললেও আধ ঘণ্টা বলতে পারা যায়। কিন্তু বার্তিকের (news-paper men) কষ্টের অবধি নাই, ভাবার্থ দিয়া কার্য সমাপ্ত করেন। ভালই করেন, ইংরেজ বললেও আমরা অকর্মা (unpractical) নই, বাক্-সংযম আমাদের কৃষ্টির (culture) এক লক্ষণ। ইংরেজের ঐশ্বর্যের সীমা নাই, ভাষার শব্দের

ও বাক্-ভঙ্গিরও নাই। কিন্তু কাজের কথাগুলার ত বাংলা চাই। সেও যে সুদারুণ!

কটকে থাক্‌বার সময় আমার জন-কয়েক ছাত্র, তখন গৃহী, সেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বসাতে উদ্‌যোগী হ'লেন। আমায় পরিষৎ-পতি হ'তে হবে। আমি এক নিয়মে সম্মত হ'লাম, ইংরেজীর তর্জমা করতে পাবে না, ইংরেজীর অন্ধবৎ অনুসরণ ও অনুবাদ করতে পাবে না। "হাঁ, তা ত ঠিক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ইংরেজীর স্থান নাই। স্যর-মিটিং কবে করা যাবে?" বলেই হেসে উঠ্‌লেন। একজন বললেন, মিটিং কথাটা মেয়েরাও বলে। আমি বুঝিয়ে দিলাম, এ ত তর্জমা নয়, শব্দটা বাংলা হয়ে গেছে। আর একজন ছিলেন খুঁৎ-খুঁত্যে। তাঁর মনঃপূত হ'ল না; তিনি বললেন, কলিকাতা-সাহিত্য-পরিষৎ হ'তে নিয়মাবলী আনাতে হবে, দেখব তাঁরা কি করেছেন। নিয়মাবলী এল, কর্মকর্তাদের (office-bearers) সংজ্ঞা পড়া হ'ল, অধিকাংশই ইংরেজীর তর্জমা। সে সব নিলে আমাদের নিয়ম-লঙ্ঘন হয়। অগত্যা শব্দ-চয়ন করতে হ'ল। কয়েকটা মনে আছে, President—পরিষৎপতি, Vice-President—উপপরিষৎ-পতি, members—পারিষদ, associates—মিত্র (যদিও ৫০৲ টাকা দান না করলে মিত্র হবার নিয়ম ছিল না), Patron—পোষ্টা, Executive Committee—কার্যান্তক, Committee পঞ্চক (পাঁচের বেশীও হ'তে পারে), Secretary—ব্যবহর্তা (ওড়িয়ার রাজাদিগের 'বেবর্তা', এইরূপ, Joint-Secretary সহ-ব্যবহর্তা, Asst. Secretary—অনুব্যবহর্তা, Library—গ্রন্থশালা, Librarian—গ্রন্থ-পাল, Treasurer—অর্থপাল (আমাদের ধনের মধ্যে মাত্র চাঁদা) meeting—সমাগম, business—কার্য, routine—পরিপাটি, pro-gramme—প্রগম (ওড়িয়া ভাষার সংসর্গে ম অকারান্ত), ইত্যাদি। দিন কয়েক একটু নূতন নূতন ঠেক্‌ত, পরে চলে গেছল, এবং এখনও

চলছে। 'প্রগম' নবনির্মিত ; তা ছাড়া সকল নামই সংস্কৃত, অর্থ ভাব্‌তে হয় না, উচ্চারণেও কষ্ট নাই। কেহ কেহ ভাব্‌ছেন, এই বহ্বারম্ভে ক্রিয়াটা লঘু হয়ে থাকবে। কিন্তু তা নয়, ব্যবহতার উৎসাহে এক মাসের মধ্যেই পরিষৎ "সাফল্য-মণ্ডিত" (crowned with success. সাফল্য-মৌলি ?) হয়ে উঠেছিল।

উপরে address শব্দে 'সংবাদ' লিখেছি। 'সংবাদ' শব্দের ঠিক অর্থ হয়েছে। গুরু-শিষ্যের সংবাদে একজন বক্তা, অপরে শ্রোতা। 'বাড়ীর সংবাদ কি ?'—বাড়ীর লোকে কি বললে। সংবাদ speaking. এই থেকে information হয় বটে, কিন্তু address শব্দের বাংলাও যে চাই। মহাত্মা গান্ধীর 'বক্তৃতা' শুনতে লোকে দউড়ে না, তাঁর 'সংবাদ' শুনতে যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির 'অভিভাষণ' ছেড়ে 'সম্বোধন' করছেন, কিন্তু সম্বোধনের স্বর উঁচু নয় কি ?

বাংলাবার্তাহরের কাজ ভারি কঠিন। বাংলা ও ইংরেজী, দুই ভাষার জ্ঞান চাই। এ 'রক্তিমা শুক্লিমার' কর্ম নয়, বিষয়-জ্ঞান চাই। বিষয়েরও অন্ত নাই। মামলা মকদ্দমা, মারামারি দাঙ্গা, সে ত মামুলী ব্যাপার, একটু আইন জানলে বুঝতে পারি। কোথায় জলপ্লাবনে (প্লাবন বাংলা-প্রয়োগ নয়) দেশ ভেসে গেল, কোথায় বিমান অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভূ-পতিত হ'ল, কোথায় পাটের দর কমে' গেল, কোথায় বিলাতী কাপড়ের কাটতি ('চাহিদা' হিন্দী) স্তব্ধ হ'ল, এ যে নানারকমের খবর! স্যর রমন কেন যে 'নোবেল' উপায়ন (present. পুরস্কারে আমিষ-গন্ধ আছে) পেলেন, ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণণ্ (ডাক্তার নয়, ডাক্তার চিকিৎসক) কি ব্যাখ্যান (lecture) দ্বারা বিদ্বজ্জনকে তৃপ্ত করলেন, ইত্যাদি দেশের বার্তা না শোনালেও চলে না। ভাষা-জ্ঞান্ বলতে শব্দ-জ্ঞান, শব্দার্থ-জ্ঞান ও ব্যাকরণ-জ্ঞান বুঝি। বার্তাহরণ অল্প পুঁজিতে

চলে না। এক বার্তা-পত্রে পড়ছিলাম, "বঙ্গোপসাগরে গোলযোগ আরম্ভ হয়েছে।" কাজের গোলযোগ হয়, আবহের দুর্যোগ। এক বার্তাহর পাঠককে শেখাচ্ছেন, "নারিকেলের মধ্যে চর্বির ভাগ শতকরা ৫২ ভাগ এবং শ্বেতসারের ২৭ ভাগ।" কথাটা এখানে ভাঙ্গবার দরকার নাই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই একটি বাক্যে উপরি-উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানের অভাব ঘটেছে। অনেকে 'কাপাস চাষ' ভুলে 'তুলার চাষ' লিখছেন, কারণ ইংরেজীতে cotton cultivation. আমরা জল হ'তে নূন করি, 'তৈয়ার করি' না। আমরা বি-এ পরীক্ষায় পাশ (উত্তীর্ণ) হই, পাশ-করার কর্তা পরীক্ষক। একজন লিখেছিলেন, "যতীন দাসের মৃতদেহ, কলিকাতায় পৌঁছিলে শোভাযাত্রা হইয়াছিল।" তিনি জানাতে চান শোক-যাত্রা। হয়ত কোন ইংরেজী-বাংলা অভিধানে procession মানে ('মানে' লিখলে মান-অভিমান মনে আসে) শোভাযাত্রা লেখা আছে। কিন্তু এক ভাষার শব্দ অন্য এক ভাষায় আনতে গেলে সব সময় এক কথায় সারা যায় না। বিবাহের বর-যাত্রা, দেবীর বিসর্জন-যাত্রা, ঢাকায় জন্মাষ্টমী-যাত্রা কি বস্তু, বাঙ্গালী বুঝতে পারে। কলিকাতার জেলেপাড়ার সং-যাত্রা শোভা-যাত্রা নয়। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু কলিকাতায় এলে বিজয়-যাত্রা হয়েছিল। যাত্রা উৎসব; গমন-পথের কোথাও নৃত্য কোথাও গীত হ'ত। সে হ'তে যাত্রা-গান শব্দের উৎপত্তি।

মাসিক পুস্তক (monthly periodical. পত্র, পত্রিকা বলি কেমনে ?) সম্পাদকের কর্ম বহুগুণে লঘু। তাঁরও বিদ্যা বুদ্ধি, বিশেষতঃ উৎসাহ ও প্রভাব অবশ্য চাই। কিন্তু "প্রবন্ধ-লেখকের মতামতের জন্য প্রবন্ধ-লেখক দায়ী।" লেখকের দায় নিশ্চয়, কিন্তু সম্পাদক দায়াদ, অন্ততঃ দণ্ড-দায়াদ। তা ছাড়া পরিকর্মের (dressing) ভার সম্পাদকের। পুস্তকের সব প্রবন্ধ এক বিষয়ের হ'লে সম্পাদকের

জ্ঞান সে বিষয়ে থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ মাসিক পুস্তকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বিশ্বের চর্চা থাকে। অতএব monthly magazine বার মাসিক (সং বার=সমূহ) সম্পাদককে লোক-বৃত্ত জানতে হয়, প্রকারান্তরে বার্তিক হতে হয়। এক পয়সার পুঁতিই বা হ'ল, ক্রেতা ধূলা-মাখা পুঁতি কিনবে কেন? পুঁতির হাট বুঝতে হবে, পুঁতির দোষগুণও বুঝতে হবে। কাজটা সোজা নয়। বার্তিকের শ্রেণীবিভাগ কঠিন। কিন্তু এঁরাই লোকশিক্ষা দিচ্ছেন, বাংলাভাষার প্রসার করছেন, নূতন নূতন শব্দ চালাচ্ছেন। শিক্ষকের কাজ চিরদিন কঠিন।

পূর্বে শুনতাম, গাঁয়ে আন্দোলন চলেছে, অমুককে এক-ঘরো করা উচিত কি, না। এক পক্ষের মতে উচিত নয়। এই যে উচিত কি অনুচিত, ভাল কি মন্দ, দ্বন্দ্বের দোলায় আন্দোলন। বোধ হয়, কন্‌গ্রেসের জন্মবৎসরে দেশে agitation আরম্ভ হয়। বাংলায় 'আন্দোলন' এল। এখন agitator-কে কি বলি? ইনি নিরীহ নন, শান্তিভঙ্গ করেন। ইনি agitate করেন, ক্ষোভ জন্মান। ইনি ক্ষোভক। চীৎকার দ্বারা শত্রুকে ভয় দেখালে সংস্কৃতে ডমর বলা হ'ত। ডমর অশস্ত্র কলহ, গ্রামে বলে, বিক্রম-প্রকাশ। Boisterous meeting ডমর বলতে পারি। লোকের স্বভাব বদলায় না, ভাষা বদলায়। যখন আন্দোলনে ও বিক্রম-প্রকাশে ফল হয় না, তখন লোকে দোষীকে এক-ঘরো করে, সাহায্য দেয় না, non-co-perate করে। পরস্পরকে সাহায্য দিয়ে co-operate করে' গ্রাম চলে। 'সহযোগ' ও 'অসহযোগ,' কথা দুটা ইংরেজীর তর্জমা বলে নূতন ঠেকছে। দুইজনের বিবাদ না থাকলেই তারা সহযোগী (colleague) হয় না। Co-operative society সহযোগী সমিতি বটে, এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত সমবায় বটে (সমবায়ের পর 'সমিতি' শব্দ নিরর্থক)। অতএব সহযোগ চেয়ে সাহায্য-শব্দ ভাল, non-co-operation movement সাহায্য-রোধ চেষ্টিত। movement

চেষ্টিত, 'প্রচেষ্টা বলার দরকার দেখি না। সাহায্য বন্ধ করতে পথ আগলানা (picketing) নূতন ব্যাপার নয়, আগল (pickets) না থাকলে এক-ঘরো করতে পারা যায় না। জমীদারের সহিত প্রজার বিবাদও নূতন নয়। প্রজারা বিরক্ত হ'লে খাজনা দেয় না। এই কথাটা এখন civil disobedience, আইন অমান্য নয়, কর-লঙ্ঘন (non-payment of taxes) নামে শুনছি। Passive resistanceও নূতন নয়। যে প্রজা প্রতিজ্ঞা করেছে কর দিবে না, তাকে মার-ধর করলেও দেয় না। Passive resistance 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' কেমনে বলি ? 'প্রতিরোধ' কই ? প্রতিরোধ হ'লেই ক্রিয়া থাকবে। অহিংস, অ-শস্ত্র, বিশেষণ দিলেও প্রতিরোধ active। প্রজা আপনাকে অসহায় মনে করে, জমীদারের উৎপীড়ন সহ্য করে, তার passive resistance অপ্রতিকার্য সহিষ্ণুতা। কিন্তু প্রতিকারের প্রবৃত্তি ও শক্তি থাকতেও প্রতিকারের চেষ্টা না করা, দমের লক্ষণ। বাহ্যবৃত্তির নিগ্রহ (restraint) দম। মহাত্মা গান্ধী অহিংসা পরমোধর্ম নিজ চরিতে পালন করেছেন। তিনি অহিংসাধর্মেই সত্য অস্তেয় (non-stealing) দয়া দম ক্ষান্তি (forbearance) প্রভৃতি ধর্ম-সাধন প্রচার করছেন। যাঁর দমগুণ আছে, তিনি দমী। তাঁকে দান্ত বলাও চলে। মহাত্মা সাধারণ লোককে, অন্ততঃ তাঁর অনুগতিকে (following) দান্ত করতে পেরেছেন, ইহাই তাঁর মহতী কীর্তি। non-violent দান্ত। non-violent non-co-operationএর non-violent বিশেষণ অনাবশ্যক। কারণ non-co-operation ঔদাসীন্য। উদাসীনের ক্রিয়া নাই। তথাপি যদি চাই, দান্তের ঔদাসীন্য, কিংবা দান্তাপসরণ (দান্তের অপসরণ taking no part)।

বর্তমান দেশ-বিপর্যয়ে (abnormal condition) নূতন নূতন ক্রিয়া-বাচক শব্দ আবশ্যক হ'চ্ছে। পূর্বকালেও দেশ-বিপর্যয় ঘটত ; লোকে

শব্দও পেত। শুক্র ও বৃহস্পতি, দুইজন অতি প্রাচীন নীতিজ্ঞ (politician) ছিলেন। রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধে শুক্রের মত, দুষ্টকে নিগ্রহ কর, শিষ্টের চিন্তা করতে হবে না। তিনি অসুরদের গুরু ছিলেন। বোধ হয় অসুরদের মধ্যে দুষ্ট লোক বেশী ছিল। বৃহস্পতির মত, দুষ্টের নিগ্রহ যেমন চাই, শিষ্টের অনুগ্রহও তেমন চাই। বৃহস্পতি সুরদের গুরু ছিলেন, এবং প্রাচীন আর্যেরা তাঁর মতে "রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন" এই দুইকে রাজধর্ম স্বীকার করতেন। কিন্তু রাজা, প্রজাপতি না হ'লে, প্রজাকে পুত্রস্বরূপ দেখতে না পারলে, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ হ'তে পারে না। কারণ, প্রজা শব্দের মূলার্থ পুত্রকন্যা। প্রজাপতি-রাজাকে ঈশ্বর দেবের অংশ দিয়ে নির্মাণ করেন, রাজা নররূপ মহতী দেবতা। তিনিই দণ্ড-পুরুষ, নেতা এবং ধর্মের প্রতিভূ।

মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, স্মৃতি, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে রাজধর্ম ব্যাখ্যাত আছে। সকল গ্রন্থেই রাজধর্মের সার দুইটি কথা আছে, রাজ্যশাসন ও প্রজা-পরিপালন। নৃপতি দণ্ডধারণ করবেন, আর স্বয়ং প্রজাপতি হয়ে প্রজাকে সম্যক্ অনুগ্রহ করবেন। শাসন Government, maintaining law and order.

রাজ্য সপ্তাঙ্গ,—স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র (বা জন), দুর্গ, কোষ, বল, সুহৃৎ। রাষ্ট্র হ'তেই রাজ্যাঙ্গের উৎপত্তি। রাষ্ট্র (রাজ ধাতু হ'তে) রাজ্য (kingdom); কাজেই রাষ্ট্রবাসীজনও রাষ্ট্র (the people)। এই অর্থে রাষ্ট্রিক (the subjects of a kingdom) শব্দের প্রয়োগ আছে। রাষ্ট্রের প্রাধান্যহেতু রাষ্ট্রজনের নাম প্রকৃতি (subjects)। অমাত্য দ্বিবিধ, মন্ত্রী (minister, adviser) যাঁর সহিত মন্ত্রণা, গুপ্তভাষণ হয়; আর সচিব বা কর্মসচিব, কর্ম-সহায় (executive councillors)। মহামাত্র প্রধান অমাত্য (prime minister)। মন্ত্রীমণ্ডল the body of councillors cabinet. বল, সৈন্য (army):

সুহৃৎ, মিত্র (friendly kings)। রাজ্যের সপ্তাঙ্গের কোন একটির ব্যসন (violation, evil) হ'লে রাজ্যের অমঙ্গল। তন্মধ্যে সুহৃৎ-ব্যসনের ফল লঘু, রাজার ব্যসনের ফল গুরু। কারণ একদিকে রাজা, অন্যদিকে রাজ্য, রাজার ব্যসন হ'লে রাজ্য টিকতে পারে না। নীতিজ্ঞেরা অবিনয় (নয়, regulation না মানা, autocracy), অধর্ম (injustice), লোভ (greed), ক্রোধ, ইত্যাদির ফল দেখিয়ে গেছেন। লোভ হ'তে ক্রোধ, এবং ক্রোধ হ'তে ত্রিবিধ ব্যসন জন্মে। (১) বাক্‌পারুষ্য,—অপবাদ, কুৎসা, ভৎ‍র্সনা ; (২) দণ্ডপারুষ্য (severity of punishment) ত্রিবিধ,—অর্থহরণ (fine and confiscation of property) ; তাড়ন (corporal punishment); বধ (এখন প্রাণদণ্ড রহিত করবার চেষ্টা হ'চ্ছে ; কিন্তু কামন্দক, কৌটিল্যের শিষ্য হ'লেও বলেছেন, রাজ্যাপহার ব্যতীত অন্য মহৎ অপরাধেও দণ্ডং প্রাণান্তিকং ত্যজেৎ)। (৩) অর্থ-দূষণ (ruinous expenditure in pursuing an offender)।

প্রকৃতির আনুরক্তিই রাজ্যরক্ষার মূল। সে মূলে আঘাত পড়লে নানাবিধ ফল ঘটে। যথা, প্রকৃতির বিরাগ (disaffection), কোপ (excitement), ক্ষোভ (agitation), উদ্বেজন (unrest), দ্বেষ (enmity), উপজাপ (mischievous secret conspiracy), দ্রোহ (sedition), বিপ্লব (revolution), উত্থান (rebellion), প্রকোপ (revolt)। অরাজকতা বা রাষ্ট্রবিপ্লব (anarchy) মাৎস্যন্যায় ; বড় মাছ যেমন ছোট ছোট মাছকে গিলে ফেলে, তেমন প্রবল দুর্বলকে গ্রাস করে। কোপ দ্বিবিধ, অন্তঃকোপ, স্বরাজ্যে কোপ ; বহিঃকোপ, রাজ্যের বাহিরে কোপ। বহু প্রাচীনকালে, ভারতযুদ্ধেরও আগে, রাজ্যশাসনের 'উপায়' (policy) আবিষ্কৃত হয়েছিল। সাম (conciliation), দান (concession), ভেদ (division), দণ্ড (punishment)। কোন্

ক্ষেত্রে কোন্ উপায় প্রযোজ্য, সেটা বুঝলেই নীতিজ্ঞতা (statesmanship)। দানের সঙ্গে মান-দানও যায়। দানে বশীভূত হয় না, এমন মানুষ নাই। সকলের সহিত সাম, প্রিয়ভাষণ ফলবান্ হয় না। দুই প্রবল পরস্পর ঈর্ষান্বিত দলে, বিশেষতঃ জ্ঞাতির দলে, ভেদ সহজে ঘটাতে পারা যায়। কালক্রমে 'উপেক্ষা' (indifference) আর এক উপায় গণ্য হয়েছিল। "সে আর কি করতে পারবে," এই উপেক্ষা। কেহ কেহ আর একটা উপায় স্বীকার করতেন। সেটা মায়া (fraud), মিথ্যাপ্রদর্শন, ভয়প্রদর্শন। মন্ত্রশক্তি (diplomacy) সকল রাজারই অভ্যস্ত। অন্যগতি থাকতে দণ্ডপ্রয়োগ নীতিসম্মত ছিল না।

পররাজ্য জয় করতেও এই এই উপায়। স্বরাজ্যের সংলগ্ন রাজ্য নিশ্চয় অরি। তারপর মিত্র, তারপর উদাসীন। এইরূপ চারিদিকের বারটি রাজ্য নিয়ে রাজমণ্ডল। রাজ্যে কোপাদি ব্যসন ঘটলে জয়েচ্ছু অরি-রাজার সুযোগ। বলীয়ান্ দ্বারা অভিযুক্ত (attacked) হ'লে, এবং অন্য প্রতিক্রিয়া না থাকলে সন্ধি; কিন্তু কাল-যাপন করে'। সন্ধি ষোল প্রকার। যথা, সমানে সমানে কপাল-সন্ধি (কপাল skull, মাথার খুলির দুইভাগ যেমন সমান ও সংযুক্ত); কিন্তু সম্প্রদান করে' উপহার-সন্ধি; সজ্জনের সহিত মৈত্রী, সঙ্গত-সন্ধি, (এই সন্ধিতে উভয় পক্ষের সমান স্বার্থ থাকে, উভয়ে সম্পদে বিপদে ভিন্ন হয় না। এই সন্ধি উৎকৃষ্ট); এক অর্থ (object) সিদ্ধির উদ্দেশে উপন্যাস-সন্ধি; উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার দ্বারা প্রতীকার সন্ধি; ইত্যাদি। প্রথম তিন সন্ধিই মূল। পূর্বকালে এই তিনের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও একটা মূল সন্ধি গণ্য হ'ত।

রাজার দৈনিক কর্মের মধ্যে 'ব্যবহার-দর্শন' (administration of justice) একটা বাঁধা কর্ম ছিল। তিনি সভ্য-পরিবৃত হয়ে সভায়

বসতেন। তাঁর 'অধিকৃত' (officials in charge of departments) অবশ্য বসতেন। আর বসতেন সভ্যেরা। কুল (বাদী প্রতিবাদীর জ্ঞাতি বন্ধু), জাতি (বাদী প্রতিবাদীর), শ্রেণী (এক এক বৃত্তির এক এক শ্রেণী), গণ (নানা জাতির ও বৃত্তির সঙ্ঘাত, corporations, বণিকদের), ও জানপদ (কারু প্রভৃতি, পৌর নয়), হ'তে 'সভ্য' করা হ'ত। সভ্যের কেহ বাদী কিম্বা প্রতিবাদীর প্রতি স্নেহবশতঃ, কিম্বা লোভ বা ভয়বশতঃ, স্মৃতি-(law) বিরুদ্ধ মত দিলে পরাজিতের দ্বিগুণ দণ্ড পেতেন। রাজ্যের সর্বত্র প্রথমে 'কুল' বিচার করতেন, কুলের নির্ণয়ে অসন্তুষ্ট হ'লে 'শ্রেণী' (trade guilds), তারপর 'গণ' (অন্য নাম পূগ; গুবাকগুচ্ছ সাদৃশ্যে এই নাম), তার পর রাজাধিকৃত, তার পর স্বয়ং রাজা বিচার করতেন। আমরা বলি, রাজা পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ নিয়ে সভায় বসেন। পাত্র, মন্ত্রী; মহামাত্র, মহামন্ত্রী। মিত্র, বাদী প্রতি-বাদীর, যারা উপকার প্রত্যাশা করে না। সভাসদ্, নানা জাতির ও বৃত্তির মুখ্য। এঁরা assessors। সে কালে রাজপুরোহিত অমাত্যের সঙ্গে বসতেন।

এই যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত উদাহরণ হ'তে দেখা যাবে, একটু যত্ন করলে বর্তমানের উপযোগী অনেক শব্দ পাওয়া যাবে। যে সকল শব্দ চলে গেছে, সে সবের বিচার নিরর্থক। কিন্তু যে সকল শব্দ দেশময় প্রচলিত হয় নাই, মাত্র লেখক-বিশেষের নিকট সমাদৃত আছে, সে সব বিচার্য। একই শব্দ নানা অর্থে লাগালে ভাষা খর্ব হয়ে পড়ে, পাঠকের জ্ঞান আব্-ছায়া হয়ে থাকে। কেহ কেহ 'নৈতিক অবনতি' লিখে 'নীতি' শব্দটার অর্থ-বিপর্যয় ঘটাচ্ছেন, 'গণ' আর 'জন' যে এক নয়, এক করলে 'গণ' শব্দের ভাব-প্রকাশক অন্য শব্দ থাকে না, সে চিন্তা করছেন না। গণ, group, a multitude, বালকগণ, বালকনামে যাহারা আছে তাহাদের সমষ্টি, বালিকা নয়, যুবক নয়, অপর কিছু নয়।

ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ,—দল বেঁধে গণ করে আগে আগে যাবে না। গণপতি leader of a party সংস্কৃত ধাতু "তথাকথিত নিম্নশ্রেণী" বলাতে সে শ্রেণীর নিম্নত্ব যে আরও প্রকট হয়ে উঠে। শ্রেণীই বা বলি কি করে'। যখন ভাগ করতেই হ'চ্ছে, আর সত্য সত্য ভাগ আছে, তখন 'অনুন্নত প্রকৃতি' বলা চলে। কোল জাতিকে animist, কিম্বা বাংলায়, প্রেতপূজক', বললে অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়। তাদিকে বরং চৈতনক বলতে পারি, যদিও হিন্দুও চৈতনক। সেদিন একখানা ইস্কুল-পাঠ্য বইতে দেখি, প্রথম পদ্য "Our God is in heaven."—গ্রন্থকার বাঙ্গালী, বোধ হয় হিন্দু। তিনি ভাবেন নাই, এই বিশ্বাস মুস্‌লেমের নয়। এইরূপ গদ্য-পদ্য দ্বারা বালকদের ধর্মজ্ঞান-বিকাশের পথ বাঁকা করা হ'চ্ছে। ইস্কুলে moral training দিতে হবে, কি উপায়ে শুনি নি।

যে কথা হ'চ্ছে, সে কথাই হ'ক। ইংরেজীর প্রতিশব্দ সংস্কৃত চাই, এমন কথা নাই। চাইলে আকাশের চাঁদ চাওয়া হবে। আদালতে ফার্সী শব্দ প্রচুর; ইদানীং ইংরেজী শব্দের বান ব'চ্ছে। মুনসফ, জজ, মেজষ্টর, প্রভৃতি অসংখ্য ইংরেজী পদবীর বাংলা চলবে না। হাইকোর্টের জজকে 'বিচারপতি' বললে মুনসফের অধিকার খর্ব করা হয়। কিন্তু পদবীকে বাঙ্গালীর কানের ও জিবের অনুকূল করে' নিতে হবে। এ বিষয়ে অশিক্ষিত জনই প্রমাণ। ষ্টীট, ডিস্‌টিক, মুনসিপাটি, গর্মেণ্ট, নিস্পেকৃটর, হাইকোট, বোড, ইনান প্রভৃতি নাম বাংলা হয়ে গেছে। বার্তাপত্রে দীর্ঘনাম লিখে লাভ নাই। কতকগুলি শব্দ কালবৈগুণ্যে এসেছে। এগুলার অর্থ এখনও প্রচলিত হয় নি, বাংলায় বলতে হবে। Ordinance খাস্ হুকুম; মন্দ কি? Interned অন্তরীণ? কথাটার একটুও মানে হয় না। Externed না থাকলে বা চলত। Interned গ্রাম-নিরুদ্ধ, externed গ্রাম-বহিষ্কৃত, transported সমুদ্রান্তরিত,

(দ্বীপান্তরিত ? কোন্ দ্বীপ অন্তরে ?), detenue নিরুদ্ধ। সংস্কৃতে 'আসেধ' custody, legal restraint, কিন্তু কেউ বুঝ্‌বে না।

এসব ছাড়া এখন "গোল টেবিল বৈঠক," Dominion Status, Federal Govt. ইত্যাদি নানা ছন্দের নানা শব্দ শুনছি। Dominion সামন্ত নয়, বটেও; মিত্র নয়, বটেও; স্ব-তন্ত্র বটে, পর-তন্ত্রও বটে। এটার নামান্তর না-কি, colonial। অতএব স-জাতির পরস্পর উপকার, Dominion form of Govt.-এর মূল নীতি। যাঁর Dominion, তিনি 'নাভি'। অতএব বাংলায় প্রতীকার-রাজ্য বা রাষ্ট্র বলতে হয়।

বার্তিকেরা বিষয় চিন্তা করবেন, না শব্দ চিন্তা করবেন। দুই চিন্তায় যুগপৎ আকুল না হয়ে কয়েকজন মিলে শব্দ চিন্তার শেষ করাই ভাল। ১৩২৬ সালের শ্রাবণের "ভারতবর্ষে" "বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি" প্রবন্ধে সাড়ে চারি শত শব্দ সঙ্কলিত হয়েছে। দুই পাঁচটার ব্যাপক অর্থ, দুই পাঁচটার দুরূহ অর্থ হয়ে গেছে। দুই-ই দোষ। এখানে কতকগুলি নূতন শব্দ সঙ্কলন করছি। পূর্ব সঙ্কলিত ও এই সকল শব্দ বার্তিক-সমাজ (Journalists' Association) বিচার করে' ছেপে প্রচার করলে, তাঁদের ও পাঠকের, উভয়েরই সুবিধা হ'তে পারে।

Politics ··· রাষ্ট্রনীতি

Political Division ··· রাষ্ট্র-বিভাগ

State or Province···রাষ্ট্র (দেশ, প্রদেশ, ভৌগোলিক)

Division of a···ভুক্তি

India as a State···অধিরাষ্ট্র; ভারত-রাষ্ট্র

United States of India···ভারত-যৌথ-রাষ্ট্র, রাষ্ট্রমণ্ডল

Constitution···নিয়ম, প্রকৃতি

" - making···প্রকৃতি নির্ণয়

—al···(রাষ্ট্র) নিয়মানুগত

Government···শাসক মণ্ডল

Form of···রাষ্ট্র-তন্ত্র

Unstable·· অপ্রতিষ্ঠ

Autonomous"···স্বশাসিত

Responsible "···জনানুমত

Central "·· নাভি

Provincial "···অনুরাষ্ট্র

Centralized "· মধ্যগত।

Centralization "···মধ্য-গমিতা

Decentralized "···পরিধিগত

Unitary "···একরাট্-তন্ত্র

Federal "···সম্ভূয়-তন্ত্র

National "···স্বরাষ্ট্র তন্ত্র

Dominion status...প্রতীকার-সংস্থা

Diarchy···দ্বি-অর্কী (অর্ক, সূর্য, রশ্মি)—ical···দ্বি-আর্কিক·

Bi-camerel···দ্বি-কক্ষ

Princes···রাজক

" of small States···রাজানক

chamber of ···রাজক-মণ্ডল

Governor of a State···রাষ্ট্রপতি (প্রশাস্তা ?)

" General···ভারত রাষ্ট্রপতি

Private Secretary···ব্যবহর্তা

Governor's Council···অমাত্য-মণ্ডল

a member···অমাত্য

Advisers or ministers···মন্ত্রী

Chief minister…মহামাত্র

Cabinet…গূঢ়ামাত্য

Department…অধিকরণ

officers of a …অধিকৃত

of Law and order…শাসনাধিকরণ

of Justice… ন্যায়াধিকরণ

Military Dept… বলাধিকরণ (যুদ্ধ, battle)

Nation-building "…পালনাধিকরণ ইত্যাদি

Secretaries…সচিব

Chief Secretary…মহাসচিব

Director or Inspector-General…অধ্যক্ষ

The people of a State…প্রকৃতি, জন

Franchise…জনাধিকার

Vote…ভোট। Voter… ভোটর

Casting vote…নিস্পৃষ্ট-ভোট

Electors…বরক

Election · বরণ (Selection …নির্বাচন)

Seperate interests…গণ, যথা বণিকগণ, ভূম্যধিকারীগণ

Electorate…সমূহ বা বরকসমূহ

Indian Legislative Assembly ভারত-ব্যবহারিক সভা

Members of…সভাসদ্, সভ্য

President of… সভাপতি

Provincial Council… রাষ্ট্র-সংসদ্

Members of…সদস্য

President of… সংসদ্‌পতি

Conservatives or Moderates…মন্থর

Liberal…ধীরক

Responsivist…সংবাদী

Extremist…উদগ্র

Notionalist…রাষ্ট্রিক

Communialist…সম্প্রদায়ী ?

Leader · নেতা

Popular…অনুরক্ত-লোক, জনপ্রিয়

Following…অনুগতি

Opposition Bench…বিরোধী, প্রতিবাদ

Speech…সংবাদ

Report… উদন্ত

—er…ঔদন্তিক

Indian nation… ভারতী (ভারতীয় লেখা অনাবশ্যক)

Nation…রাষ্ট্রজন, রাষ্ট্র, জন

Citizens…পৌরজন

Countrymen জানপদ

National…রাষ্ট্রজনিক (প্রায়ই, ভারতী)

" school…স্বদেশী ইস্কুল

Race…রয়* । Racial…রয়িক*

Martial races… শূরজাতি

Depressed classes…অনুন্নত প্রকৃতি

Agriculturists…ক্ষেত্রকর

Growers of…কর, যথা, নীল-কর, নূন-কর

Manufacturers of…কার, যথা, স্বর্ণকার, ঔষধকার

Trading in·· আলা, যথা, কাগজ-আলা, বাড়ী-আলা

(ওয়ালা হিন্দ)

Arts and Industries·· কলা ও ব্যবসায়

Cottage industries···গ্রামিক কলা

Factory ” ···খর্বট কলা

Labour···দেহজীবী

Paid···ভৃত

Unpaid···বিষ্টি (বেঠি)

Intellectuals···বুদ্ধিজীবী

Private servant···পরজীবী

Worker···কার্মিক

Employer···ভর্তৃক

Employee···ভৃতক

Union of···ভৃতক-সমিতি

Trades Union···‘শ্রেণী’

Corporations···‘পূগ’

Class war···ভর্তৃ-ভৃতক কলহ

Organization···বিগ্রহ, কায়

Organized···অঙ্গিত

Affiliated · সংশ্লিষ্ট, অনুগত

Propaganda·· স্বপ্রচার।

প্রাচীন পুথীর সংস্করণ

বাংলা পুথী ভূরি ভূরি আবিষ্কৃত হইতেছে। কোন-কোনটা ছাপা হইতেছে। কিন্তু কয়েকখানা পুথী দেখিয়া সং-স্ক-র-ণ সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছে। বোধ হইয়াছে, এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

যত পুথী আবিষ্কৃত হইয়াছে, সবই কবিতাচ্ছন্দে রচিত। বোধহয়, সব গাওয়া হইত; গাওয়া না হইলেও তান লয়ে আবৃত্তি করা হইত। তা হউক, প্রাচীন পুথী অমূল্য। উহা হইতে সেকালের সাহিত্যের ধর্মাধর্মের, আচার-ব্যবহারের, রীতি-নীতির ইতিহাস পাই। পুথীর বিষয় যাহা হউক, উহা হইতে সে কালের ভাষা—ব্যাকরণ ও শব্দ—জানিতে পারি।

কিন্তু কবির নিজের হাতের লেখা পুথী দুর্লভ। কবি যত পুরাতন, তত দুর্লভ। যাহা পাই, তাহা কবির পুথীর প্রতিলিপিও নহে; অনুলিপি ও অনুলিপির অনুলিপি। বিচক্ষণের দ্বারা অনুলিপি নহে; লেখকের (আজিকালিকার নকল-নবিসের) দ্বারা অনুলিপি। একখান পুথীর প্রত্যেক শব্দ, শব্দের বানান দেখিয়া, প্রত্যেক শব্দের ও পদের অর্থ বুঝিয়া, আর একখান লিখিতে ধৈর্য, শ্রম ও সময় অল্প লাগে না। ভীমসেনও রণে ভঙ্গ দিতেন, মুনিরও মতিভ্রম হইত; লেখকেরও হইত। কেহ কেহ পুথীর শেষে "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" লিখিতেন। মনে করিতেন, কেহ তাঁহার দোষ দিবেন না। কিন্তু সমাপ্তি হইতে বুঝি তিনি সব পদ বুঝিয়া লেখেন নাই। হয়ত, সব পদ পড়িতে পারেন নাই। কেহ পুথী বিক্রয় করিত। তখন ছাপাখানা ছিল না, কিন্তু লোকে পড়িত। কাজেই এইরূপ ব্যবস্থা স্বভাবতঃ হইয়াছিল। কেহ পুণ্য ভাবিয়া, কেহ বেতন লইয়া অন্যের নিমিত্ত পুথী লিখিতেন। পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইলে

পড়ুয়াও পুথী লিখিত। পুথী লিখিতে পারিলে পাঠের চূড়ান্ত মনে হইত। আজি-কালি হইলে 'পাঠাশালাচার্য' উপাধি পাইতে পারিত।

গায়ন নিজের নিমিত্ত অন্যের রচিত গান লিখিয়া লইয়া থাকেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি বর্ণ-বিন্যাসের দিকে থাকে না; রসের দিকে, ভাবের দিকে, ছন্দের দিকে থাকে। এ সময়ে নিজের ভাষা, কদাচিৎ শ্রোতার বোধ্য ভাষা আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। "মঙ্গল" নামে যত গ্রন্থ, সবই গান। রামায়ণ গান, মহাভারত গান, বৈষ্ণব-পদাবলী গান, মনসার ভাসান গান। একের পদ অন্যে শিখিতেন, লিখিয়া লইতেন, পরে গায়ন হইতেন। ইহাঁরা নিজেও গান রচনা করিতে পারিতেন। এমন গান যে মূল কবির গানের সদৃশ হইত। আমরা এখনও তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে কত কবিতা রচিত হইয়াছে! তাহাঁর রচনার মধ্যে বসাইয়া দিলে অন্যের বলিয়া বোধ হইবে না। সে কালেও এরূপ ঘটিত। তখন যে পুথী দাঁড়াইত, তাহা এক কবির থাকিত না।

কিন্তু প্রাচীন কালের গানের একটা বিশেষ ছিল। পয়ারের কিম্বা নাচাড়ীর শেষে কবি নিজের নাম প্রকাশ করিতেন। ইহাকে 'ভণিতা' বলে। কিন্তু পদকর্তার ভণিতা থাকিলে তাহাঁরই রচনা হইতে হইবে, এমন কথা নাই। পদের ভাষা পরিবর্তিত হইয়া থাকিতে পারে, নূতন পদ যোজিত হইতে পারে। যশস্বীর নামে নিজে যশস্বী হইবার বাসনাও অল্প নহে। কেহ বা গুরুর নামে নিজেকে তরাইতে চাহিতেন। কবির নাম দিয়া ভণিতা করিতে বড় কবিরও প্রয়োজন হয় না।

কবির নিজের পুথী অপ্রাপ্য, পুথীর প্রতিলিপিও দুষ্প্রাপ্য। অনুলিপিতে কবিকে ষোল আনা পাইবার আশা অল্প। এই অবস্থায় প্রাচীন পুথী ছাপাইবার পূর্বে উহার সম্যক্ বিচার আবশ্যক। প্রাচীন পুথী দুর্লভ ঐতিহাসিক দ্রব্যজ্ঞানে বিচার করিতে হইবে। ইতিহাস-রসিক যেমন

একটা শিলালিপি, একটা তাম্রপট্ট, একটা প্রস্তর কিম্বা ধাতু-মূর্তি, কি একটা মুদ্রা পাইলে, প্রথমে তাহার প্রাপ্তিস্থান স্মরণ করিয়া দেশ-কাল-বিষয় নির্ণয়ে যত্ন করেন। প্রাচীন পুথী পাইলে প্রথমে তাহার প্রাপ্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেশ-কাল-নির্ণয়ের বাহ্য প্রমাণ অন্বেষণও করিতে হইবে। কি প্রমাণে পুথীর রচয়িতার দেশ-কাল নির্ণীত হইল, তাহা সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিতে হইবে। সকলে সকল কাজের যোগ্য নহে ; প্রাচীন পুথীর বিচার ও তাহার সমীচীনতার পরীক্ষা করিবার যোগ্য সকলে হইতে পারেন না। ইহাতে বিদ্যাবুদ্ধি, বিশেষতঃ নানা অঞ্চলের প্রাচীন ও নবীন ভাষার জ্ঞান আবশ্যক। কারণ, পুথীর ভাষা একটা আভ্যন্তর প্রমাণ। অতএব পুথীর আবিষ্কারক হইলেই পুথীর সংস্করণ-সম্পাদক হইবার যোগ্যতা আসে না। ভূয়োদর্শন ব্যতীত কোন্ কর্ম সুচারু সম্পাদিত হয় ? পুস্তক-বিক্রেতা, পুস্তক-প্রকাশক, পুস্তক-মুদ্রক,—নামেই তাঁহাদের কর্ম বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু "পুস্তক-সম্পাদক" বলিলে সম্পাদন-কর্ম স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। পুথী মুদ্রণের পূর্বে যিনি তাহা মুদ্রণের যোগ্য করেন, এই অর্থে "সম্পাদক" নাম হইয়াছে। মুদ্রণের যোগ্য করিতে পুথীর কিছু কিছু সংস্কার করিতে হয়। এই কারণে "প্রথম সংস্করণ", "নূতন সংস্করণ" বিজ্ঞাপিত হয়। আমার বিশ্বাস, "সম্পাদক" ও "সম্পাদিত" শব্দের পরিবর্তে "সংস্কর্তা" ও "সংস্কৃত" কিম্বা "শোধক" ও "শোধিত" শব্দ প্রচলিত হইলে আধুনিক সম্পাদক স্বীয় কর্মের গুরুত্ব সহজে অবধারণ করিতে পারিতেন।

প্রাপ্ত পুথী নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়,—

(১) পুথী, কবির নিজের লেখা।

(২) পুথী, লিপিকরের লেখা।

(৩) পুথী, লিপিকরের লেখা ; কিন্তু পুথীর নামে, বিষয়ে, ভণিতায় সদৃশ দুই, তিন, বা ততোঽধিক পুথী পাওয়া গিয়াছে।

(৪) পুথীর লেখক অজ্ঞাত।

এই চারি শ্রেণীতে পুথীর সংস্করণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

১। প্রথমে মনে হইতে পারে, কবির নিজের হাতের লেখা পাইলে সংস্কর্তার চিন্তা থাকে না, পুথী অবিকল ছাপাইতে পারিলেই সংস্কর্তার কাজ শেষ হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। পুথীখানি যে কবির নিজের লেখা, তাহার প্রমাণ চাই। পুথী পড়ার অভ্যাস চাই; কবির সময় ও দেশ অনুমান করা চাই; সে সময়ের সে দেশের ভাষা জানা চাই; যে বিষয়ের পুথী সে বিষয়ের জ্ঞান থাকা চাই। এক কথায়, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের জ্ঞান ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পরীক্ষায় অভ্যাস না থাকিলে পুথীর সংস্কর্তা হইতে পারা যায় না। পুথীর ভূমিকা অবশ্য চাই। ইহাতে পুথী-প্রাপ্তির ইতিহাস ও সংস্করণের রীতি স্পষ্ট বিজ্ঞাপিত হইবে। কবির নাম-ধাম-কাল জানা আবশ্যক; নইলে ঐতিহাসিক সত্য হইবে না। কবির কৃতিত্বের সূক্ষ্ম আলোচনা প্রায়ই অনাবশ্যক। কারণ পাঠকের নিকট কৃতী স্বয়ং উপস্থিত; তিনি কৃতীর দোষ-গুণ নিজেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু সংস্করণের বিবরণ সংস্কর্তা না জানাইলে পাঠকের জানিবার উপায় নাই। ভূমিকার প্রয়োজন এই। গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন অবশ্য বলিতে হইবে; কিন্তু সে নিমিত্ত ভূমিকা দীর্ঘ করিতে হয় না। কলিকাতার বটতলায় প্রকাশিত পুথীর প্রধান দোষ এই যে, তাহাতে ভূমিকা থাকে না, প্রকাশিত গ্রন্থ কতখানি সমীচীন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

পুথী প্রকাশের প্রয়োজন স্পষ্ট হইলে অনেক সন্দেহের মোচন হয়। কোন-কোন পুরাতন-গ্রন্থ-সম্পাদক জিজ্ঞাসা করেন, পুথীর ভাষা, শব্দের বানান যেমন আছে, ছাপাতেও তেমন রাখা কর্তব্য কি না। ইহার উত্তর পাঠক দিতে পারেন না। যিনি মূল পুথী বারম্বার পড়িয়াছেন, আদ্যোপান্ত সমগ্র বুঝিয়াছেন, যিনি পুথীখানি ছাপাইবার প্রয়োজন

অনুভব করিয়াছেন, তিনি পুথীর কোন্ অঙ্গের কি সংস্কার আবশ্যক তাহাও বুঝিয়াছেন। যদি বুঝিয়া না থাকেন, আরও সময় লইয়া বুঝিতে যত্ন করিবেন। বটতলার প্রকাশক যে প্রয়োজনে পুস্তক প্রকাশ করেন, সে প্রয়োজন উত্তম সিদ্ধ হইয়া থাকে। তিনি প্রাচীন ভাষা শিখাইতে না বসিয়া সাধারণতঃ পাঠক যাহা চান তাহাই উপস্থিত করেন। পুরাতন পুথী তাঁহার নিকট পুরাণ-বিশেষ। ইংরেজী-শিক্ষিত আধুনিক 'সম্পাদক' ও পাঠকের নিকট কেবল পুরাণ নহে, আজিকালিকার ইতিহাস-তুল্য। কিন্তু সবাই জানি, পুরাণ হইতে ষোল আনা সত্য-উদ্ধার অসম্ভব। নূতন হইতেই ষোল আনা পাওয়া যায় না, পুরাণ ত দূরের কথা। এই কারণে বটতলার প্রকাশক অত-শত বিচারে না গিয়া যাহাতে পুথী তাঁহার পাঠকের বোধগম্য হয়, তাহাতে দৃষ্টি অধিক দেন।

মনে করুন, পুথী পড়িয়া কবিকে বিদ্বান্ বোধ হইল। এস্থলে কবির ভাষা, শব্দের বানান অবশ্য রাখিব। তবে অনবধান-হেতু যে বর্ণাশুদ্ধি ঘটে, তাহা অবশ্য সংশোধন করিব। কারণ, কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তিনি নিজেই সে দোষ সংশোধন করিতেন। অধুনা ছাপাখানায় কত লেখকের বানান মুদ্রণ-পরীক্ষকের দ্বারা সংশোধিত হইয়া ছাপা হইতেছে। সেকালে ছাপাখানা থাকিলে পুথী এইরূপ সংশোধিত হইত।

মনে করুন, কবির কবিত্ব-প্রকাশ সংস্কর্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। তখন যেমন ছোট বড় অক্ষরের তারতম্যে কবিত্ব-প্রকাশে বিঘ্ন হয় না, তেমনই কবির নিকট জ কি য, স কি শ, ন কি ণ, ই কি ঈ, প্রভৃতি বর্ণদ্বন্দ্বও বিচার-অযোগ্য হইয়াছিল। কবি গান করিলে এ সব দ্বন্দ্বে শ্রোতার কর্ণ পীড়িত হইত না। কিন্তু গান শোনা এক কথা, আর তাহা পড়া এবং পড়িয়া বোঝা অন্য কথা। এস্থলে কবিত্ব প্রকাশে যাহাতে বিঘ্ন না হয়, তাহাই দেখিতে হইবে, আবশ্যক সংস্কারও চলিতে পারিবে।

সে সংস্কার কবির সময়ের ও দেশের অনুযায়ী করিতে পারিলে ভাল হইবে। অ-শিক্ষিত কবির বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া পাঠক কি শিখিতে পারিবেন? তাঁহার কবিত্ব চাই, বানান ত চাই না। সে কালের অশিক্ষিত কবি কোন্ শব্দের কি বানান করিতেন, তাহাও জানাইবার প্রয়োজন হইলে ভূমিকায় অল্পকথায় অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

কোনও স্থলে শব্দ-পরিবর্তন কদাপি উচিত নহে। কোন শব্দ পড়িতে না পারিলে, বুঝিতে না পারিলে, তাহা যথাযথ রাখিতে হইবে। কিন্তু সংস্কর্তা সে শব্দ পড়িতে বুঝিতে যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে জানাইবার নিমিত্ত শব্দের গায়ে কিম্বা পাদটিপ্পনীতে প্রশ্নার্থক চিহ্ন দেওয়া উচিত। প্রাচীন ভাষা, দেশ-বিদেশের ভাষা, সাধারণ পাঠকের প্রায়ই দুর্বোধ্য। অতএব টীকা আবশ্যক। বিপুল নহে, কিন্তু বিশদ। জানা শব্দের নহে, অজানা শব্দের, অজানা উদ্দেশ্য, উদাহরণ, পুরাবৃত্তের। টীকা করিতে অসমর্থ হইলে সংস্কর্তা অযোগ্য। কারণ, তখন তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ শুদ্ধ কি না, বুঝিতে পারা যায় না। দুই-চারিটা শব্দ বুঝিতে না পারা দোষের নহে। কিন্তু টীকা না করা, কিম্বা টীকায় পুনঃ পুনঃ ভুল লেখা অমার্জনীয়। টীকা পৃষ্ঠপাদে না দিয়া পুস্তকের শেষে পৃষ্ঠাঙ্ক সহিত দেওয়া কর্তব্য। সকল শব্দের অর্থ জানা থাক, আর না-ই থাক, দুরূহার্থ যাবতীয় শব্দের তালিকা দেওয়া চাই। সংস্কর্তা কত সাবধানে পুথী পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা এইখানে। ছাপাতে ভুল না হয়, সে বিষয়ে অবশ্য সাবধান হইতে হইবে। যদি ভুল হয়, তাহা হইলে শুদ্ধিপত্র দিতে হইবে। কিন্তু সে শুদ্ধিপত্র গ্রন্থের অন্তে নহে, আদ্যে যোজনা কর্তব্য।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা অন্যান্য শ্রেণীর পুথীর সংস্করণেও প্রযোজ্য। বিশেষ যাহা, তাহার বিচার করা যাউক।

২। মাত্র একখানি পুথী পাওয়া গিয়াছে; ভণিতায় কবির নাম

আছে। পুথী-শেষে লিপিকরের নাম-ধাম সমাপ্তি-কাল আছে। বলা বাহুল্য, এস্থলে প্রথমে লিপিকরকে পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহার বিদ্যার পরীক্ষা, তাহার সাবধানতার পরীক্ষা, দুই-ই করিতে হইবে। কারণ তাহার হাত দিয়া কবিকে পাইতেছি। একই শব্দের বিভিন্ন বানান কদাপি বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। কবির কাল ও দেশ অনুমান করিতে পারিলে লিপিকরকে পরীক্ষা করার সুবিধা হয়। সর্বনাম ও ক্রিয়ার বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেখিলে পুথীখানি অধম মনে করিতে পারা যায়। কারণ, কবির দেশ যাহাই হউক, তিনি বিভক্তি একই রাখিয়া থাকেন। অতএব বিভক্তি-ভেদ দেখিলে দুই অনুমান হয়; (১) কবি ও লিপিকরের দেশ-কাল এক নহে; কিম্বা (২) লিপিকর অসাবধান। কত স্থানে কি বিভক্তির অন্যথা ঘটিয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে দুই অনুমানের একটা বলবান্ হইবে। প্রায়ই প্রথম অনুমান ঠিক মনে হইবে; কারণ, একই দেশের কবি ও লিপিকরের ভাষায় প্রভেদ হয় না। বিভক্তি ব্যতীত একই শব্দের নানা রূপ পাইলে লিপিকরকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মনে করুন, কবিকঙ্কণের ভণিতাযুক্ত একখানি পুথী মৈমনসিংহের এক আধুনিক লিপিকরের লেখায় পাওয়া গিয়াছে। সে পুথীতে কবিকে পাওয়া দুরাশা; কবিত্ব পাওয়া যাইতে পারে, ভাষা পাওয়া অসম্ভব। কবির গান মৈমনসিংহে পরিবর্তিত হইবেই হইবে, কিছু অপরিবর্তিতও থাকিবে। সে পুথী হইতে মূল উদ্ধারের চেষ্টা বৃথা। মনে করুন, কবিকঙ্কণের দেশ-কাল জানা নাই; কিন্তু তাঁহার ভণিতাযুক্ত এক পুথীখানি মৈমনসিংহে পাওয়া গিয়াছে। এখানেও ভাষা লক্ষ্য করিলে ভাষা বা তাহার মিশ্রণ বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু উক্ত পুথী রঙ্গপুরের লিপিকরের লেখা হইলে সমস্যা গুরুতর হইবে। কারণ রাঢ়ের প্রাচীন ভাষা ও রঙ্গপুরের ভাষায় অনেক সাদৃশ্য ছিল। মোটকথা, এরূপ পুথীর প্রামাণিক সংস্করণ অসম্ভব।

বিশেষ উদ্দেশ্যে ছাপাইতে হইলে লিপিকরের সমাপ্তি সহিত ছাপান কর্তব্য।

৩। মনে করুন, কবির কৃতির দুই তিন অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। অনুলিপি আর প্রতিলিপি এক নহে। প্রতিলিপি বিরল, এই হেতু সে সব পুথী অনুলিপি, অর্থাৎ এক এক লিপিকরের এক এক সংস্করণ, মনে করাই যুক্তি-সঙ্গত। এরূপ স্থলে প্রথমে প্রত্যেক লিপিকরের পরীক্ষা করিতে হইবে, তারপর সব পুথীর পাঠের সাদৃশ্য বিচার করিতে হইবে। যে পাঠ সব পুথীতে আছে, তাহা প্রায়ই গ্রাহ্য করিতে হইবে। তন্মধ্যে কবির দেশের এবং নিকটবর্তীকালের লিপিকরের পাঠ অধিক গ্রাহ্য। কিন্তু তা বলিয়া এই লিপিকরের বানানও গ্রাহ্য, এমন নহে।

এসব স্থূল কথা। সূক্ষ্ম কথা লিপিকরের নিকট পাওয়া যায় এবং কোন্ পুথী অধিক গ্রাহ্য তাহা সে-ই বলিতে পারে, তাহার পুথীতেই ধরা আছে। পুথী পুরাতন বলিয়া কিম্বা কবির দেশে প্রাপ্ত বলিয়া তাহা অধিক বিশ্বাস্য না হইতে পারে। যদি সব পুথীর পাঠে মিল না থাকে, মিল থাকিবার কথা নয়,—কিম্বা দুইটায় থাকে, তিনটায় না থাকে, তাহা হইলে যে পাঠে অর্থ স্পষ্ট হয়, সে পাঠের ভাষা কবির সময়ের ও দেশের; সে পাঠ গ্রাহ্য, অন্য অগ্রাহ্য। এ সকল স্থলে পৃষ্ঠপাদে পাঠান্তর-প্রদর্শন অনাবশ্যক। অনাবশ্যক টিপ্পনীতে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যেখানে দুইটা পাঠ সমীচীন বোধ হয়, সেখানে প্রদর্শন ভাল। কিন্তু যেখানে দুই তিন চারি পাঁচ পাঠের সবই প্রায় সমান, সেখানে এত পাঠ উদ্ধার করিয়া কোনও ফল নাই। মনে রাখিতে হইবে, বহু পাঠান্তর দ্বারা একটা ক্ষুদ্র বিষয় বৃহৎ কল্পিত হইতে পারে। সত্যের পথরোধ যেমন দোষের, অসত্যের পথ-মোচনও তেমন দোষের।

পুরাতন পুথীর বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে দীনেশবাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে (৩য় সং ৫৩ পৃঃ টীকা) লিখিয়াছেন, "আমরা উদ্ধৃত অংশের

অনেক স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিব না। প্রথমতঃ প্রাকৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অবিকৃত রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, উদ্ধৃতকারীর প্রাচীন রচনার সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না, তাহা সন্দেহ-স্থল। যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা,—শুদ্ধ করিতে গেলে সেইপথ রুদ্ধ হয়।"

ইহার উত্তরে বক্তব্য, "মূল হাতের লেখা অবিকৃত" আছে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে এবং যদি তাহাতে "ঐতিহাসিক সত্য" লুকায়িত থাকে তাহা হইলে কলমচালনা কদাপি কর্তব্য নহে। কিন্তু যদি না থাকে, যদি অনুলিপির অনুলিপি, অশিক্ষিতের অনুলিপি হয়, তাহা হইলে বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার নৈকট্য নিরূপণ করিতে হইবে কি? একই লিপিকরের বানানে একই শব্দের বিভিন্ন রূপ দেখিয়া কি শেখা যাইতে পারে? এইটুকু মানা যাইতে পারে, সে লিপিকরের জ্ঞানে তাহার সময়ে তাহার দেশে বিভিন্ন বানানে দোষ হইত না। "প্রাচীন রচনা-সংস্কার করিবার অধিকার" কাহারও নাই; কিন্তু যদি কেহ অনধিকার চর্চা করিয়া থাকে, তবে সংস্কর্তা কেন করিতে পারিবেন না? তাছাড়া রচনা-সংস্কার এক কথা, বর্ণাশুদ্ধি-সংস্কার অন্য কথা। দুই-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রচনাই কাব্য, বানান নহে, অক্ষরের আকৃতিও নহে। তবে যদি বানান-জ্ঞান জানিবার প্রয়োজন হয়, বানান রাখিতে হইবে; অক্ষরের আকৃতি জানিতে হইলে তদনুরূপ অক্ষরে ছাপাইতে হইবে। সংস্কারের সময় "হয়ত" মনে হইল সংস্কার কর্তব্য নহে; যেখানে "হয়ত" কিছু নাই, সেখানেও "ঐতিহাসিক সত্য" লুক্কায়িত মনে করিতে হইবে কি? যিনি এই "হয়ত" বিচার করিতে না পারিবেন, তিনি কোন্ অধিকারে সংস্কর্তা হইতে বসিবেন? তাঁহার পক্ষে পুথীর পাতাগুলোর ফটোগ্রাফ প্রকাশ কর্তব্য।

সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পুথীর আকারে ছাপা হইয়াছে। কারণ, অন্ত আকারে মাহাত্ম্য প্রকাশে প্রত্যবায়ের আশঙ্কা না কি আছে। প্রাচীনের সম্মান অবশ্য কর্তব্য। কারণ, প্রাচীন হইতে নবীনের উৎপত্তি এবং প্রাচীনকে ছাড়িয়া নবীনের স্থিতি হইতে পারে না। কিন্তু অর্বাচীনে প্রাচীনত্বের আরোপ দ্বারা ভ্রমচক্র সৃষ্টি হয়। গ্রাম্য জনের ভাষা ও বানান বালকের তুল্য। বাল-ভাষিত মধুর; নগরিয়া সাহিত্য-রসিকের নিকট গ্রাম্য পদ তেমন মধুর, গ্রাম্য বানান তেমন নূতন। এই কারণে, পুথীর সংস্করণের সময়ে চিত্ত-সংযম ও পুথী প্রকাশের প্রয়োজন পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান না করিলে কৃত্রিম প্রাচীনতার দিকে ঢলিয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে। লিপিকর শব্দের উচ্চারণ অনুসারে বানান করিয়া থাকিলে বানান হইতে শব্দটা জানিতে পারা যাইত। কিন্তু একই শব্দের, একই বিভক্তির বিভিন্ন বানান পাইলে বুঝিব লিপিকর উচ্চারণ অনুসারে বানান করে নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, লিপিকর লিখিতে পড়িতে জানিত। সে কি কৃত্রিম বানান শিখে নাই ? যদি লিপিকরের ব্যাকরণ ও বানান, এমন কি হাতের লেখার ছাঁদ দেখাইতে হয়, তাহা হইলে ভূমিকায় স্বচ্ছন্দে দেখাইতে পারেন; হয়ত, বাঙ্গালা-প্রাকৃত-ভাষা শিক্ষার্থীর কাজে আসিবে। ফল কথা, যাহা করিবেন, তাহা একটা সূত্র ধরিয়া করিবেন এবং সে সূত্র পাঠককে জানাইবেন। আর, সম্পাদক বা সংস্কর্তা নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখিবেন না, সংস্করণের প্রামাণিকতা গোপন করিবেন না।

৪। শেষে মনে করুন, পুথীখানির লিপিকরের নাম, ধাম, কাল অজ্ঞাত। এমন একখানি পুথী বহু সমীক্ষিত হইলেও তাহার সংস্করণ কদাপি সমীচীন হইতে পারিবে না। কত মুখে কত ভাল ভাল গান চলিত আছে। সে সব বঙ্গ-ভাষার সম্পত্তি; কিন্তু এই পর্যন্ত। আমরা যাহা খুঁজিতেছি, কবি কাল দেশ, সে পুথীতে তাহার অত্যল্পই পাইব।

কয়েকখানা পুথীর সংস্করণ সমালোচনা করিলে উপরের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

(১) কবিকঙ্কণ চণ্ডী। দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্গবাসী প্রেসে নটবর চক্রবর্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১৩॥

সম্পাদকের নাম নাই, কিন্তু "সম্পাদকীয় মন্তব্য" আছে। গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু মূল পুথী কিম্বা সংস্করণের রীতি সম্বন্ধে কিছুই নাই। পুস্তকের মধ্যে পাদটীপ্পনী হইতে (ভূমিকা হইতে নহে) জানিতেছি, একখানির অধিক পুথী এবং ছাপা কবিকঙ্কণ সংগৃহীত হইয়াছিল। কি কারণে সে সব পুথী আদর্শ হয় নাই, এবং কি কারণেই বা অন্য পুথীর অতিরিক্ত পদ গ্রন্থ-কলেবরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে না। কবিকঙ্কণের যাবৎ তাবৎ আভাস পাইতে হইলে বট-তলার সংস্করণ ছিল। "বঙ্গবাসীর" সংস্করণে কি অভাব পূরণ হইয়াছে ? "অপ্রচলিত ও প্রাচীন শব্দের অর্থ" দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থে বহু ভুলও আছে। আর এক বিশেষ, সম্পাদক মহাশয় সংস্কৃত-প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র ধরিয়া পুথীর বানান শুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা হয়ত নবীনকে প্রাচীন করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর প্রকৃত নাম "অভয়া মঙ্গল", অভয়ার মাহাত্ম্যকীর্তন গান। লিপিকর গান লিখিয়াছিল, সেকালের বানান ও ব্যাকরণ শিখাইতে বসে নাই। সম্পাদক লিখিয়াছেন, "যতদিন পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা ভাষার অভিধান সংগৃহীত না হইবে, ততদিন প্রাচীন শব্দের অর্থজ্ঞান সন্দেহ-বিজড়িত থাকিবে।" কিন্তু ইহাও সত্য, যতদিন প্রাচীন পুথীর সংস্কর্তা বা সম্পাদক অবহিত না হইবেন, ততদিন প্রাচীন শব্দের কোষ হইতে পারিবে না। কারণ, কোষের শব্দ ও অর্থ এই সব পুথী হইতে পাইতে হইবে।

(২) ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল। তৃতীয় সংস্করণ। বঙ্গবাসী প্রেসে নটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১৮ সাল॥

ঘনরাম দুই শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। "বঙ্গবাসীর" স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ছয়খানি হস্তলিখিত পুরাণ পুথী সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের পাঠ মিলাইয়া যে পাঠ ভাল বোধ হইতে লাগিল, তাহাই ছাপিতে লাগিলাম।" কিন্তু বলেন নাই, তাঁহার "ভাল বোধ" দ্বারা কি বুঝিতে হইবে। পুথী ছয়খানির বিবরণও দেন নাই। আরও লিখিয়াছিলেন, "অশুদ্ধ, অসংলগ্ন পাঠ দিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া গোঁজামিলন দিয়া ছাপা খারাপ রাখিয়া ঘনরাম বাহির করিবার চেষ্টা করি নাই।" আমি ঘনরামের প্রথম সংস্করণ দেখি নাই। তৃতীয় সংস্করণে দেখিতেছি, অশুদ্ধ অসংলগ্ন পাঠ দূরে থাক, ছাপার ভুলও সংশোধিত হয় নাই, শুদ্ধিপত্রও নাই। দুঃখের বিষয়, মাত্র দুই শত বৎসরের পুরাতন কবির বহির—যাহার ছয়খানা অনুলিপি পাওয়া গিয়াছিল, তাহারও সমীচীন সংস্করণ পাওয়া গেল না। হয়ত পাঠোদ্ধারে ভুল, নয়ত ছাপার ভুল হইয়াছে। প্রদত্ত অর্থেও স্থানে স্থানে ভুল আছে। অথচ একের পর দুই, দুই-এর পর তিন, সংস্করণ বাহির হইয়াছে! যথা, 'গন'—গহন (১৮ পৃঃ), 'দলুজ'—ঘরের দাওয়া (৪৮ পৃঃ), 'ফলঙ্গে'—তেড়ে গিয়া (৭০ পৃঃ), 'ছোবাইয়া'—লেলাইয়া (৯২ পৃঃ), ইত্যাদি।

(৩) পদ্মপুরাণ। বংশীদাস রায় বিরচিত। শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী, শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী এম-এ, বি-এল সম্পাদিত। ভট্টাচার্য এণ্ড সন্সের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। সন ১৩১৮॥

এই গ্রন্থের এক অজ্ঞাতনামা প্রকাশক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থ সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে যত্ন করা হইয়াছে, কিন্তু ভ্রম-প্রমাদ-সঙ্কুল ও বর্ণাশুদ্ধি পরিপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদন অতি দুরূহ কার্য। তাহাতে এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মুদ্রণকার্য চলায় মুদ্রাযন্ত্রের ও মুদ্রাকরের দোষ এবং প্রুফ দেখার ত্রুটিতে গ্রন্থখানি ভ্রম-প্রমাদ-বিবর্জিত হয় নাই।"

এই উক্তি পড়িয়া আশ্চর্য হইয়াছি, কারণ, এখানে দুই বিরোধী উক্তি পাওয়া যাইতেছে। একদিকে বিশেষ যত্ন, অন্য দিকে ভ্রম-প্রমাদ। অপর কথা কি, ছাপার ভুল সংশোধনের নিমিত্ত শুদ্ধিপত্র যোজনার প্রয়োজনও অনুভূত হয় নাই! পুস্তকে আটখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি কবির বর্তমান বংশধরের আবাসের ফটোগ্রাফ, অন্য সাতখানি পদ্মাদেবী, লক্ষ্মীধর ও বিপুলার আধুনিক ধরণের চিত্র! এই আধুনিক ধরণ দেশ ছাড়া; বিলাতী যুবক-যুবতীর প্রতিমূর্তি; চিত্রদ্বারা পূর্বাপর সঙ্গতির বিলক্ষণ হানি হইয়াছে। পুথীর উৎপত্তি দেখি। ময়মনসিংহ (?) হইতে চারিখানি পুথী পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনখানি কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসরের পুরাতন। চতুর্থখানির সময় লিখিত হয় নাই। এই চারিখানির একখানিও বংশীদাসের বংশের পুথী নহে। অন্যদিকে, "সকল পুথীই প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে গীত হইয়া আসিতেছে।" অথচ কেন একখানিকে আদর্শ করা হইয়াছে, তাহা প্রকাশক দূরে থাক, সম্পাদকদ্বয়ও জানান নাই। বংশীদাসের বর্তমান বংশধরগণের নিবাস কোথায়, তাহাও জানান নাই। ছাপা পুস্তকে দেখিতেছি, বংশীদাসের বংশের পূর্বনিবাস রাঢ়ে ছিল। তাহাঁর এক পূর্ব-পুরুষ রাঢ় ছাড়িয়া লৌহিত্যের পাশে আসিয়া বাস করেন। বংশীদাস ছয় পুরুষে পড়িয়াছিলেন। তিনি ১৪৯৪ শকে পদ্মার পুরাণ রচনা করেন। হয়ত, ছয় পুরুষ বাসেও রাঢ়ের ভাষার ব্যাকরণ ভুলিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "যদি বা অশুদ্ধ হয় দেশভাষা মতে। বিজ্ঞজনে লইবেন পূরিয়া পশ্চাতে॥" বাস্তবিক দেখিতেছি, ছাপা পুস্তকে রাঢ় ও ময়মনসিংহের (?) সর্বনাম ও ক্রিয়া-বিভক্তি মিশিয়া এক অপূর্ব কৃশরান্ন উৎপন্ন হইয়াছে। সাড়ে তিন শত বৎসরের কবির এক শত বৎসরের অনুলিপি, গায়নের অনুলিপি, হইতে সমীচীন সংস্করণ দুরূহ। সম্পাদক ৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী 'প্রস্তাবনা' লিখিয়াছিলেন। তাহাঁর অনুমানে

মৈমনসিংহের নারায়ণদেব পদ্মাপুরাণের আদি কবি। ইহাঁরও এক পূর্ব-পুরুষ রাঢ় ছাড়িয়া মৈমনসিংহের এক গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ হইতে বংশীদাস কিছু কিছু পদ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। অতএব এই কারণেও পদ্মাপুরাণের বর্তমান পুথীর ভাষার নানা রূপান্তর হইয়া থাকিবে। এস্থলে সংস্কর্তা বা সম্পাদকের কি কর্তব্য ছিল? বোধহয়, কবিকে দেখিবার আশা না করিলে ভাল হইত। তাহাঁর কবিত্ব ও তাহাঁর পুরাণ প্রকাশ উদ্দেশ্য হইলে পুথীর ভাষা সর্বত্র একপ্রকার করা যাইতে পারিত। এখানে মনে হইতে পারে, এরূপ করিলে পুথী প্রাচীন থাকিত না; তাহা ছাড়া কোথাকার আদর্শে ভাষা একপ্রকার করিতে হইত? কিন্তু পুথীর বয়স ত প্রাচীন নয়, একশত বৎসর মাত্র। আর, পুথীর ভাষা কি, কি নয়, তাহা একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সম্পাদকদ্বয় কতকগুলি শব্দের অর্থ দিয়াছেন। ভুলও করিয়াছেন। অর্থে ভুল হওয়া আশ্চর্য নহে। কিন্তু যাবতীয় অপ্রচলিত শব্দের তালিকা দিলে ভাল হইত। পাঠে ভুল হয় নাই, বুঝিতে পারা যাইত। যে যে শব্দ মৈমনসিংহে অদ্যাপি চলিত আছে, তাহা নির্দেশ করিলে অন্ততঃ সে শব্দের প্রদত্ত অর্থে সন্দেহ থাকিত না।

(৪) দ্বিজ কমল-লোচন প্রণীত চণ্ডিকা-বিজয়। শ্রীপঞ্চানন সরকার এম-এ, বি-এল সম্পাদিত ও রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গাব্দ ১৩১৬॥

এই পুস্তকের "ভূমিকা" একজন, "আলোচনা" অন্যজন, "মন্তব্য" সম্পাদক লিখিয়াছেন। কিন্তু যাহার গোড়া ঢিলা, তাহাতে হাজার ঠেকনা লাগাই, তাহা দৃঢ় হয় না। একখানি পুথী, অ-শিক্ষিত লিপিকরের পুথী, দেখিয়া চণ্ডিকা-বিজয় ছাপা হইয়াছে। কবির বাস রঙ্গপুর জেলায় ছিল। কিন্তু তিনি কবে ছিলেন, তাহা জানা নাই। কবি

একস্থানে লিখিয়াছেন, "দিল্লীশ্বর সুতের জাগির।" "আলোচক" অনুমান করেন, দিল্লীশ্বর শাহজাহানের পুত্র শাহ শুজার উল্লেখ হইয়াছে; এবং কবিকে ২৫০ বৎসরের পূর্ববর্তী বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিন্তু লিপিকর মাত্র একশত বৎসর পূর্বে ছিলেন; তাহাঁর বাস রঙ্গপুরে নয়, বগুড়ার অন্তর্গত শেরপুরে ছিল। সে যাহা হউক, সম্পাদক উপস্থিত গ্রন্থ-সম্পাদকের রীতি জানাইয়াছেন, শুদ্ধ করিতেও যত্নবান্ হইয়াছেন। কিন্তু বোধহয়, আর একটু শুদ্ধ করিতে পারিতেন। পুথীর বানানরক্ষা অনাবশ্যক ছিল। কারণ, একশত বৎসর পূর্বে গ্রাম্য লেখকের বানান হইতে আড়াই শত বৎসরের কবির বানান পাওয়া অসম্ভব। কবি যে সংস্কৃত জানিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এক "বাস্তোস্পতি" শব্দেই তাহাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইতেছি। এমন কবির গ্রন্থে 'প্রিওজন' (প্রয়োজন), 'আবাস্তর' (আভ্যন্তর), 'প্রগাণ্ড' (প্রকাণ্ড) 'ক্রেপা' (কৃপা) প্রভৃতি শব্দ থাকা অসম্ভব। কবি নিশ্চয় ক্রিয়াপদের পূর্বাপর সমতা রক্ষা করিয়া লিখিয়াছিলেন। মুদ্রিত পুস্তকে 'ইলুঁ, ইলাঙ' বিভক্তিযুক্ত পদ আছে। অতএব 'করিল', 'পাইল', 'দেখিল' প্রভৃতি 'ইল' বিভক্তিযুক্ত পদ লিপিকরের প্রমাদ-জাত। আমরা লিপিকরকে চাই না, কবিকে চাই। কারণ লিপিকরের 'ষুবর্ণ', 'আক্রেতি' প্রভৃতি বানান, কিম্বা তাহার হাতের লেখার আকার প্রভৃতির গবেষণা একেবারে অনাবশ্যক। আবশ্যক হইলে ফটোগ্রাফ সোজা পথ ছিল। সম্পাদক স্থানে স্থানে টীকা করিয়াছেন, "প্রাদেশিক ও অপ্রচলিত শব্দের সূচী" দিয়াছেন। তিনজনে চণ্ডিকা-বিজয় সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু কেহ সংস্কৃত চণ্ডীর সহিত তুলনা করেন নাই! চণ্ডীমাহাত্ম্য কাব্যে "সরম কথা শুনলো সজনি। শ্যামবন্ধু মনে পড়ে দিবসরজনী॥" ইত্যাকার ধুআ কবির হইতে পারে কি? আশ্চর্য এই, তিন জনেই এই ধুআ উপেক্ষা করিয়াছেন।

(৫) ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী নং ৩। কবি ভবানীদাস বিরচিত ময়নামতীর গান। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত। সন ১৩২১ ॥

প্রথম সম্পাদক ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতেছি, দুইখানি পুথীদৃষ্টে "ময়নামতীর গান" ছাপা হইয়াছে। লিপিকরদ্বয় কুমিল্লার মুসলমান। একখান পুথী মাত্র আশী বৎসরের; অন্যখানার সময় বলা হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় আমার আলোচ্য প্রশ্নই উত্থাপন করিয়াছেন, "পাঠোদ্ধার করিয়া কি অবিকল তাহাই মুদ্রিত করা উচিত ?" তিনি মনে করেন "লিপিকরের স্পষ্ট ভুলগুলি মুদ্রিত করিয়া আমরা প্রাচীন সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছি। বর্ণ-বিন্যাসের ও ভাষার বিশেষত্বগুলি বজায় রাখিয়া সুসঙ্গত করিয়া পুস্তক বাহির করিলেই বোধহয়, ভাল হয়।" আমিও তাহা বলি, সু-সঙ্গত করিয়া ছাপাইতে বলি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উপস্থিত পুস্তকের ভাষা ও বর্ণ-বিন্যাসের বিশেষত্বগুলি কবি ভবানীদাসের, না লিপিকরের ? কোথায় কবে ভবানীদাস ছিলেন, জানা নাই। ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান পড়িতে লিপিকরের 'আমাবেশ্যা,' 'শনীবার,' 'পদ্ধনাম,' 'হুদ্রে,' 'পিহ্রতি,' 'গৃতের,' 'গ্রিহ,' ইত্যাদি বর্ণ-বিভীষিকার প্রয়োজন আছে কি ? 'শ্যেমী শেঁ্যামী স্যাঁমী স্যামী,' 'শৃঙ্গার, শ্রিঙ্গার', 'পড়ি পরি'; 'স্তীহ্ন স্তিরি'; 'য়ান্দার আন্দার' প্রভৃতি বিভিন্ন বানান দ্বারা ময়নামতীর গান বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে কি ? ভট্টশালী মহাশয় স্ব-কল্পিত সূত্র স্বয়ং ছেদন করিয়াছেন।

(৬) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত ভাগবতাচার্য-কৃত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী। ১৩১২ ॥

এক কথায় এই সংস্করণ শেষ করিতে পারা যায়। ইহার ভূমিকা নাই। আর প্রথম পদেই দেখিতেছি, "ব্রজরমিণী জীবন।"

(৭) মাণিকরাম গাঙ্গুলীর শ্রীধর্মমঙ্গল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত ॥

ইহাতেও সম্পাদকের নাম নাই, ছাপাইবার সন পর্যন্ত নাই। পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। তাহা পুস্তকের সহিত যুক্ত হয় নাই। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (১৯০৮ ?) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মাণিক গাঙ্গুলী একখানি ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। এই ধর্মমঙ্গলখানি সংস্কৃত বিস্তৃত ভূমিকাসহ সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।" বস্তুতঃ, দুইটা কথার একটাও ঠিক নহে। মাণিক গাঙ্গুলী ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন নাই, বহুকাল পরে; আর পুথী ভূমিকাসহ প্রকাশিতও হয় নাই।

(৮) রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড)। শ্রীকৃত্তিবাস বিরচিত। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত। ১৩০৭ সাল ॥

ভূমিকা হইতে জানিতেছি, সাতখানা পুথী সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি ৩০০ বৎসরের, অন্যগুলি ন্যূনাধিক ১০০ বৎসরের। বলা বাহুল্য, সবই লিপিকরের সংস্করণ। পুরাতনখানি আদর্শ হইয়াছে। কেন হইয়াছে, সে পুথী-প্রাপ্তির ইতিহাস, পুথীর লেখকের নাম ধাম ইত্যাদি পাঠকের নিকট অজ্ঞাত রাখা হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে লিপিকরের সমাপ্তিও নাই। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থ সম্পাদনে আদর্শ পুথীর বর্ণযোজনা, খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন অন্যস্থলে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই। এখন যদিও আমরা সংস্কৃতের আদর্শে বাঙ্গালা গড়িয়া তুলিতেছি, তথাপি বঙ্গভাষা প্রাকৃতের দুহিতা, সংস্কৃতের নহে। খাঁটি বাঙ্গালার বর্ণযোজনা প্রাকৃতের বর্ণযোজনার অনুরূপ। যাহাঁরা প্রাকৃতের অনুশীলন করিয়াছেন, তাহাঁরা

এই গ্রন্থ পাঠকালে এ কথার অনেক প্রমাণ পাইবেন।” সম্পাদক মহাশয় দুই-পাঁচটা দৃষ্টান্ত দিলে তাহাঁর যুক্তি বুঝিতে পারা যাইত। কারণ যে সংস্কৃত-প্রাকৃত বঙ্গভাষার জননী বলিয়া পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন, সে ভাষা বহু পুরাতন। জননী ও দুহিতা, এই রূপকেই তাহাঁরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহাকে তাহাঁরা জননী মনে করেন, সেই জননী এক সময়ে ছিলেন, পরে দুহিতা প্রসব করিয়া অন্তর্হিত হন নাই। কালে কালে রূপান্তরিত হইয়া এখনও বর্তমান আছেন এবং তাহাকেই বঙ্গভাষা বলিতেছি। একটা কথা ঠিক, সে কালের লিপিকর স্ব-সময়ের ও স্ব-দেশের ধ্বনি-সম্বাদী বানান প্রায়ই করিতেন। মূর্খ হইলে সংস্কৃত শব্দেরও করিতেন। একালের লিপিকর তাহাই করেন। আমাদের চোখে ই ঈ, উ ঊ, জ য, ণ ন, শ ষ স, ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু কাণে এক। লিপিকার কাণকে প্রমাণ ধরে, চোখকে নহে। অতএব তিনশত বৎসরের পুরাতন পুথী হইতে সেকালের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ জানা যাইতে পারে। একালের লেখা হইতে যেমন একালের ভাষার ব্যাকরণ পাই, সেকালের লেখা হইতে তেমনই সেকালের পাই। কিন্তু সেকালের অসাবধান, অশিক্ষিত লিপিকরের লেখা হইতে বড় একটা পাই না। আদর্শ পুথী যে এইরূপ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ মুদ্রিত পুস্তকে পাইতেছি। ‘নাচাড়ী’ কোথাও ‘নেচারি’, কোথাও ‘নেচাড়ি,’ কোথাও ‘নাচাড়ি’; ‘কতি’ কোথাও ‘কতি,’ কোথাও ‘কতো,’ কোথাও ‘কথো,’; ‘ইয়া’-প্রত্যয়—কোথাও ‘ইয়া,’ কোথাও ‘ইআ’ (কদাচিৎ ‘ইঞা’); ‘ইলাম’ বিভক্তি—কোথাও ‘ইলাঙ,’ কোথাও ‘ইলা,’ কোথাও ‘ইনু’; ইত্যাদি হইতে বড় একটা কিছু শিখিতে পারা যায় না। বোধহয় পুথীখানা দুই-চারি হাত ফিরিয়াছিল। তিন শত বৎসরের পুথীতে ‘মেনে’ (৭।৯ মানে), ‘মুনিদের’, ‘ইলাম’ বিভক্তি দেখিয়া মনে হয়, পুথীতে কেহ দাগরাজি করিয়াছিল। সম্পাদক লিখিয়াছেন,

"কৃত্তিবাসের ভাষাগত ও ব্যাকরণগত বিশেষত্বগুলি আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়।" এখানে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, আদর্শ পুথী কৃত্তিবাসের পুথীর অবিকল প্রতিলিপি। কিন্তু কৃত্তিবাস ও এই পুথীর লেখকের কালে শতাধিক বর্ষের ব্যবধান! নিবাসে কত যোজনের ব্যবধান ছিল, তাহাও জানি না। দেখুন, সংস্কৃত শাস্ত্রের বচনেরও রূপান্তর হইয়াছে; কৃত্তিবাসের রামায়ণ শাস্ত্র নহে, গান; সে গান রামায়ণ-গায়নে, অদ্যাপি গাইয়া থাকে। সম্পাদকও লিখিয়াছেন, অন্য ছয়খানি পুথীর সহিত "আদর্শ পুথীর মিলন করিয়া পাঠান্তর সংযোগ করা পণ্ডশ্রম মাত্র।" অতএব সাতখানা পুথী পাইয়াও পাঠের সন্দেহ থাকিতেছে। 'পক্রিয়া' (প্রণমিয়া ?) 'শরণপঞ্জর', 'পলাকতি' (পলাকড়ি ?), 'রামের শবর' (শবদ—শপথ ?) পাঠ ঠিক পড়া হইয়াছে কি না, কে জানে? এক স্থানে আছে, "কৃত্তিবাস পণ্ডিত জন্মিলা শুভক্ষণে। যাহার প্রসাদে লোকে রামায়ণ শুনে॥" এই প্রশংসা কবি কৃত্তিবাস নিজে করিয়াছেন কি? "প্রসাদদাসের বাণী, আনিবারে রঘুমণি, ভরত চলিল চিত্রকূটে" (৪৫।২৫) এই প্রসাদদাস কে? বোধ হয়, এক গায়ন যাহাঁর ধুআ প্রতি ভণিতার আগে দেওয়া হইয়াছে, এবং এই সংস্করণ তাহাঁর।

(৯) কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড), শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত। সন ১৩১০॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ এত আদরের যে, ইহার সংস্করণ সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক বিবেচিত হইবে না। ভূমিকা হইতে জানিতেছি, "তিনখানি পুথী অবলম্বন করিয়া উত্তরাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানিতে কোন সন তারিখ নাই। দেখিলেও প্রাচীন লিপি বলিয়া মনে হয় না।" দ্বিতীয় খানি ১৫০২ শকে (৯৮৭ সালে) লিখিত। তৃতীয়খানি প্রাচীনতম বটে, কিন্তু দ্বিতীয় পুথীর সহিত ইহার মিল নাই।

এ কারণ সেখানা আদর্শ হয় নাই। মুদ্রিত সংস্করণের শেষাংশের নিমিত্ত হইয়াছে, কারণ সে অংশ আদর্শ পুথীতে অস্পষ্ট ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পুথীতে ঐক্য অনেকটা দৃষ্ট হইয়াছিল। "এই উভয় পুথীই আদর্শ-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।" সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইয়াছেন, উত্তরকাণ্ড "সম্পাদনকালে আদর্শ পুথীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন রীতি রক্ষা করা হইয়াছে।" এই উক্তি ঠিক হইয়াছে কি না, মুদ্রিত পুস্তকে কবিকে পাইতেছি কি না, দেখা আবশ্যক। আদ্যোপান্ত এই পুস্তক পড়িয়া মনে হইয়াছে, (১) প্রথম অংশের সহিত শেষাংশের ব্যাকরণে ঐক্য নাই ; (২) উপরের বর্ণিত অযোধ্যাকাণ্ডের সহিত প্রথম অংশের মিল নাই, বরং শেষাংশের আছে। কতদূরে প্রথমাংশের শেষ, তাহা সম্পাদক জানান নাই ; কিন্তু বোধ হইতেছে, শেষাংশেও আদর্শ পুথীর পাঠ স্থানে স্থানে গৃহীত হইয়াছে। এ কারণ ঠিক কোন্ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রথমাংশ, তাহার নির্ণয় কঠিন হইতেছে। মুদ্রিত পুস্তক ২৮০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। বোধ হয় ২২১ পৃষ্ঠা হইতে অন্য পুথীর পাঠ দেখিতে ও তাহা হইতে অংশবিশেষ লইতে হইয়াছিল। সর্বমূলে কৃত্তিবাসের পুথী অবশ্য ছিল। সেই মূলে, গায়কের হউক, লিপিকরের হউক, পরে পরে ভাষা সিঞ্চিত হইয়া পুথীবৃক্ষে বিভিন্ন পত্রপুষ্প ধরিয়াছিল। প্রথমাংশে 'ইঞা', (ইয়া) প্রত্যয় যত, শেষাংশের তত নাই। শেষাংশে 'ইআ', 'ইয়া'। অযোধ্যাকাণ্ডেও এইরূপ। কেবল 'শুন', 'আজ' ইত্যাদি নান্ত ধাতুর উত্তর 'ইঞা' পাওয়া যায়। প্রথমাংশে 'বুলন্তি কহন্তি পুছন্তি বলন্তে' প্রভৃতি অন্তি বা এন্ত (এন) বিভক্তি, শেষের দিকে 'এন্ত' নাই, 'এন' আছে। 'বলিম' (বলিব), 'করিমু', 'দিমু', ক্রিয়াপদ ; 'লেমু' (লেবু) ; 'তমু' (তবু), 'হুনে' (হোম করে), 'বুহিনী' (বহিনী), 'তানার বচন', 'অভ্যাসত' (অভ্যাস-তে), 'পাটোয়ার' প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয়, পুথীখানা পূর্বোত্তর বঙ্গ ঘুরিয়া আসিয়াছে। পুথীর লিপিকরের

নিবাস বর্ধমান জেলার গ্রাম বিশেষে ছিল। কিন্তু সে অঞ্চলে তিনশত বৎসর পূর্বে পুথীর অনেক ক্রিয়া-বিভক্তি ছিল না, বলিতে পারা যায়। অন্ততঃ, 'অস্তি', 'অস্ত', বিভক্তি বহু পূর্ব হইতে অপ্রচলিত হইয়াছিল। মুদ্রিত পুস্তকে কৃত্তিবাস ব্যতীত অন্য দুই কবির ভণিতাও পাইতেছি। তন্মধ্যে একজন প্রসাদ দাস, যাহাকে অযোধ্যাকাণ্ডেও পাইয়াছি; অন্য জন, সুধাকণ্ঠ দাস। দ্বিতীয় কবিকে সম্পাদক মহাশয় ধরিয়াও অন্য অর্থ করিয়াছেন, 'যে দাস সুধাময়।' কিন্তু 'রামের চরণ মাগে সুধাকণ্ঠ দাস' হইতে এক কবি বা গায়ক ব্যতীত আর কেহ মনে হয় না। প্রসাদ দাস স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'বন্দিআ সে কৃত্তিবাসে, রচিল প্রসাদ দাসে, না জানি বাল্মীকি মহাশয়ে॥' (২৪৮ পৃঃ)। মুদ্রিত পুস্তকে ছাপার ভুলও হইয়াছে; যথা, 'রামের আশ্বাসে' (১৮০ পৃঃ। ২।৯)—আওয়াসে; 'মালিন্য' (১৮১ পৃঃ। ১।২)—মানিল্য; 'খাঁড়া কলা' (২২২ পৃঃ। ২।২০)—খাঁড়া ফলা; 'মাথা রাঞা' (২২৯ পৃঃ। ২।১৮) মাথা বাঞা, 'গায়ে মালা' (২৪১ পৃঃ। ২।১৭)—সানা; দুলর্ভ—দুর্লভ, ভোর কুলে—তোর কুলে, ইত্যাদি। সম্পাদক মহাশয় 'অপ্রচলিত শব্দের তালিকায়' কয়েকটি বানান সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু পৃথক্ শুদ্ধিপত্র দিলে ভাল হইত। এই তালিকায় শব্দের পাশে যে অঙ্ক বসান হইয়াছে, তাহার সঙ্কেত বুঝিতে বিলক্ষণ ক্লেশ করিতে হইয়াছে। এ সঙ্কেত অযোধ্যাকাণ্ডের অনুযায়ী নহে, সঙ্কেতের ব্যাখ্যাও নাই। অর্থে ভুল হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। একে শব্দ অপ্রচলিত, দ্বিতীয়ে পুথীর যে অবস্থা, তাহাতে ভুল হইয়া পারে না। সে যাহা হউক, এত যত্ন, এত চেষ্টাতেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া গেল না। যদি কখনও পাওয়া যায়, তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইবে।

অবশ্য যাবতীয় পুথীর সংস্করণে এক বিধি চলিতে পারে না। যাবতীয় পুথী হইতে যাবতীয় জ্ঞাতব্যও পাওয়া যাইবে না। বহু স্থলে উদ্দেশ্য

ক্ষুদ্র করিয়া লইতে হইবে, নতুবা কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যদি কোনও পুথীর সংস্করণ অসাধ্য হয়, পদে পদে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে পুথী অবিকল ছাপাইয়া কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মলাটে লিখিয়া দিতে হইবে, 'অমুকের পুথীর অমুকের লিপির মুদ্রণ।' ইহা দ্বারা কালে কিছু সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে; সত্যকে মিথ্যায় আবৃত করিলে কোনও কালে হইতে পারিবে না। *

কবি শকাঙ্ক

পূর্বকালে বাঙ্গালী কবি গ্রন্থসমাপ্তিকাল লিখিয়া দিতেন। কেহ স্পষ্ট ভাষায় আঙ্কিক শব্দে লিখিতেন, কেহ স্পষ্ট না বলিয়া পাঠকের সহিত কিঞ্চিৎ কৌতুক করিতেন। অঙ্কস্য বামাগতি, সংস্কৃত গ্রন্থের এই বিধি বাঙ্গালী কবি প্রায়ই মানিতেন, কদাচিৎ মানিতেন না। না মানিবার একটা কারণ, ছোট সংখ্যা এবং প্রায় জানা সংখ্যা, আদি হইতে কিম্বা অন্ত হইতে বলিয়া গেলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না। বর্তমান শক দক্ষিণাগতিতে ১,৮,৫,১; বামাগতিতে ১,৫,৮,১। যিনি জানেন ১৫০০ নয়, ১৮০০; তাহার নিকট দুইই সমান স্পষ্ট। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা গ্রন্থসমাপ্তিপ্রকাশের আকৃতি প্রদর্শিত হইতেছে।

---

* উদাহরণ দিয়া বক্তব্য স্পষ্ট করিতে হইয়াছে এবং অনেক গ্রন্থ-সম্পাদকের ও প্রকাশকের নাম করিতে হইয়াছে। বোধহয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি সমালোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন কিম্বা এই সমালোচনা তাঁহার নিজের প্রতি মনে করেন।

(১) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাসে" (২য় খণ্ডে) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন, এটি "বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে।"

অনল রন্ধ্রকর লক্খন পরিণ্হ
সক সমুদ্দকর (পুর ?) অগিনি সসী।

অর্থাৎ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে অনল=৩, রন্ধ্র=৯, কর=২, বামাগতিতে ২৯৩, এবং শকে সমুদ্র=৪, কর=২, অগ্নি=৩, শশী=১, বামাগতিতে ১৩২৪। এখানে দ্বিতীয় পঙক্তির 'কর' পাঠ শুদ্ধ। কারণ 'পুর' আঙ্কিক নয়, যদিও কবিভাষার কখন কখনও তিন বুঝাইত। এখানে তিন হইতে পারে না। লক্ষ্মণ সম্বৎসরে ১০৩০।১০৩১ যোগ করিলে শক হয়। শ্লোকটির পরে মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ আছে। অতএব ২৯৩+ ১০৩১=১৩২৪ শক। লক্ষ্মণ সম্বৎসর কার্তিক শুক্লপ্রতিপৎ হইতে আরম্ভ হয়। এই কারণে উহা দুই শকে পড়ে। এখানে দ্রষ্টব্য=৪। প্রাচীন রীতি এই ছিল।

কবি চণ্ডীদাসের একটা পদে নাকি আছে,

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥

বিধু=১, নেত্র=৩, পঞ্চবাণ=৫×৫=২৫। ১৩২৫ শক। সংস্কৃতে 'পঞ্চবাণ' থাকিলে ৫৫ বুঝিতাম। ২৫ যে ঠিক, তাহা পাঠান্তরের 'বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ' হইতে বুঝিতেছি। 'পক্ষ' স্থানে 'পঞ্চ' কিম্বা 'পঞ্চ' স্থানে 'পক্ষ' হইয়াছে।

'নবহুঁ নবহুঁ রস' দ্বারা গীতের সংখ্যা বলা হইয়াছে। এখানে ৯৯৬; না ৬৯৯ ? বোধ হয়, ৬৯৯, একোনসপ্তশত। কারণ 'কবি' ৯৯৬ গীতের পর আর ৪টি গীত বাঁধিয়া সহস্র পূর্ণ করিতেন।

এই শকাঙ্ক ও গীতাঙ্ক চণ্ডীদাসের বোধ হয় না। কারণ ভাষা পাঁচশত বৎসরের পুরাতন নয়। আরও, নেত্র=৩, এবং অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীনতত্ত্বের বিরোধী।

(২) কৃত্তিবাস

দীনেশচন্দ্র সেন তাহাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ নামে একটি পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে আছে,—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, তিনি আরামবাগের অধীন বদনগঞ্জের ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির নিকট আত্মবিবরণটি পাইয়াছিলেন। এই সংবাদে বদনগঞ্জে ভক্তিনিধির বাড়ীতে পুথীখানা দেখিতে এক বন্ধুকে অনুরোধ করি। তিনি নিজে বদনগঞ্জে যাইতে পারেন নাই। অপর এক ব্যক্তি দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া জানাইয়াছেন (বাং ১৩১৮ সাল), —৺হারাধন দত্তের বাটীর নিকটবর্তী স্থানে একজন খুব বৃদ্ধ কথক ও গায়ক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় তাহাঁর নিকট হইতে হারাধন দত্ত তাহাঁর সমস্ত হস্ত-লিখিত পুথী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হারাধন দত্ত ঐ সকল পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসীকে বিক্রয় করেন। * * * কিন্তু এক প্রস্ত করিয়া নকল তাহাঁর বাটীতে আছে। আপনি যে শ্লোকটি লিখিয়াছেন, উক্ত হস্ত লিখিত নকলেও উহা ঠিক ঐরূপ আছে, কোন ভুল নাই। সন ১৪২৩ শকে সে পুথীটি প্রথমে হাতে লেখা হইয়াছিল।"

অতএব শ্লোকটি অন্ততঃ একখান পুথীতে আছে। সে পুথীও পুরাতন, ১৪২৩ শকে লেখা।

১৩৩৬ সালে আমি পুনর্বার বদনগঞ্জে পুথীর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু হারাধন দত্ত গত, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যাবতীয় পুথীপত্র অদৃশ্য হইয়াছে। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালাও গত, তাঁহার স্বামীও গত। এখন মূল পুথী ও তাহার প্রতিলিপি কোথায় আছে, জানিতে পারি নাই। শুনিয়াছি কলিকাতায় গিয়াছে।

(১) আত্মবিবরণের ভাষা অত্যন্ত পুরাতন। 'তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস', অর্থাৎ আমি কৃত্তিবাস জন্ম লইলাম, এইরূপ প্রয়োগ নূতন নয়। 'খুজে খুজে বুলে', 'আচম্বিতে', 'জগতে বাখানি', 'ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি', 'হৈল তার নাম যে ভৈরব', 'ভুঞ্জে', 'বাপের সোসর', 'নিবড়ে' ইত্যাদি কৃত্তিবাসের। 'শুতিল' (শুইল অর্থে) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে আছে। মহান্ত—মহান্ অর্থ লইয়া ওড়িয়া জাতিবাচক নাম 'মহান্তি' হইয়াছে। ঠাকুরালী শব্দের পরিবর্তে 'ঠাকুরাল' প্রাচীন বাংলাতে আছে। 'নিবড়' ধাতু এখন বাংলায় অপ্রচলিত, কিন্তু ওড়িয়া ও হিন্দীতে আছে, কবিকঙ্কণেও আছে। অদ্যাপি বাংলায় 'নিবড়ে' শব্দ চলিত আছে। উগ্মাকার শব্দটি একটু নূতন; উগ্মা + আকার = ক্রোধমূর্তি। 'আত্তাস', সং আবাস, ওড়িয়াতে রাজবাটী অর্থে আছে। 'নেতের পাছড়া', 'পাটের পাছড়া' পূর্বকালে প্রসিদ্ধ ছিল। 'খরা' রৌদ্র অর্থে কবিকঙ্কণে ও ওড়িয়ায় আছে, পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। 'হাতসানি' এখনও অপ্রচলিত নহে।

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥

এখানে 'সন্তোক' ও 'অনুরোধ'-এ মিল ধরা হইয়াছে। হিন্দী সন্তোখ, অপভ্রংশে সন্তোক, সং সন্তোষ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু 'রাজা দিলেন সন্তোক'—যেন সন্তোষ-সূচক পুরস্কার বুঝাইতেছে। এই অর্থে হিন্দীতে সন্তোখ, সন্তোক নাই। ওড়িয়াতে 'সন্তক' শব্দ বহু

প্রচলিত আছে। ইহার বুৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারি নাই। অর্থে, জাতি কিম্বা ব্যবসায় চিহ্ন। যেমন, ব্রাহ্মণের কুশাঙ্গুরীয় (ও' কুশবটু), ক্ষত্রিয়ের কাটারী কিম্বা ধনুক, লেখক জাতির লেখনী, বৈষ্ণবের মাল্য, কৃষকের লাঙ্গল ইত্যাদি। যে লিখিতে জানে না, সে দলিল পত্রে নিজের সন্তক লিখিয়া দেয়। বঙ্গদেশে যেমন ঢেরা-চিহ্ন, ওড়িষ্যায় তেমন সন্তক। কিন্তু ঢেরা-চিহ্ন সকল জাতির চিহ্ন, সন্তক জাতি ও বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক"—মুদ্রাঙ্কিত নিদর্শন পত্র? অতএব আত্মবিবরণের ভাষা পুরাতন এবং যে-সে হঠাৎ জানিতে পারিত না।

(২) বর্ণনার ধারাও পুরাতন।

(৩) বর্ণিত বিষয়-পরম্পরা কবি ভিন্ন অন্যের কল্পনায় আসিত না।

(৪) কৃত্তিবাস কৃতবিদ্য হইয়া এক হিন্দু গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

এই সকল কারণ একত্র স্মরণ করিলে পয়ারটি সত্য বলিতে সন্দেহ থাকে না। দুই-এক স্থানে ছন্দের দোষ আছে, অন্ত্যবর্ণে অমিলও আছে। কিন্তু সেটা কিছু নয়। আমরা কবির স্বহস্ত লিখিত পুথী পাই নাই। কত অনুলিপির অনুলিপি পাইয়াছি, নিরক্ষরের অনুলিপি পাইয়াছি! তাহাতে মূলের হানি হয় না।

এখন "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য) মাঘ মাস" বিচার করি। "পূর্ণ মাঘ মাস" স্থলে "পুণ্য মাঘ মাস", এই পাঠও আছে। এই পাঠই ঠিক। কারণ কৃত্তিবাসের কালে এবং বহুকাল পরেও সৌর মাস-গণনা প্রচলিত ছিল না। যদিও শ্রীপঞ্চমী বলিলে মাঘ শুক্লা পঞ্চমী বুঝায়, তথাপি মাঘ মাস পুণ্য মাস, কবি ইহা স্মরণ করাইয়াছেন। বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ, পুণ্যমাস। আদিত্য (রবি) বারে মাঘী শুক্লপঞ্চমী অনেক বৎসর হইতে পারে। কিন্তু এমন এক বৎসর চাই, যে বৎসরে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে তিনি ২০।২২ বৎসর বয়সে এক হিন্দু গৌড়েশ্বরের

সাক্ষাৎ পাইতেন। গণিয়া দেখিতেছি, ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ রবিবার শুক্লা চতুর্থী ৫ দং, পরে পঞ্চমী। শ্রীপঞ্চমী চতুর্থীযুক্তা গ্রাহ্য। ইতিহাসে পাই, দনুজমর্দন=রাজা গণেশ ১৩৩৯-৪০ শকে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর তাঁহার পূর্ণ প্রতাপের কাল। ইহাঁরই সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন ধরিতে হইবে। তৎকালে কৃত্তিবাসের বয়স ২০।২১ বৎসর ছিল। অতএব কৃত্তিবাস ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ (ইং ১৩৯৯।১২ জানুআরি) রবিবার শ্রীপঞ্চমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) কাশীরাম দাস

কাশীদাসের মহাভারতের বিরাট পর্বে আছে,—

চন্দ্রবাণ পক্ষঋতু শক সুনিশ্চয়।

এখানে দক্ষিণাগতিতে ১৫২৬ শক পাইতেছি।

অন্য এক পুথীতে আদিপর্বের সমাপ্তিকাল আছে,—

সকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে।
রুক্মিনি নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥

বিরাট পর্বে ১৫২৬ শক না পাইলে আদিপর্বের এই রহস্য বুঝিতে পারা যাইত না। পঞ্চাননের পাঁচ মুখেই বিধু। অতএব বিধুমুখ=৫। ইহার তিনগুণ=১৫। রুক্মিণীনন্দন, কাম; কামের পঞ্চশর। 'অঙ্কে' শব্দ দ্ব্যর্থ; ১৫, এই অঙ্কের ৫ অঙ্ক; এবং অঙ্কে কোলে, দুই বাহুতে। অর্থাৎ ৫এর পর দুই। জলনিধি, সাগর=৪। সমুদয় অঙ্ক ১৫২৪ শক। (কোলে=২, পরে "শিবায়নে" পাওয়া যাইবে।)

(৪) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" আছে,—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
এই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

এখানে, বেদ=৪, ঋষি=৭, রস=৬, ব্রহ্ম=১; বামাগতিতে ১৬৭৪ শক পাই। ইং ১৭৫২। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। তাঁহার কালের সহিত এই কালের ঐক্য হয়।

(৫) রামেশ্বরের শিবায়ন

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহার "শিবায়ন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" এই তিন পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এই শ্লোক হইতে স্পষ্টরূপে কোন শক বাহির করিতে পারিলাম না। মুদ্রিত পুস্তকে ঐ শকের স্থলে অঙ্কদ্বারা ১৬৩৪ শক নিবেশিত আছে। উহা অতি-কষ্টকল্পনায় সঙ্গত করা যাইতে পারে।" বুঝিয়া দেখি। চন্দ্রকলা=১৬, রাম=৩, করতল (কর)=২। অতএব দক্ষিণাগতিতে শকটি ১৬৩২। কিন্তু 'বাম হল্য বিধিকান্ত···' অর্থ কি? কবি বলিতেছেন, অঙ্কের বামাগতি,—এই বিধি। কিন্তু এখানে সে বিধি রূপ কান্ত বাম কি-না বক্র হইয়া অনলে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ, দক্ষিণাগতি ধরিবে।*

---

* "বঙ্গবাসীর" সংশোধিত ও দ্বিতীয়বার প্রকাশিত "শিবায়নে" (১৩১০) সালে, উক্ত শ্লোকটি

শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥

প্রকাশিত পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" উপরি উক্ত শ্লোকটি ও ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সন্দেহ ও বিচার উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই পাঠটি অগ্রাহ্য করিবার হেতু নাই। চন্দ্রকলাকে রাম কোলে করিল। এই অর্থ। কোলে করিতে দুই বাহু লাগে। অতএব কোলে=২ ধরিতে হইতেছে।

(৬) মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল

পণ্ডিত জনে লিপিকর হইতেন না। লিপিকর্ম খুঁট-আঁখরোর ছিল। ইহারা পুথীর ভাষা কতক বুঝিত, কতক বুঝিত না, বুঝিয়া লিখিবার সময়ও পাইত না। ফলে "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" করিত। কিন্তু দৃষ্টিও যে জ্ঞানসাপেক্ষ, অজ্ঞানের দৃষ্টি মিথ্যা হইতে পারে। শকাঙ্ক সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত হইত, এখানে লিপিকর দিশাহারা হইয়া অক্ষর-দৃষ্টে যা-তা লিখিয়া বসিত। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলের পুথীতে ইহার চমৎকার উদাহরণ আছে। শকাঙ্কের পাঠ শুদ্ধ করিয়া লিখিলে,

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধসহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্ব্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত॥

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন ১৩১৩ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" এই ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি

ঋতু (৬) বেদ (৪) সমুদ্র (৭) = ৬৪৭
সিদ্ধি (৮) যুগ (২) পক্ষ (২) = ৮২২
―――
১৪৬৯

ধরিয়া ১৪৬৯ শক মনে করিয়াছিলেন। গ্রন্থের ভাষা আধুনিক দেখিয়া এই শকে আমার সন্দেহ জন্মে। আমি কবির বংশলতা সংগ্রহ করিয়া ১৩১৫ সালের "পরিষৎ পত্রিকা"য় ১৭০৩ শক দেখাইয়াছিলাম (উক্ত সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩, ১৩৩৪ সালের "প্রবাসী"ও দ্রষ্টব্য)। ১৩৩৫ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"য় শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত এই কাল নির্ণয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, যখন

যোগশাস্ত্রে সিদ্ধি আট প্রকার, তখন এই শ্লোকের সিদ্ধ=৮। যুগ=৪। অতএব

৬৪১
৮৪২
―――
১৪৮৯

অথবা, পুথীর 'সির্দ্ধসহজ্জোগ' পদের 'জোগ' পাঠ ঠিক। "যোগের আট অঙ্গ, সুতরাং যোগ=৮।" অতএব

৬৪৭
৮৮২
―――
১৫২৯ শক

এখানে দুইটি বিষয় বিবেচ্য আছে। মুদ্রিত পুস্তকে 'সিদ্ধ' এবং কবির বাড়ীর পুথীতে 'সির্দ্ধ' আছে। 'সিদ্ধি' পাঠ পাইতেছি না। 'সির্দ্ধ' বানান থাকাতেই বুঝিতেছি, শুদ্ধ পাঠ 'সিদ্ধ' এবং ইহা কদাপি 'সিদ্ধি' হইতে পারে না। 'শুদ্ধ' শব্দ গ্রাম্যলেখক 'শুর্দ্ধ' ভাবিতে পারে, কিন্তু 'শুদ্ধি', 'সিদ্ধি' প্রভৃতি শব্দ কদাপি 'শুর্দ্ধি', 'সিদ্ধি' হয় না, হইতে পারে না। তা ছাড়া, স্পষ্ট 'সিদ্ধ' শব্দ 'সিদ্ধি' মনে করিলে কবির প্রতি অত্যাচার হয়। সিদ্ধ=জিন=২৪, চিরপ্রসিদ্ধ। জৈন তীর্থঙ্কর ২৪ জন ছিলেন, তাহা হইতে সিদ্ধ=২৪ ধরা হইয়া থাকে। ২৪ ধরিলে শকটি মনের মত পাই না, অতএব সিদ্ধ শব্দের পারিভাষিক অর্থ পরিবর্তন কর,—ইহা অপব্যাখ্যা। বিবেচ্য দ্বিতীয় বিষয়টি আরও গুরুতর। সিদ্ধি=৮, স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইতে সিদ্ধ=৮ অভ্যুপগম স্বীকার করিলে আঙ্কিক শব্দের পারিভাষিকত্ব লুপ্ত হয়। যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া যোগ=৮, ধরিলে আঙ্কিক শব্দের মূলোচ্ছেদ হয়। দেহ নবদ্বার; তা বলিয়া দেহ=৯ কদাপি হইতে পারে না।

আমি উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যায়

ঋতু (৬), বেদ (৪), সমুদ্র (০) = ৬৪৭

সিদ্ধ (২৪), যুগ (৪), পক্ষ (২) = ২৪২৪

৩০৭১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে বামাগতি। অতএব ১৭০৩ শক। কবি প্রথম অঙ্কে দক্ষিণাগতি ধরিতে বলিয়া দিয়াছেন, অন্য দুই অঙ্কে বলা আবশ্যক মনে করেন নাই, কারণ বামাগতিই বিধি। কবির ভাষা, বিশেষতঃ তাঁহার বংশলতা দৃষ্টে এই শক সঙ্গত মনে হইবে। তথাপি দেখিতেছি, সুধীজনের সন্দেহ যাইতেছে না। শ্রীযুত দত্ত মাণিকরামকে টানিয়া না আনিলে আমি আবার কালক্ষেপ করিতাম না, বলিতাম,

প্রত্যক্ষানুভবং ন লুম্পতি বচো যুক্তিযতঃ।

সে হেতু ১৭০৩ শক ঠিক।

এই মন্তব্য লিখিতেছি, এমন সময় আমার কৌতূহল হইল। কবির দক্ষিণাগতি বামাগতিতে কট্-মট্যে দৃষ্টি নাই, কৌতুক-লহরী আছে। তিনি প্রথম সংখ্যাটিও অক্লেশে বামাগতিতে বলিতে পারিতেন, কিন্তু বলেন নাই। শকাঙ্ক একটি পঙ্‌ক্তিতে বলিতে পারিতেন, যেমন,

রামশূন্য সিন্ধু ইন্দু বামে সুশোভিত।
এই শাকে সাঙ্গ হল্য শ্রীধর্ম্মের গীত ॥

তিনি বার, তিথি (বুঝি না বুঝি), এমন কি, কত রাত্রে গ্রন্থসমাপ্তি, তাহাও ব্যক্ত করিলেন; করিলেন না মাস ও মাসের দিন! 'সিদ্ধ যুগ পক্ষ', বামাগতিতে ২, ৪, ২৪। যোগফল ৩০৭১ পাইবার নিমিত্ত ২, ৪, ২৪, এমন তিন অঙ্ক গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল? আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল বিতর্ক আমার মনে কখনও উঠে নাই! ২ দ্বারা কি জ্যৈষ্ঠ মাস, ৪ দ্বারা কি দিন-সংখ্যা, ২৪ দ্বারা কি নক্ষত্র ব্যক্ত হইয়াছে? ১৭০৩ শকের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ দিবসের পাঁজি গণিয়া দেখি, ঠিক

তাই। সেদিন মঙ্গলবার (মহীপুত্র), কৃষ্ণাষ্টমী ৫১ দণ্ড, ২৩ নক্ষত্র ২৮ দং গতে ২৪ নক্ষত্র।

এখন বুঝিতেছি, কবি কেন এক পঙ্‌ক্তির স্থলে তিন পঙ্‌ক্তি লিখিয়াছেন, কেনই বা 'সিদ্ধ' পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অঙ্ক ভাঙ্গিয়া ২, ৪, লিখিবার জো ছিল না। লিখিলে ২৪, এই একটি সংখ্যা বুঝাইত না। আরও দেখা যাইতেছে, কবি কেন ঘোর-ফেরে গিয়াছেন। ১৭০৩ শক চাই; কিন্তু ২,৪, ২৪ বলিয়া ১৭০৩ পাইবার জো নাই। শকাঙ্কে বামাগতি ধরিতে হইয়াছে। টোলে-পড়া কবি অঙ্কের বামাগতি জানিতেন। ২,৪, ২৪ অঙ্কও বামাগতিতে বলিয়া বিধি রক্ষা করিয়াছেন। ৬৪৭, এই তিন অঙ্কও বামাগতিতে ৭৪৬ না বলিয়া পাঠকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু 'অব্যাহিত তিথি' কি? টোলে-পড়া এক পণ্ডিত বলিলেন মাসের দুই প্রতিপৎ ও দুই অষ্টমী টোলে পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ, পড়ুয়ারা পাঠ হইতে 'অব্যাহতি' পান, টোলের ছুটি। পর পঙ্‌ক্তির 'গীত' শব্দের সহিত মিলাইতে 'অব্যাহতি' স্থানে 'অব্যাহিত' হইয়াছে। অথবা পদটি 'অব্যাহৃতি'। ব্যাহৃতি, ব্যাহার শব্দের অর্থ বাক্য। 'অ-ব্যাহৃতি তিথি', যে তিথিতে কেবল অধ্যাপন নয়, অধ্যয়নও চলে না। চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমায় অধ্যাপন নিষিদ্ধ, কিন্তু অধ্যয়ন চলে। মাণিকরাম এক টোলে পড়িয়াছিলেন, থুঙ্গিপুথী লইয়া আর এক টোলে পড়িতে যাইতেছিলেন, পথে 'ধর্মের বিষম মায়ায়' পাঠ আর হয় নাই, তিনি ধর্মের গীত বাঁধিতে বসিয়া যান। যখন সঙ্গীত সাঙ্গ হইল, তখন শর্বরী ২ দণ্ড; সূর্যোদয় হইতে শর (৫) অগ্নি (৩) = (বামাগতিতে) ৩৫ দণ্ড।

মাণিকরামের গীত এখনও সাঙ্গ হয় নাই। কারণ তিনি গীতারম্ভে চৌদিকের দেব-দেবীর চরণ বন্দনা করিতে করিতে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন-জীউরও করিয়াছেন। কথা উঠিয়াছে, ১৭০৩ শকে অর্থাৎ ইং ১৭৮১

সালে, মাণিকরামের গীত সমাপ্তিকালে, মদনমোহন-জীউ বিষ্ণুপুরে ছিলেন না, কলিকাতায় গোকুল মিত্রের আলয়ে বাঁধা পড়িয়া বিক্রীত হইয়া গিয়াছিলেন। অতএব গ্রন্থসমাপ্তিকাল ইং ১৭৮১ সাল হইতে পারে না। অর্থাৎ পরোক্ষ বলবান, প্রত্যক্ষ বলবান্ নয়! সৌভাগ্যক্রমে কবি এই তর্কের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই একটি ঠাকুরের নাম করেন নাই, চৌদিকে যত ঠাকুরের নাম শুনিয়াছিলেন, সকলেরই করিয়াছেন। শোনা কথা, ভুল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় লিখিয়াছেন,

যার যার যথার্থ না জানি নামধাম।
তাঁর তাঁর পদে মোর কোটি কোটি প্রণাম॥

তিনি বিষ্ণুপুরে আসিয়া মদনমোহন ঠাকুর দেখিয়া গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন কই ?*

* কোন্ সালে মদনমোহন-জীউ বিষ্ণুপুর ত্যাগ করেন, তাহা জানিতে পারিলাম না। ইং ১৭৬০ সালে বিষ্ণুপুর ইংরেজ কোম্পানীর হাতে আসে। ইহার পূর্বে বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র দামোদর সিংহের মধ্যে রাজ্য-সিংহাসন লইয়া তুমুল বিবাদ চলিতেছিল। দামোদর সিংহ প্রথমে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ও পরে মীরজাফরের সাহায্যে চৈতন্য সিংহকে বিষ্ণুপুর হইতে বহিষ্কৃত করেন। তখন চৈতন্য সিংহ মদনমোহন ঠাকুরটি লইয়া প্রথমে মুর্শিদাবাদে পরে তথা হইতে কলিকাতায় ইংরেজ আদালতে নালিশ করিতে আসেন, এবং কপর্দকশূন্য হইলে বাগবাজারে গোকুল মিত্রের নিকট মাত্র ১৩৩১ টাকায় বিগ্রহটি বন্ধক রাখেন, পরে ছাড়াইতে পারেন নাই। ইং ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও মেদিনীপুরের দেওয়ানি প্রাপ্ত হন। অতএব বোধ হয়, ১৭৬০ সালের দুই এক বৎসর পরে বিষ্ণুপুর মদনমোহন-শূন্য হইয়াছিল। ইংরেজ আদালতে চৈতন্য সিংহের জয় হয়। তিনি বিষ্ণুপুরে ফিরিয়া আসিয়া এক নূতন কিন্তু পূর্বটির তুল্য সুন্দর বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া শ্যামসুন্দর নামে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এই, মদনমোহন-জীউ যাঁহার আলয়ে থাকিবেন, তাঁহার অমঙ্গল কখনও হইবে না। শ্যামসুন্দর-জীউ সে প্রবাদ সত্য রাখিলেন না, "সূর্যাস্ত" আইনের নির্মম ফুৎকারে বৃহৎ ও প্রাচীন

(৭) অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ

মাণিকরাম গ্রন্থসমাপ্তিকালের শক মাস দিন তিথি নক্ষত্র দিয়াছেন। এইরূপ, অদ্ভুতাচার্যও দিয়াছেন। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে (তৃতীয় সংস্করণে) অদ্ভুতাচার্যকৃত রামায়ণের এই কাল উদ্ধৃত হইয়াছে (৫০৮ পৃষ্ঠা),

সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বি×তে।
সপ্তমি রেবতিযুত বার ভৃগুসুতে॥
কর্কটাতে স্থিতি রবি পঞ্চদশমীতে।
কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে॥

এখানে স্পষ্ট লিখিত আছে ১৭৬৪ শকের কর্কট মাসের (শ্রাবণ মাসের) ১৫ই শুক্রবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি রেবতী নক্ষত্রে প্রথম প্রহরে রামায়ণ সমাপ্ত হয়। উক্ত শকের উক্ত দিবসের পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, কালটির সব ঠিক।*

(৮) জগৎরাম রায়ের অষ্টকাণ্ড রামায়ণ

গ্রন্থসমাপ্তিকালে শক ব্যতীত মাস দিন বার তিথি নক্ষত্র দিবার আর একটা উদাহরণ দিই। বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে

মল্লরাজ্য বারম্বার টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া নিলামে বিক্রি হইয়া গেল। বিষ্ণুপুরের এক প্রাচীন মদনমোহন "রণিআড়া" গ্রামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ গৃহে এখনও ভূতকালের সাক্ষী হইয়া আছেন। ইঁহাকে ধরিলে বিষ্ণুপুর রাজ্যে এখনও মদনমোহন আছেন।

* এই রামায়ণ এখনও শতবর্ষ দেখে নাই। কিন্তু শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল। + + আমার বিবেচনায় ১৭৬৪ শক গ্রন্থ-রচনার কাল নহে, উহা গ্রন্থ নকল করিবার কাল।" কিন্তু যাহারা পুথী নকল করিত, তাহারা পুথীর মধ্যে পাণ্ডিত্য ফলাইত না। শককে সম্বৎ মনে করাতে এই ধাঁধার উৎপত্তি।

জগৎরাম রায় নামে এক কবি ছিলেন। তিনি ১৬৯২ শকে "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" এবং ১৭১২ শকে "অষ্টকাণ্ড রামায়ণ" লিখিয়াছিলেন। পুস্তক দুইখানি মুদ্রিত হইয়াছে। রামায়ণখানি বাঁকুড়া জেলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুল্য সমাদৃত হইয়াছে। লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ডের মাঝে এক "পুষ্করকাণ্ড" আছে। সীতা কালীরূপে সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ করিয়াছিলেন। রামায়ণের ভণিতায় নাম "অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ।" কিন্তু "জগদ্রামী রামায়ণ" নামে জনসাধারণের নিকট খ্যাত। আমি "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" দেখিতে পাইলাম না।

ইং ১৮৯৬ সালের "দাসী" পত্রিকায় (৫ম ভাগে) শ্রীযুত সত্যকুমার রায় পুথীতে লিখিত গ্রন্থসমাপ্তিকাল যে সম্বতে নয়, শকে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র শেষে আছে,

> ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শাকপরিমাণে।
> মাধব মাসেকে শুক্লপক্ষ শুভদিনে ॥
> ষোড়শ দিবস প্রতিপদ্ গুরুবারে।
> কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্য সুন্দরে ॥

ভুজ = ২, রন্ধ্র = ৯, রস = ৬, চন্দ্র = ১ ; ১৬৯২ শক স্পষ্ট। ঐ শকের ১৬ই বৈশাখ (মাধব মাস), বৃহস্পতিবার, শুক্ল প্রতিপৎ তিথি, কৃত্তিকা নক্ষত্র, সৌভাগ্য যোগ হইয়াছিল। 'সম্বৎ' ধরিলে এই সকল লক্ষণ মিলিত না। 'সম্বৎ', প্রকৃত নাম 'বিক্রমসম্বৎ'। বঙ্গদেশে এই সম্বৎ কোনও কালে চলিয়াছিল কিনা, সন্দেহ।

"রামায়ণে"র শেষে আছে,

> সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশযুক্ত তাথে।
> ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে ॥
> উনত্রিশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।
> জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি ॥

এখানে 'শতাব্দ' অর্থে শকাব্দ। কারণ ১৭১২ শকের ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ও শুক্লপঞ্চমী তিথি ছিল। *

(৯) রাধামাধব ঘোষের বৃহৎ সারাবলি

এই কবি ভাগ্যদোষে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। গ্রন্থের পরিমাণ ও নানা পুরাণের সারসংগ্রহ দেখিলে ইহাঁকে বাঙ্গালার বড় কবি বলিতে হয়। "বৃহৎ সারাবলি"র অপর নাম "পুরাণ সারসংগ্রহ।" নানা পুরাণ হইতে সারসংগ্রহ-ই বটে। ইহা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত, যথা—কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, জগন্নাথলীলা, + +লীলা, গৌরাঙ্গলীলা। + +লীলাটির আধার, মহাভারত, কিন্তু নাম জানা নাই। + +লীলা ব্যতীত আর চারি লীলা বাঁকুড়ার মুখার্জি কোম্পানী ছাপাইয়াছেন। এই চারি লীলায় ১৬০০০ শ্লোক আছে। অমুদ্রিত লীলা যোগ করিলে "সারাবলি"র পরিমাণ ১৮০০০ শ্লোক হইবে। শেষ ও পঞ্চম খণ্ড, গৌরাঙ্গ লীলা। ইহার শেষে কবির পরিচয় ও "সারাবলি"র সমাপ্তিকাল আছে। ইহাঁর নিবাস হুগলী জেলায় তারকেশ্বরের নিকট দশঘরা গণ্ডগ্রামে ছিল।

* শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন তাহাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন, "১৭১২ সম্বতে (১৬৫৫ খ্রীঃ অব্দ) এই পুস্তক (রামায়ণ) শেষ হয়। রামায়ণের পর এই কবি "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামক একখানা কাব্য রচনা করেন। + + ১৬০২ শকে (১৬৮০ খ্রীঃ অব্দ) ইহা সম্পূর্ণ হয়।" কিন্তু একই কবি একবার সম্বতে, একবার শকে কাল নির্দেশ করেন না। 'ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শাক পরিমাণে,' এখানে সেন মহাশয় ভুজ=২, রন্ধ্র=০, রস=৬, চন্দ্র=১ ধরিয়া ১৬০২ শকে গিয়াছেন। কিন্তু ১৬০২ শকের ১৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার ও কৃষ্ণদশমী ছিল না। রন্ধ্র=৯, প্রসিদ্ধ।

"কায়স্থ সাফল্যিরাম, অশেষ গুণের ধাম, রামপ্রসাদ তাহার তনয়।
মধ্যাংশ কুলের পতি, ঘোষজ পদবী খ্যাতি, তৎপুত্র রাধামাধব কয়॥"

কবির পিতা দশঘরা গ্রামে 'রাজমন্ত্রী' ছিলেন। তিনি স্বর্গগত হইলে কবি দশঘরা ত্যাগ করিয়া 'কর্মক্রমে নানাদেশ' ভ্রমিতে ভ্রমিতে দশঘরার বহু পশ্চিমে জাহানাবাদ পরগণায় 'ভগবানপুর গ্রামের সামিল পশ্চিম পাড়া'য় আসিয়া পড়েন। সেখানে গঙ্গানারায়ণ দে কবিকে কন্যাদান করিয়া 'গঠিয়া দিলেন গৃহালয়।"

এই প্রবন্ধে গ্রন্থ-পরিচয়ের স্থান নাই, কাল-পরিচয়ের আছে। কিন্তু কবি পাঠকের বিদ্যাপরীক্ষার নিমিত্ত নানা প্রবন্ধে কাল ব্যক্ত করিয়াছেন। এক এক কবি পাঠকের সহিত কেমন কৌতুক করিতেন, তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে।

(ক) পুস্তক সমাপ্ত হৈল শুন বন্ধুগণ।
অতঃপর শুন সবে শক নিরূপণ॥
শাকে সিমে জড় করি যত শক হয়।
চারি বেদ ব্রহ্ম বস্তু তাহে যুক্ত রয়॥
রসভাসে রসগুণে তায় যোগ দেও।
এই শকে পুঁথী হলো লেখা করি লও॥

পাঠক লেখা করিতে পারিবেন কি না, কবির সন্দেহ ছিল।

এ রস পূরিবে বুধ যেই বিচক্ষণ।
বিষকুম্ভ ন্যায় হবে মূর্খের সদন॥
মধ্যবিত্ত দেখিবেক কণ্টকের বন।
নিষ্ঠাযুক্ত হইলে কিছু পাবে নিরূপণ॥

কবি 'নিষ্ঠাযুক্তে'র প্রতি দয়ালু হইয়া লিখিয়াছেন,

শকের নির্ণয় লিখিলাম সংস্কারে।
সন তারিখ লিখি কি ভাবত অনুসারে॥
ইতিমধ্যে যেইজন হবে বুদ্ধিমান।
সন দৃষ্টে করিবেক শকের সন্ধান॥

(খ) ম্লেচ্ছ শাস্ত্র অনুসারে সন সংখ্যা হয়।
অষ্টাদশ পৃষ্ঠে বেদ বসু বিরাজয়॥

পাঠক ইহাকেও 'কণ্টকের বন' মনে করিলে

(গ) শালবন কৈল যেই সালের স্থাপন।
তাহার মতানুসারে করিয়ে লিখন॥
ঈশানাক্ষ বেদগুণে যত সংখ্যা পায়।
বাণের উপরে বান নদী বয়ে যায়॥

(ঘ) এই তত্ব কহিলাম সাল নিরূপণ।
অতঃপর কহি শুন তারিখ বর্ণন॥
র'শ্মশ্রীর নামে বুঝা মাসের নির্ণয়।
সিংহপৃষ্ঠে যুবতী পঞ্চম দিনে হয়॥
বারেস্বারে তিথি পুরে নক্ষত্র দীপ্তমান।
দ্বাপরে যে ক্ষেত্রে জন্ম হৈল ভগবান॥

\+ \+ \+

সুবুদ্ধি বুদ্ধির দ্বারে করহ বিচারি।
মূর্খের শকতি নহে বুঝিবারে ভারি॥

দ্বিজ রূপরামও তাহাঁর ধর্ম্মমঙ্গলে 'শাকে সীমে জড়' করিয়াছিলেন। তাহাতে দন্তস্ফুট হয় নাই। সে কথা পরে বলিতেছি। রাধামাধব শকে, ম্লেচ্ছসনে ও বাঙ্গালা সনে কাল লিখিয়া 'মূর্খ' ও 'মধ্যবিত্ত' পাঠকের নিকট ধরা দিয়াছেন।

প্রথমে (খ) দেখি। এটি ইংরেজী সাল। 'অষ্টাদশ পৃষ্ঠে' = ১৮ পৃষ্ঠে কি-না পরে, (যেমন ১ এর পিঠে ২ = ১২), বেদ = ৪, বসু = ৮, অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। *

দ্বিতীয়ে (গ) দেখি। এটি বাঙ্গালা সাল। 'ঈশানাক্ষ বেদগুণে',— ঈশান = রুদ্র = ১১, অক্ষ = ইন্দ্রিয় = ৫ ; বেদ = ৪, গুণ = ৩। ঈশানাক্ষ = ১১ × ৫ = ৫৫ ; বেদগুণ = ১২। অঙ্কের বামাগতিতে ১২৫৫ সাল।

* শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" পুস্তকে কবিকে "১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে" লিখিয়া একশত বৎসর পিছাইয়া দিয়াছেন।

সালে ৫৯৩ যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৫ + ৫৯৩ = ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব খ্রীষ্টাব্দ ও সাল দুইই মিলিতেছে।

এখন প্রথমে (ক) আসি। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪৮ – ৭৮ = ১৭৭০ শক পাইতে হইবে। এটি না পাইলে 'শাকে সীমে জড়' হইয়া পড়িয়া থাকিত। নানা শাক ও সীম অন্বেষণ করিয়া শেষে পাইলাম যে যে তিথিতে শাকভক্ষণ ও শীম্বীভক্ষণ নিষিদ্ধ। দশমী তিথিতে কলমী শাক, একাদশীতে শীম, দ্বাদশীতে পুঁই শাক খাইতে নাই। এখন কলমী ধরি, না পুঁই ধরি? কবি প্রথমে শাক দিয়া পরে সীম দিয়াছেন, অতএব দশমী ও একাদশী ধরিতে হইতেছে। 'শীমে শাকে' থাকিলে একাদশী ও দ্বাদশী ধরিতে হইত। এখন

শাকে সিমে = ১০ × ১১ = ১১০
চারিবেদ (১৬) ব্রহ্ম (১) বস্তু (বিষয় = ৫) = ১৬১৫
রস (৯) ভাসে (দৃষ্টি = ২) = ৯ × ২ = ১৮
রস (৯) গুণে (৩) = ৯ × ৩ = ২৭

১৭৭০ শক
১৭৭০ + ৭৮ = ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

কোথায় অঙ্কগুলি পর পর বসাইতে, কোথায় গুণ করিতে হইবে, তাহা শব্দের বিভক্তি দেখিয়া বুঝিতে হয়। আমরা বলি তিন-পাঁচে পনর, পাঁ-চে না বলিয়া তিন পাঁচ বলিলে ৩৫ বুঝায়।

বাঙ্গালা সালের পর, 'বাণের উপরে বান নদী বয়ে যায়,' ইহার সার্থকতা দেখিতেছি না। বোধ হয় ৫ + ৫ + ৭ = ১৭ বৎসরে কবি "বৃহৎ সারাবলি" সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিম্বা গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে ৫ + ৫ = দশ বৎসর নদীর মত বহিয়া গিয়াছে। এত সারসংগ্রহ করিতে দশ বৎসর লাগা আশ্চর্য নয়।

এখন (ঘ) দেখি। এখানে মাস দিন বার তিথি নক্ষত্র আছে। 'রাশ্যশ্রীয়' ভুল ; হইবে 'রাশ্যাশ্রীয়'। অর্থাৎ রাশি নাম দ্বারা মাস নাম বুঝিতে হইবে। 'সিংহপৃষ্ঠে যুবতী'—সিংহ মাস ভাদ্র মাসের পৃষ্ঠে কি-না পরে যুবতী কন্যা মাস, আশ্বিন মাস। পঞ্চম দিন। 'বারেঙ্গারে' ভুল ; হইবে 'বারাঙ্গারে' অঙ্গারক মঙ্গলবারে। 'নক্ষত্র দীপ্তমান, দ্বাপরে যে ক্ষেত্রে জন্ম হৈল ভগবান'। ১৭০৭ শকের ৫ই আশ্বিনের পাঁজি গণিয়া পাইতেছি, সেদিন মঙ্গলবার কৃষ্ণাসপ্তমী রোহিণী নক্ষত্র। রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হইয়াছিল। অতএব সেদিন রোহিণী নক্ষত্র মিলিয়া গেল। কিন্তু 'তিথি পুরে' ? উক্ত মঙ্গলবারে সপ্তমী শেষ হইয়াছিল, কিন্তু নক্ষত্র রোহিণী শেষ হয় নাই, 'দীপ্তমান' ছিল।

(১০) দ্বিজরূপরামের ধর্মমঙ্গল

১৩৩৪ সালের ভাদ্রের "প্রবাসী"তে 'ধর্মের গান কতকালের' প্রসঙ্গে রূপরামের ধর্মমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছি। এই পুথী ছাপা হয় নাই, মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রামের শ্রীযুত মৃগাঙ্কনাথ রায়ের নিকট সম্পূর্ণ পুথী আছে। তাহাঁরই অনুরোধে কবির কাল নির্ণয়ে বসি, কিন্তু কবির হেঁয়ালী লেখা করিতে পারি নাই। এখন কবি রাধামাধবের অনুগ্রহে 'শাকে সীমে জড়' করিবার সঙ্কেত পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে রূপরামই রাধামাধবের গুরু মনে হয়। তথাপি 'সুবুদ্ধি' চাই। কবি লিখিয়াছেন,

সাকে সিমে জড় হৈলে জত শক হয়।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয়॥
রসের উপর রস তাহে রস দেহ।
এই সকে গিত হৈল লেখা কর‍্যা লেহ॥

এখন লেখা করি।

'শাকে শীমে' = ১০ × ১১ = ১১০

চারি বাণ (২০) তিন যুগ (১২)

বেদ (৪) = ২০ + ১২ + ৪ = ৩৬

১৪৬

'রসের উপরে রস,' ১৪৬ অঙ্কের ৬ অঙ্কে রস। এই ৬ অঙ্কে ৬ যোগ করিতে হইবে,

৬

১৪৬

১৫২

'তাহে রস দেহ' ১৫২৬ শক

এই ব্যাখ্যা যে ঠিক তাহার প্রমাণ 'রসের উপর রস'। ঘনরামের ধর্ম-মঙ্গল 'রামগুণ রস সুধাকর' = ১৬৩৩ শকে রচিত। অতএব রূপরাম, ঘনরামের একশত বৎসর পূর্বের কবি।

মাণিকরাম লিখিয়াছেন 'বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম'। অতএব রূপরামের পরে মাণিকরাম আসিয়াছিলেন। এই এক রূপরাম ছাড়া ধর্মমঙ্গল-গায়ক অন্য রূপরাম জানা নাই। দ্বিতীয়তঃ, মাণিকরামের অনেক পদ অবিকল এই রূপরামের পুথীতে আছে। মাণিকরাম, এই রূপরামের পরবর্তী। রূপরাম ১৫২৬ শকে; মাণিকরাম এই শকের পূর্ববর্তী ছিলেন না, তাহা নির্বিবাদে সিদ্ধ হইল।

আমি কাল-নির্ণয়ের সময় রূপরামের পুথী দেখিতে পাই নাই। বাং ১৩৫১ সালে ডক্টর সুকুমার সেন রূপরামের ধর্মমঙ্গল (১ম খণ্ড) প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে পুথী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আছে,—

রাজ মহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা।

পরম কল্যাণে যত আছিল [ত] প্রজা॥

ইহা হইতে পাইতেছি, রূপরামের কাব্যরচনা কালে শাহজাহান বাদশাহের পুত্র শাহ শুজা রাজমহলের শাসনকর্তা ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে (Vincent A. smith's The Oxford History of India, P. 409) পাই, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শুজা বঙ্গ ও ওড়িষ্যার রাজধানী রাজমহলের কর্তা হইয়া বসিয়াছেন। অতএব আমার উপরি-উক্ত 'লেখা'য় ভুল হইয়াছে। হেঁয়ালির অর্থ এইরূপ হইবে,—

শাকে সীমে = ১০ × ১১ = ১১০

চারি বাণ (২০), তিন যুগ (১২),

বেদ (৪) = ২০ + ১২ + ৪ = ৩৬

রসের উপরে রস = ৬ + ৬ = ১২

১৫৮

তাহে রস দেহ, ১৫৮৬ শ

= ১৫৮৬ + ৭৮ = ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ডক্টর সেন লিখিয়াছেন, অনেক পুথীতে 'চারি বাণ' স্থানে 'তিন বাণ' আছে। 'তিন বাণ' পাঠই শুদ্ধ মনে হয়। ইহাতে শাহ শুজাকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাইতেছি।

ডকটর সেন 'শাক শীমে'র অর্থ করিয়াছেন,—

শাক (কলমী) × শীম × শাক (পুই) = ১০ × ১১ × ১২ = ১৩২০। এখানে তিনি তিনটা অঙ্ক লইয়াছেন। কিন্তু এই অর্থের যুক্তি পাইতেছি না। আর, তিনটা অঙ্ক ধরিয়াও তিনি ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছেন ; তখনও শুজা রাজমহলে আসেন নাই।

খেলারাম

খেলারামের ধর্মমঙ্গল পুথীতে আছে,—

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥

ভুবন ১৪, বায়ু ৪৯। অতএব ১৪৪৯ শক। মাস 'শরের বাহন' অর্থাৎ ধনু মাস, পৌষ মাস। এই অর্থে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। খেলারামের পুথী পাওয়া যায় নাই। বদনগঞ্জের ৺হারাধন দত্ত এই পুথী দেখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতে (প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সম্পাদিত সংস্করণের শেষে) এই শ্লোক আছে,—

শাকে সিন্ধ্বগ্নি-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এই গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্লোক হইতে ১৫৩৭ শক, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা পঞ্চমী, রবিবার পাইতেছি। কৃষ্ণপক্ষের তিথি প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে সংশয় এই, মাস পূর্ণিমান্ত না অমান্ত ধরিতে হইবে? আমরা অমান্ত মাস গণনা করি। কিন্তু অমান্ত জ্যৈষ্ঠ হইলে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে রবিবার হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরাজ মহাশয় পূর্ণিমান্ত মাস ধরিয়াছেন। উত্তরপ্রদেশে পূর্ণিমান্ত মাস প্রচলিত আছে। কবি বৃন্দাবনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্দেশপ্রসিদ্ধ পূর্ণিমান্ত মাস ধরিয়াছেন। উক্ত তিথি সৌর জ্যৈষ্ঠের ৮ম দিবস।

এক্ষণে প্রাচীন কবি-ভঙ্গীতে উপসংহার করি।

সপ্তদশ গজপৃষ্ঠে ইন্দু অন্তরিত।
তুলা দণ্ডে ধরি বেদ গুরু উপনীত॥
মহাকাল সপ্ততি শরৎ গরাসিল।
কবির শকাঙ্ক লেখা 'পত্রে' প্রকাশিল॥
অতীত সাগরে ড্বু সমালীন হয়।
কবি তুষ্টি-কামনায় পুন বিচারয়॥

বাংলা বিরামাদি চিহ্ন

পূর্বকালে বাংলা গদ্য রচনায় মাত্র এক-দাঁড়ির ব্যবহার ছিল। পদ্যে, পয়ারে প্রথম চরণে এক-দাঁড়ি ও দ্বিতীয় চরণে দু-দাঁড়ি ও ত্রিপদী-ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরে চারি (৪) অঙ্কের তুল্য একটা চিহ্ন দেওয়া হইত। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী কমা ও আরও দুই-একটি চিহ্ন বাংলা রচনায় প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের তাদৃশ প্রচার ছিল না; সর্ব-সাধারণে তাঁহার অনুসরণ করিতেন না। ৭০।৮০ বৎসর পূর্বের লিখিত পত্র ও দলিল-দস্তাবেজে দাঁড়ি ভিন্ন কোন চিহ্নই থাকিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক ইংরেজী বিরামাদি চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠ্য-পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়াতে বাংলা রচনায় সে সব চিহ্ন প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি সে সকল চিহ্নের বাংলা নাম রচিত ও প্রচারিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, পাদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ, প্রশ্ন-চিহ্ন ইত্যাদি চিহ্নের নাম নহে, চিহ্ন-প্রয়োগের নাম। কমা-চিহ্ন দ্বারা পাদচ্ছেদ, কি অর্ধচ্ছেদ, কি আর কিছু বুঝিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত হয় না। গণিত পুস্তকেও বহুবিধ চিহ্ন প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু সে সকলেরও বাংলা নাম নাই। যুক্ত-চিহ্ন, বিযুক্ত-চিহ্ন ইত্যাদি বলিলে সে সে চিহ্নের আকার বুঝিতে পারা যায় না। প্রথমে চিহ্ন, পরে নাম, তার পর প্রয়োগ নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত। আমি ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের "প্রবাসী"তে "বাঙ্গালা নবলিপি" নামক প্রবন্ধে আবশ্যক যাবতীয় চিহ্নের নাম সঙ্কলন করিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কিম্বা পশ্চিম-বঙ্গ-রাজের অনুমোদন ব্যতীত প্রচারিত হইতেছে না; এই অভাবও দূর হইতেছে না।

এক্ষণে ইংরেজী বিরামাদি চিহ্নের আমার উদ্‌ভাবিত নামের সার্থকতা দেখাইতেছি।

চিহ্ন	নাম
,	কলা। ইহার আকার এককলা চন্দ্রের ন্যায়। কলা হইতে কড়া, চারি কড়ায় এক গণ্ডা। কলা, এই নামের দ্বারা পাদচ্ছেদও বুঝাইতেছে।
;	বিন্দু-কলা। কলার মাথায় বিন্দু, বিন্দুটি এক কলার বিন্দু। অতএব, দুই কলার যোগ হইয়াছে।
’	উৎকলা। অর্থাৎ, যে কলা কোন অক্ষরের নীচে না বসিয়া উপরে বসে। আমি ইহার নাম ‘ঊধ্বর্কমা’ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এই সঙ্কর নাম ভাল হয় নাই।
‘ ’	ব্যুৎকলা। বি-উৎকলা, অর্থাৎ উৎকলা ও ব্যুৎক্রমে আর এক উৎকলা।
“ ”	এই ব্যুৎকলা দুইটি দুইটি হইলে “জোড়া-ব্যুৎকলা”।
.	বিন্দু। কোন শব্দের অক্ষর অকারান্ত পড়িতে হইলে সে অক্ষরের পরে বিন্দু-চিহ্ন দিলে পাঠকের উচ্চারণে সুবিধা হয়। যেমন,— কট্‌মট্‌ করে’ তাকাচ্ছে ; কিন্তু কট. মট. চোখ। শিব দেবতা ; কিন্তু শিব. মঙ্গলময়।
।	দাঁড়ি। অর্থাৎ, দণ্ডাকৃতি।
॥	দু-দাঁড়ি। দুইটি দণ্ড।
?	খড়্গা। খড়্গের আকার-সাদৃশ্যে নাম।
!	তিলক। ললাটে অঙ্কিত তিলকের তুল্য।
¡	বিতিলক। অর্থাৎ বিপর্যস্ত তিলক। সম্বোধন চিহ্ন।

পূর্বে সম্বোধন চিহ্নের পর তিলক দেওয়া হইত। এক্ষণে প্রায় দেওয়া হয় না, কলা দেওয়া হয়। কারণ, বাক্যে সম্বোধনের পরে 'তুমি' অথবা 'আপনি,' 'তোমার' বা 'আপনার' এইরূপ শব্দ লিখিত হয়। তদ্দ্বারাই সম্বোধন বুঝিতে পারা যায়। যথা,—মহারাজ, আপনার জয় হউক। তথাপি কোন কোন স্থলে সম্বোধন চিহ্ন থাকিলে অর্থবোধ সুগম হয়। যথা,—ভারতমাতা ! আমরা স্বাধীন হইয়াও উপবাসী রহিয়াছি।

— রেখ। (ইং ড্যাশ)।

(-) লিক। (বাং লিকি, সং লিক্ষা, ইং হাইফেন)।

Λ কাকপদ। সংস্কৃত নাম।

* তারা। এইরূপ দ্বিতারা, ত্রিতারা।

† ত্রিশূল।

P পতাকা।

বেষ্টনীর চিহ্ন,—

( ) চাপ।

{ } দীর্ঘ চাপ।

[ ] বাহু।

গণিত কর্মের চিহ্ন,—

+ বজ্র। (সংস্কৃত নাম)।

− রেখক। (বিয়োগ চিহ্ন)।

× হীরা। (ইহা হইতে বাং ঢেরা, ঢেরাসই)।

÷ বিন্দু-রেখক।

/ তির্যক। ভাজন চিহ্ন।

= দ্বিরেখক।

চিহ্ন নাম

ইলেখ। (অর্থাৎ ই-রেখ)। কড়া, গণ্ডা ইত্যাদি অঙ্কের বামে বসে।

বিলেখ। (অর্থাৎ বিশিরস্ক ইলেখ)। কাহন বুঝাইবার চিহ্ন। অঙ্কের দক্ষিণে বসে।

উৎকলার ’ প্রয়োগ।

কোন কোন শব্দের মৌখিক উচ্চারণে ‘হ্’ এবং ‘য়-ফলা’ গ্রস্ত হয়। লিখনে এই লুপ্ত বর্ণ না জানাইলে প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় না। যেমন কলিকাতা, মৌখিক উচ্চারণে ‘কলকাতা’ নয়, কইলকাতা (ঈষৎ-ই)। এই ঈষৎ-ই জ্ঞাপনের নিমিত্ত উৎকলা দেওয়া আবশ্যক। এখানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে যথাস্থানে উৎকলা প্রয়োগের প্রয়োজন দেখাইতেছি।

(১) বিশেষ্য পদে,—

চা’ল (চলন, যেমন নবাবী চা’ল। ‘চাল’ ঘরের)।

ডা’ল (‘ডাল’ গাছের)।

নৌকার পা’ল (‘পাল’ গোরুর)।

নৌকার হা’ল (‘হাল’ অবস্থা। ‘হাল’ বর্তমান, যেমন হাল সন)।

চাল-চলন, মার-ধর ইত্যাদি স্থলে পরবর্তী শব্দ হেতু অর্থবোধে কষ্ট হয় না ; এখানে উৎকলা না দিলেও চলে।

(২) বিশেষণ পদে,—

(৵০) শব্দের উত্তর ‘ইয়া’ প্রত্যয় যুক্ত হইলে সংক্ষেপে য়-ফলা উচ্চারিত হয়। যথা,—চাকর+ইয়া=চাকর্‍্যে (বাবু)। ‘চাকরে বাবু’ নয়। এইরূপ, আহ্লাদ্যে ছেলে, পাহাড়্যে সাপ, বেগুন্যে রং; আগুন্যে বোমা। আরও সংক্ষেপ করিতে হইলে, শব্দের শেষে য়-ফলা স্থানে

উৎকলা দিলে য়-ফলা লুপ্ত বুঝিতে পারা যায়। যথা,—চাকরে' বাবু, আহ্লাদে' ছেলে, ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য,—শীতকাতুরে, আমুদে, হাটুরে, সাপুড়ে ইত্যাদি শব্দে পূর্ববর্তী বর্ণে উকার-যোগ হেতু শব্দের অন্তে উৎকলা দিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি অতিপ্রচলিত শব্দে 'ইয়া' প্রত্যয় হইলেও উৎকলা দিতে হয় না। যেমন,—পূবে (পূবিয়া) বাতাস, বিশে (বিশিয়া) পৌষ, ইত্যাদি।

(৵০) 'উয়া' প্রত্যয়ান্ত শব্দে মৌখিক ভাষায় 'উয়া' স্থানে 'ও' হয়। যেমন,—জলুয়া = জলো (দুধ)। কিন্তু এই বানানে 'জ' অক্ষরের উচ্চারণ অকারান্তই থাকে; আমরা যেমন উচ্চারণ করি, তেমন হয় না। 'জ'এর পর ঈষৎ-ই উচ্চারিত হয়। অতএব, 'জ'লো দুধ' লেখাই উচিত। এইরূপ ম'দো গন্ধ, প'ড়ো বাড়ী, পাঠশালার প'ড়ো, ইত্যাদি।

(৩) ক্রিয়াপদে,—

(⁄০) হইল, হইত, হইলে, হইতে ইত্যাদি স্থলে মধ্যের 'ই' গ্রস্ত হইয়া মৌখিক ভাষায় "হ'ল, হ'ত, হ'লে, হ'তে" হয়। এখানে উৎকলা ঈষৎ-ই লোপের চিহ্ন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

(৵০) "করিও, বলিও" ইত্যাদি মৌখিক ভাষায় "ক'রো, ব'লো" লেখাই উচিত। 'করো, বলো' লিখিলে অর্থ ঠিক হয় না। এইরূপ ইত, ইল, ইব ইত্যাদি ধাতু-বিভক্তির 'ই' গ্রস্ত হয়। এ স্থলে উৎকলা দেওয়া কর্তব্য। যেমন,—করিত—ক'রত, করিল—ক'রল, করিব—ক'রব।

(৶০) সে বসে গল্প করে চলে যায়,—এইরূপ লিখিলে অর্থ দাঁড়ায়, সে উপবেশন করে, গল্প করে, চলে, পরে যায়। কিন্তু বক্তা বলিতে চাহেন, "সে বসিয়া গল্প করিয়া চলিয়া যায়।" অতএব শুদ্ধ বানান,—সে বসে' গল্প করে' চলে' যায়। এই সকল স্থলে ধাতুর উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় লুপ্ত; অক্ষরলোপের চিহ্নই উৎকলা।

(।০) ক্রিয়াপদের অন্তে 'ইয়ে' থাকিলে উৎকলা আবশ্যক হয় না। কারণ, 'য়'এর উচ্চারণই যথেষ্ট। যেমন,—বসে' দাঁড়িয়ে কাল কাটায়। এইরূপ, খেয়ে, দিয়ে, হয়ে ইত্যাদি।

(।⁄০) দৌড়ে যায়, শুনে হাসে, খেলে পালায়, মেরে ধরে, ইত্যাদিতে উৎকলা না দিলেও অর্থবোধে কষ্ট হয় না।

প্রথমে বিচার্য, উৎকলা বর্ণলোপের চিহ্ন, না ঈষৎ-'ও' উচ্চারণের চিহ্ন ? যদি 'ও' উচ্চারণের চিহ্ন ধরি, তাহা হইলে ব্যুৎপত্তি পাই না। ব্যুৎপত্তি অনুসারে বর্ণলোপের চিহ্ন রাখাই কর্তব্য।

এক্ষণে যাহাঁরা উৎকলা প্রয়োগে আলস্য বোধ করেন, তাহাঁরা ভাবিয়া দেখেন না, তাহাঁরা বাংলা ভাষা শিক্ষা কঠিন করিয়া ফেলিতেছেন। একবার আমি "চাল-তত্ত্ব" নামে একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। নাম হইতে বুঝিয়াছিলাম, 'গৃহের চাল নির্মাণতত্ত্ব'। পড়িয়া দেখি, চাউল বা চাইলতত্ত্ব। আর একখানি পুস্তকের নাম "চার-স্থান।" আমি বুঝিয়াছিলাম, চর-সন্নিবেশ। গ্রন্থকার বলিতে চাহেন, চারি স্থান, সংক্ষেপে চা'র-স্থান। সম্প্রতি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত একখানি পুস্তক দেখিলাম। পুস্তকখানি মৌখিক ভাষায়, না কোন্ ভাষায় লিখিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই পুস্তকের কুত্রাপি উৎকলা নাই। এইরূপ পুস্তক পড়িয়া বালক-বালিকারা লৈখিক বা মৌখিক, কোন ভাষাই শিখিতে পারিতেছে না। ইহার প্রতিকার কর্তব্য।

গল্প

আমরা শৈশবে 'শোলোক' শুনতাম। শোলোক বলবার জন্যে পিসী জেঠাই আয়ীকে ধরতাম, মিনতি করতাম। অনেকে জানতেন, কিন্তু বলতে জানতেন না। প্রবীণা প্রাচীনারা বলতে পারতেন। দুধ খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে মাকেও শোলোকের লোভ দেখাতে হ'ত, কিন্তু সে শোলোক আসল নয়; বাজে, মন-গড়া। শোলোক নাম হবার কারণ, তাতে শ্লোক থাকত। শ্লোকই শোলোকের প্রাণ। একটার একটু মনে আছে। সেটা "কন্‌কাবতী"র,

> কন্‌কাবতী মাগো ঘরকে এস না।
> ভাত হ'ল কড়-কড়্যে বেন্নন হ'ল বাসি
> আমরা কন্‌কাবতী মায়ের তরে তিনদিন উপবাসী॥

শেষ চরণটা ঠিক মনে পড়ছে না। আমি শৈশবে শুনেছি, পরে আর শুনি নি। কিন্তু আশ্চর্য, আজিও শ্লোকটি মনে আছে। এইরূপ শ্লোক শিশুর কানে কি মধু ঢেলে দেয়, তা সে বলতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে সে তার 'আখটি' ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে। শিশু শ্লোকটি মনে রাখতে চায়, পারে না; 'কথা'র অল্প পারে, বেশীর ভাগ পারে না। এই কারণে একই শোলোক বার-বার শুনতে তার বিরক্তি আসে না। আর, যে শোলোক মনে না রইল, সে শোলোকই নয়। আমার বোধ হয়, কোনও অঞ্চলে তিন-চারিটার বেশী শোলোক চলিত নাই। কন্‌কাবতী, রাজপুত্র ও কোটালপুত্র, সুআ রাণী ও দুআ রাণী, ব্যঙ্গমা ও ব্যঙ্গমী, আমাদের অঞ্চলে এই কয়টি শুনতে পেতাম।

শোলোক শুনবার বয়স আছে। শিশুর সাত আট বছর পর্যন্ত। তারপর উপকথা শুনবার বয়স। শোলোকে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের বিচার নাই, এদেশ সে দেশের ব্যবধান নাই, কালেরও নাই। উপকথায়

কার্য-কারণের যৎকিঞ্চিৎ যোগ আছে, কিন্তু স্থায়িভাব এখানেও বিস্ময়। দেশভেদে উপকথাকে 'রূপ-কথা' বলে। সে দেশে 'আশু' নামের মানুষটি 'রাশু' হয়। কেহ কেহ মধুর বাল্য-স্মৃতিবশে 'রূপকথা' নামই রুচির মনে করেন, কেহবা এই নামের সার্থকতাও দেখতে পান। আমার ভাগ্যে আমাদের অঞ্চলের প্রচলিত উপকথা শোনা ঘটে নি। তখন দেশের দুর্দিন, মেলেরিয়ার আকস্মিক ভীষণ আবির্ভাবে লোকের আর্তনাদে শোকের কথাই শুনতে পেতাম। রঞ্জাবতীর কথা, নীলাবতীর কথা, বেহুলার কথা, দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু শুনতে পাই নি। মনে পড়ে, নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ নিয়ে কাড়া-কাড়ি করেছি। বছর পাঁচ ছয় পরে রামায়ণ কথা প্রথম শুনি। সে কি আনন্দ! কথক-ঠাকুরের বাক্যচ্ছটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তা-তে কিছুই এসে যেত না, খেই হারাত না।

তখন ইস্কুলে পড়ি। তখনকার দিনে "বিজয় বসন্ত" নামে এক গল্পের বই ছিল। বইখানা সুবোধ্য ছিল না, এখন বিন্দুমাত্র মনে নাই। "আরব্যোপন্যাস"ও ছাপা হয়েছিল। ইস্কুলের ছুটির সময় গ্রামে এসে গল্প শুনতে পেতাম। এক গোমস্তা ছিলেন, বিদ্যা পাঠশালা পর্যন্ত, কিন্তু এত গল্প জানতেন ও বলতে পারতেন যে লোকে তাঁকে গল্পের 'ধুকড়ী' ব'লত। পরে দেখেছি, তাঁর লোম-হর্ষণ গল্পের কোনটা "দশকুমার চরিতে"র, কোনটা "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র, কোনটা "বত্রিশ সিংহাসনে"র। ভোজ ও ভানুমতীর ইন্দ্রজাল বিদ্যার কাহিনী কোথায় পেয়েছিলেন, জানি না। তিনি মুখে মুখে শিখেছিলেন। নায়ক-নায়িকার নামে ভুল হয়েছিল, কিন্তু কাহিনীর বস্তু প্রায় একই। স-সে-মি-রা কাহিনীতে শুনেছিলাম বিক্রমাদিত্যের মহিষী তিলোত্তমার ঊরুতে তিল ছিল; রাজমন্ত্রীর বধূবেশে কবি কালিদাস রাজপুত্রকে চারি শ্লোক শুনিয়ে উন্মাদ রোগ হ'তে মুক্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্য

এই, সে চারি শ্লোক গোমস্তার মুখস্থ ছিল, ভাষায় কিছু কিছু ভুল ছিল, কিন্তু অর্থ বুঝতে বিঘ্ন হ'ত না। বিক্রমাদিত্যের সাহস ও বীরত্ব, একবার শুনলে মনে গাঁথা রয়ে যায়। সে সব কথা আরব্যের নয়, পারস্যের নয়। এ দেশেরই ধর্মবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, দানবীরের কথা। শুনলে উৎসাহ হয়, চিত্তের প্রসার হয়, জড়তা দূর হয়। হাসির গল্পও ছিল। গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, নাপিতের ধূর্ততা, তাঁতীর মূর্খতা, চোরের বুদ্ধিমত্তা, ইত্যাদি অনেক গ্রামে প্রচলিত ছিল। একটা গল্পও নূতন-গড়া নয়, কোন্ অতীত কাল হ'তে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে দেশবাসীর নিকটে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামায়ণ ও ভারত পাঠ, রামায়ণ মহাভারত ও চণ্ডীর গান, কৃষ্ণযাত্রা ও শ্যামাযাত্রা-গান, বৈষ্ণবের কীর্তন, বাউলের গান, আর এই সকল কাহিনী গ্রামবাসীকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিত। সে-সব দিন কোথায় গেল, আর আসবে না। এখন বই পড়ে' গল্প শিখতে হ'চ্ছে।

কিন্তু গল্পের গুণ যদি চারি আনা, কথকের গুণ বার আনা। দেবদত্ত শক্তি না থাকলে কথক হ'তে পারা যায় না। সাত আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েক মাস ছিলাম, বৈকালে গোলদীঘিতে বেড়াতে যেতাম। দেখতাম দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মণ্ডপে একটি লোক কি ব'লত, বিশ-পঁচিশ জন এক মনে শুনত। কথক কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানী কখনও কোলে, কখনও ভূমিতে প'ড়ত। দক্ষিণ বাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষঃ-লগ্ন; স্বর কখনও উদাত্ত, কখনও অনুদাত্ত হ'ত। লোকটির দেবদত্ত শক্তি নিশ্চয় ছিল, নইলে এতগুলি লোক প্রত্যহ শুনতে আসত না। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দ্বারা কথা জীবন্ত হয়ে উঠত। গল্প-লেখকের সে সুবিধা নাই। লেখককে ভাষার দ্বারা কথক হ'তে হয়।

গ-ল্প শব্দটি বেশী দিনের নয়। দুই-এক শত বছরের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। শব্দটির দুই অর্থ আছে। আমরা গল্প 'করি,' গল্প 'বলি'। বন্ধু পেলে গল্প 'করি,' গল্পে-সল্পে দু-দণ্ড কাটাই। এই গ-ল্প,—জল্প, জল্পন; দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে অসম্বদ্ধ কথন। গ-ল্প-স-ল্প শব্দের স-ল্প, বোধ হয় সু-লপ। লপ ধাতুর অর্থ লপন, ভাষণ। পূর্ববঙ্গে বলে, গা-ল—গ-ল্প। গা-ল, বোধ হয় সং গল্‌ভ, প্রগল্‌ভতা। যে গল্পিয়া, গল্প্যে, গপ্প্যে, সে প্রগল্‌ভ, বাচাল। যখন কেহ গল্প 'বলেন', আমরা শুনি, তখন সে গ-ল্প, সং কল্প। কল্প,—কল্পনা, মানসিক রচনা, নির্মাণ। এই গ-ল্পের জুড়ী, ট-ল্প; যেমন, গল্প-টল্প।

পূর্বকালে ছিল, 'কথা'। অমরকোষে, কথা প্রবন্ধ-কল্পনা; প্রবন্ধের কল্পনা, মানসিক রচনা। তখনকার 'কথা'য় নায়ক-নায়িকার নাম সত্য থাকত, হয়ত বৃত্তেরও কিছু সত্য থাকত। এই হেতু কেহ কেহ 'কথা'র লক্ষণে বলতেন, কথা-রচনায় অল্প সত্য, বহু অসত্য থাকে। কথার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পদ্যে রামায়ণ, গদ্যে কাদম্বরী। 'কথা' ছোট হ'লে 'কথানক'। ক-থা-ন-ক বাংলা অপভ্রংশে কা-হি-নী। 'কথায়' কিছু সত্য থাকে, 'উপকথা'য় কিছুই থাকে না। 'কথা' বিস্তারিত হ'লে 'পরিকথা'। কথা, উপকথা, পরিকথা, গদ্যে লেখা হ'ত। এই লক্ষণ ছেড়ে দিলে রামায়ণকে পরিকথা ব'লতে পারা যায়। যাঁরা রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সত্য মনে করেন, তাঁরা রামের চরিতকে 'আখ্যায়িকা' বলতেন। দৃষ্ট বিষয় অবশ্য সত্য, দৃষ্টবিষয়-বর্ণন 'আখ্যায়িকা', বা 'আখ্যান'। পৌরাণিকদের বিবেচনায় দ্বৈপায়ন ব্যাস ভারত-'আখ্যান' লিখেছেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় "আখ্যান-মঞ্জরী" লিখেছিলেন, তিনি কয়েক জনের চরিতবর্ণন করেছেন। বহুশ্রুত বিষয়ের বর্ণন, 'উপাখ্যান'। নলচরিত বহুশ্রুত, কিন্তু দৃষ্ট নয়। এই চরিত্রের কত সত্য, কত অসত্য, তা কেহ জানত না। মহাভারতে অসংখ্য 'উপাখ্যান'

আছে, রামোপাখ্যানও আছে। সে সব, উপকথা নয়, কথা নয়, উপাখ্যান। উপাখ্যানের মধ্যে 'কথা' থাকতে পারে। যেমন "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা"য় ভোজরাজ-কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত সিংহাসনপ্রাপ্তি, এক উপাখ্যান; এবং এক এক পুত্তলিকা-কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য বর্ণন, এক এক 'কথা'।

বাংলায় কে 'উপন্যাস' নামটি প্রচলিত করেছেন, জানি না। যিনিই করুন, তিনি উ-প-ন্যা-স শব্দের অর্থচিন্তা করেন নাই। ন্যা-স, স্থাপন, রাখা। টাকা ন্যাস, ন্যস্ত করা, টাকা জমা, গচ্ছিত রাখা। অঙ্ক কষিবার সময় রাশি-গুলি যথাস্থানে ন্যাস করতে হয়, বাংলায় বলি 'পাতন'। অঙ্গ ন্যাসে এক এক অঙ্গ এক এক দেবতার আশ্রয়ে রাখা হয়। উ-প-ন্যা-স, সমীপে স্থাপন। বাক্যের ও প্রবন্ধের 'উপন্যাস', উপক্রম, আরম্ভ। উ-প-ন্যা-স ইংরেজী suggestion-ও বটে। এই ইংরেজী শব্দের বাংলা শব্দ পাই না। কেহ কেহ 'ইঙ্গিত' লেখেন, কিন্তু 'আকার-ইঙ্গিত' যে একেবারে ভিন্ন। বাংলা উপন্যাস, বৃত্ত-কল্পনা। দ্রাবিড় ভাষায় ও মারাঠীতে novelকে বলে কাদম্বরী, হিন্দী ও ওড়িয়াতে বলে কহানী। বাংলায় 'নব-ন্যাস', 'রম-ন্যাস' নামও দেখেছি। 'রম-ন্যাস' ইংরেজী romance অর্থে বলবার যুক্তি 'রম' টুকু ছাড়া কিছু পাই না। সে দিন দেখছিলাম শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর romance-কে 'কাহিনী' বলেছেন। বর্ণনীয় বিষয় ও ভাব চিন্তা করলে এই নাম ঠিক। কিন্তু এই নামে লেখকের মন উঠবে না, 'কাহিনী' নামে নবীনতা কই?

এখন দেখি, 'ছোট গল্প,' 'বড় গল্প,' 'উপন্যাস', এই তিন নামে গল্প চলেছে। সংস্কৃত নাম বলতে হ'লে, কথা, অতিকথা, পরিকথা। কিন্তু এই তিনের লক্ষণ কি? লক্ষণ না করলে সংজ্ঞা চলে না। বাংলা ভাষায় ক-থা শব্দের নানা অর্থ আছে। শব্দটি না থাকলে 'কথা কহা'

অসম্ভব হ'ত। বিদ্যাসাগর-মহাশয় "কথামালা" লিখেছেন। বাঘ-ভালুকে কথা কয়, এ যে বিষম কথা। এখানে কথা, কল্পিত কথা, সব অসত্য। সংস্কৃতে রূপকে "হিতোপদেশ"। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "যজ্ঞ-কথা" লিখেছেন। তিনি কথক হয়ে যজ্ঞ ব্যাখ্যান করেছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের গল্প, কালিদাসের গল্প, পাখীর গল্প, আকাশের গল্প, ইত্যাদি গল্প বই কথা নাই। কালিদাস-সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত ছিল, তিনি যৌবনেও জড়বুদ্ধি মূর্খ ছিলেন, 'উষ্ট্র' উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাঁর গল্প সত্যানৃত-মিশ্রিত প্রবন্ধ। কিন্তু 'পাখীর গল্প,' বোধ করি, পাখীর স্বভাব-বর্ণন। আজকাল বালকেরা বলে, আকবারের 'গল্প,' অর্থাৎ আকবারের চরিত।

'শিশু-সাহিত্য' নামে কতকগুলি বই হয়েছে। একবার বছর সাতেক পূর্বে এক শিশুর নিমিত্তে একখানা বই খুজতে হয়েছিল। শিশুর বয়স ৭।৮ বৎসর, বাংলা পড়তে পারত, কিন্তু থমকে' থমকে' প'ড়ত, যা প'ড়ত তা গুছিয়ে বলতে পারত না। তার এক বিশেষ দোষ ছিল, শব্দের আদ্য ও অন্ত্য অক্ষর প'ড়ত, মাঝের অক্ষর ছেড়ে যেত। বালকটির পিতা না মাতা হাসি-খুসি দ্বারা বাল-শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। এরই ফলে এই দোষ ঘটেছিল। এখানে (বাঁকুড়ায়) বই-এর দোকানে বার-তের খানা বই পেলাম। পদ্য বাদ দিতে হ'ল; কারণ, পদ্যের ছন্দের গতিকে বর্ণ-পরিচয় রসাতলে যায়। বিশেষতঃ, পদ্যগুলি নানা রঙ্গে ছাপা; সাদা কাগজে কালীর অক্ষর পরিস্ফুট হয়, অন্য রঙ্গের হয় না। রাক্ষস-বক্ষস, ভূত-প্রেতের বই বাদ দিতে হ'ল; কারণ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে পারি না, ভূত-ভীত করে' চিরকাল ভীরু করতে পারি না। শেষে একখানি "শিয়াল পণ্ডিত" ও হরিশচন্দ্র কবিরত্ন-কৃত "চাণক্য-শ্লোক" কিনে আনি।

"শিয়াল-পণ্ডিতে"র দোষ আছে। 'পণ্ডিতি' দীর্ঘ হয়েছে, স্থল-বিশেষে

শিশুর অবোধ্যও হয়েছে। চাণক্য-শ্লোক পঞ্চাশটি বেছে দিয়েছিলাম। সংস্কৃত শ্লোক, প্রত্যেক অক্ষর শুদ্ধভাবে পড়তে হ'ত, বর্ণ-(উচ্চারণ-) জ্ঞান হ'ত। বাজে পদ্যের বদলে শ্লোক মুখস্থ করলে চিরজীবন ধর্মের ন্যায় সুহৃদ হয়ে থাকে। বাল্যকালে পাঠশালায় আমাকে চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করতে হয়েছিল। সে বিদ্যা এখনও কাজে লাগছে।

'শিশু সাহিত্যে'র পর 'বাল-সাহিত্য'। দশ হ'তে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকার নিমিত্ত বাল-সাহিত্য। এদের নিমিত্তে অনেক বই হয়েছে। বিদ্যালয়-পাঠ্য অসংখ্য, গৃহ-পাঠ্যও অনেক। বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ফরমাইসী বই, প্রায়ই মাধুর্যহীন। এই হেতু বালক-বালিকারা পড়তে চায় না। গৃহপাঠ্য বইতেও সে দোষ নাই, এমন নয়। তথাপি গ্রন্থবিস্তার হেতু সে দোষ কতকটা কেটে যায়। ইদানী দেশের পুরাতন উপাখ্যানের প্রতি গ্রন্থকর্তাদের দৃষ্টি পড়েছে। এটি বাল-শিক্ষার পক্ষে শুভ। কারণ প্রথমে স্বদেশী, আর, প্রত্যেক উপাখ্যানেই হিতোপদেশ আছে। বাজে গল্পে থাকে না। মহৎ লোকের চরিতও লেখা হয়েছে। অনেকে 'চরিত' বলতে চান না; বলেন, 'জীবন-চরিত'। অনাবশ্যক 'জীবন' জুড়বার কারণ, ইংরেজীতে bio-graphy, যার bio মানে জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা 'চরিতে'র আগে 'জীবন' জুড়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র "শ্রীকৃষ্ণচরিত" লিখে-ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর "চরিতকথা" শুনিয়েছিলেন। এঁরা নূতন কিছু করেন নি। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ "চৈতন্য-চরিত-অমৃত" লিখেছিলেন। সংস্কৃতের ত কথাই নাই। ইদানী 'জীবনী' নামও দেখতে পাই। কারণ ইংরেজী life শব্দের একটা অর্থ 'চরিত' আছে। কিন্তু 'জীবন' ও 'জীবনী' একই। এক জীবন-সংগ্রামেই আমাদের জীবনান্ত হ'চ্ছে, তদুপরি দাম্পত্য জীবন, বিবাহিত জীবন, পারিবারিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, জাতীয় জীবন, জুটলে কতদিক সামলানা যাবে।

শব্দের অর্থপ্রসারণে দোষ নাই, যদি তদ্দ্বারা ভাষা সঙ্কুচিত না হয়।

'বাল-সাহিত্যে'র পর 'তরুণ-সাহিত্য'। তরুণ-সাহিত্যে গল্পের আসন প্রথম। গল্প-নামে উপন্যাসও ধরছি। বাজারে যে কত গল্প বেরিয়েছে, তা বলতে পারি না। আমার গল্প-পড়ার বাতিক ছিল না, খবরও রাখি না। তা ছাড়া, ইচ্ছা হ'লে গল্প বেছে পড়তে পারি। কিন্তু মাসিকপত্র পাঠককে বাছতে দেয় না, গল্প না চাইলেও ঘরে এসে হাজির হয়। তখন গৃহস্থকে চোখ বুলিয়ে দেখতে হয়, কি জানি সুন্দর প্রচ্ছদ-পটের ভিতরে কি আছে। কখন কখন সাপ লুকিয়ে থাকে। গুণিন মন্ত্র জানেন, ভয় নাই ; কিন্তু গৃহস্থ ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

'মাসিক পত্র,'—পত্র না গ্রন্থ ? এ বিচারে না গিয়ে 'মাসিকী' বলি। মাসিকীর দুই ভাগ করতে পারি। কতকগুলি এক এক সমাজ বা সঙ্ঘের কর্ম প্রচার ও উদ্দেশ্য সাধন করে। এ গুলিকে 'সঙ্ঘ মাসিকী' বলতে পারি। অপরগুলি সাধারণ পাঠকের জ্ঞান ও আনন্দপিপাসা তৃপ্ত করে। এগুলিকে 'বার মাসিকী' বলা যেতে পারে। (বার, অবসর ও সমূহ।) "ব্রাহ্মণ সমাজ" নামে এক "মাসিকী" আছে, নামেই প্রকাশ এখানি সঙ্ঘ-মাসিকী। এতে গল্প ও পদ্য থাকে না, থাকবার কথাও নয়। কারণ, গল্প ও পদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ সমাজের কি হিত হবে ? ব্রাহ্মণেই রচবেন, পড়বেন, তাও ত নয়। সঙ্ঘ-মাসিকীর কর্তা, সঙ্ঘ। কিন্তু বার-মাসিকী মণিহারী দোকান। ক্রেতা যেমন, দোকানের দ্রব্যও তেমন রাখতে হয়, নইলে দোকান চলে না। চিত্র, পদ্য, গল্প না থাকলে ক্রেতা জুটে না, দোকানও ভরে না। দোকান ছোট করতেও মন সরে না। বার-মাসিকীর বাহুল্য-হেতু সম্পাদককে পাঠকের মন জুগিয়ে চলতে হয়। আর, সচিত্র তিন শত পৃষ্ঠার একখানা বই আট আনায় বেচাও সোজা নয়।

কিন্তু গল্প-রচনা ভারি কঠিন। বাংলা ভাষা, সালঙ্কারা ভাষা লিখতে পারলেই গল্প রচতে পারা যায় না। পদ্য রচনা ঢের সোজা, মাসখানেক অভ্যাস করলে, পদ্য লিখতে পারা যায়। অবশ্য সে পদ্য, কাব্য নয়। কবি দুর্লভ, ক্ষণ-জন্মা। দৈবী-শক্তি না পেলে কবি হ'তে পারা যায় না। যে-সে পদ্যকে কবিতা বললে কবিকে খাট করা হয়। কবির ভাব, কবিতা; কবিতাই, কবির প্রমাণ। ছন্দোবিশিষ্ট বাক্য, পদ্য। পদ্য-কার ছান্দসিক। কবি পদ্যে ও গদ্যে, বাক্যের দ্বিবিধ রূপেই তাঁর কবিতা প্রকাশ করতে পারেন। অতএব কাব্যও দ্বিবিধ, পদ্য-কাব্য ও গদ্য-কাব্য। উত্তম গল্প, কাব্য। গল্প পদ্যে ও গদ্যে দুই রূপেই লিখতে পারা যায়।* যে গল্পে কবিতা নাই, সেটা গল্প নয়, বাজে বকা।

নানা মাসিকীতে মাসে মাসে কত গল্প প্রকাশিত হ'চ্ছে, কেহ গণেছেন কি না জানি না। শতাবধি হবে। সাপ্তাহিক বার্তাপত্রেও গল্প থাকে। বোধ হয় গল্প-লেখক, বা গল্পক এক সহস্র হবেন। পদ্য-রচনার নিয়ম আছে। ইংরেজীতে গল্প লিখবার ধারা-পাত আছে।

---

* এখন পদ্য-গল্পের নাম 'গাথা' দেখতে পাই। নামটি ঠিক কি? সংস্কৃতে 'গাথা' একটি কি দুটি শ্লোক, যা লোকে গাইত, স্মরণার্থে কীর্তন ক'রত। সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষায় "গাথা সপ্তশতী"; এখানেও একটি একটি শ্লোক, যদিও সংস্কৃতে নয়। পালি ভাষায় "থেরীগাথা" বৌদ্ধ স্থবিরার বৃত্ত, কিন্তু গেয়। বাংলাতেও গাথা ছিল; যেমন পশ্চিম দক্ষিণ রাঢ়ের "নীলাবতী" বা "লীলাবতী", মধ্যরাঢ়ের রাজা রণজিৎ রায়ের 'গাথা,' রণজিৎ রায়ের বৃত্ত। এ সকল পদ্য গাওয়া হ'ত। গাথক—গায়ক। সর্পবৈদ্যেরা লখিন্দরের কথা গায়। সেটি গাথা। গোপিচাঁদের গীত, গাথা। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি গাথা সংগ্রহ করেছেন। গাথা সত্যমূলক। গাথাকে 'পল্লীগীতি' বলা ঠিক নয়। পল্লী, গ্রাম, নগর, নাম ভেদে গাথা হয় না। আর, বাউলের গান, গীতি বটে, কিন্তু গাথা নয়।

কেনই বা না থাকবে ? কোন্ কর্মের নাই ? বাংলাতে পত্র লিখবার ধারা-পাত আছে। কিন্তু তা দিয়ে পত্রের আরম্ভ ও শেষ শিখতে পারা যায়, পত্রের বস্তুর বর্ণন শিখতে পারা যায় না। সে কর্ম পত্র-লেখকের।

গল্প ও উপন্যাসে তফাৎ কি ? বাংলায় কিছুই দেখতে পাই না। প্রয়োগে দেখি, গল্প ছোট, উপন্যাস বড়। যখন দেখি, এটি 'ছোট গল্প', ওটি 'বড় গল্প', তখনই বুঝি এই ভাগ বাহ্যিক। উপন্যাসেরও দৈর্ঘ্যের সীমা নাই ; কোনটা এক শ' পৃষ্ঠা, কোনটা পাঁচ শ' পৃষ্ঠা। ক্রেতা পেলে হাজার পৃষ্ঠাও হ'তে পারত। যদি ইংরেজী story ও novel, বাংলার গল্প ও উপন্যাস মনে করি, তা হ'লে গল্পের 'বন্ধ' (plan) ঋজু, উপন্যাসের সঙ্কুল (complicated)। সঙ্কুল বটে, কিন্তু দৈবাৎ নয়, লেখকের ইচ্ছাকৃত কূটবন্ধ (plot)। রস-হিসাবে উপন্যাস নানা রকম। বীর ও অদ্ভুত রস থাকলে ইংরেজী romance, রোমাঞ্চন। পৌরাণিক-প্রবর লোমহর্ষণ অদ্ভুত কথা শোনাতেন। ইংরেজী মতের গল্প ও উপন্যাসের প্রকৃতি ঐ রকম হ'লেও সংসারে বিকৃতি-ই বহু। তাতে দুঃখই বা কি ? রাগিণী বেহাগ মিষ্ট, কিন্তু বেহাগ-ড়া ত কম নয়। কলার হানি হ'লে কোনটাই মিঠে নয়। গল্পে কলাই প্রধান। বস্তু ও বন্ধ অবশ্য চাই, কিন্তু 'তাজমহল' পাথরের পাঁজা নয়, নির্মাণের গুণে অপূর্ব আনন্দ উদ্রেক করে। সে গুণের নাম কলা (art)। পূর্বকালের চৌষট্টি কলার মধ্যে "কাব্যক্রিয়া" একটা কলা ছিল। কাব্যকলা, চিত্রকলা শব্দের প্রয়োগ আছে। কলা, চাতুরী, ছল (fraud)। লোকে বলে, "লোকের ছলা-কলা", "লোকটার কলা (গ্রাম্য, 'কল্লা') দেখে বাঁচি না।" কলা কৃত্রিমকে অকৃত্রিম দেখায়, মিথ্যাকে সত্যভ্রম করায়। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পটে। কোথায় গাছ, কোথায় বা পাহাড় ; আমরা পটে গাছপাথর দেখি। চিত্রকর রং দিয়ে ইন্দ্রজাল রচনা করেন, কবি

ভাষার শব্দ দিয়ে করেন। কবির ইন্দ্রজাল, কবিতা। এটি তাঁর স্বভাবজ। কখন-কখন অন্যেও কবিতা অনুভব করেন, প্রকাশও ক'রতে পারেন। কিন্তু সেটা ঔপাধিক, অবস্থা-বিশেষে স্ফুরিত হয়।

ইংরেজীর মাপ-কাঠিতে চলতে হবে, কিম্বা গল্প ও উপন্যাসের বন্ধ শুদ্ধ রাখতে হবে, এমন কথা কি আছে। পাঠক চান আনন্দ; রসই আনন্দের হেতু। কার্যকরণ এক হয়ে আনন্দ ও রস সমার্থ। প্রাচীন কাব্যরসিক খুজে খুজে নয়টি রস পেয়েছিলেন, একটি বাড়াবার কমাবার নাই। *

নয়টা রসের একটা-না-একটা না থাকলে কাব্য হবে না, এমন নয়। এর দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা"। এটি গল্প না উপন্যাস ? এতে উপন্যাসের ফন্দি বিলক্ষণ আছে। কালাদীঘির ডাকাতেরা বেহারা ও ভোজপুরী

* আশ্চর্য বিশ্লেষণ-শক্তি। আরও আশ্চর্য, নয়টা রসের আদি, প্রধান, একটি। সেটির নাম আদিরস। অপর আটটি,—বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস, শান্ত। শান্তরসে কর্মের অভাব। দৃশ্যকাব্যে এ রসের স্থানও নাই। কেহ কেহ বাৎসল্য নামে আর এক রস স্বীকার করেন, কিন্তু ভক্তি সখ্য প্রভৃতিকে রস না বলে 'ভাব' বলেন। ভাবের সংখ্যা নাই। অনুরাগ ও বিরাগ, এই দুই ভাব, সকল ভাবের ও রসের মূল। প্রাচীন রস-বেত্তারা আদিরসকে নায়ক-নায়িকার প্রেমে বদ্ধ রেখে অনুরাগের ক্ষেত্র খর্ব করেছেন। নইলে এই রসকে মধুর রস বলেও বাৎসল্য, সখ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দাস্য প্রভৃতিকে মধুর রসের অবান্তর ভাবতে পারতেন। পাত্র-ভেদে মধুর রস নানাবিধ; বিরাগও নানাবিধ। অনুরাগ-বিরাগের অভাবে শান্তরস। সেটি নবম। অন্যদিকে, ষড় রিপুর আদি রিপুও কাম। কাম হ'তে লোভ। কাম্যের লাভে মদ, অ-লাভে ক্রোধ। ক্রোধ হ'তে মোহ ও মাৎসর্য। কবি যে পথেই যান, এই ছয় পথে ঘুরতে থাকেন। এই ঘূর্ণি-পাকে নব-রসের উৎপত্তি। বাংলা গল্পে কোন্ রিপুর প্রাবল্য, কিম্বা রস থাকলে কোন্ রস অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তা বিবেচনার বিষয়।

দারোয়ানকে ঠেঙ্গিয়ে ইন্দিরার অলঙ্কার কেড়ে নিতে পারত, ইন্দিরা বি-গাঁয়ে হারিয়ে যেত না। "ইন্দিরা"য় স্থায়িভাব কিছুই নাই। ইহার আরম্ভ বিস্ময়ে; পরিণতি, কৌতুক বা হাস্যভাবে। "রাধারাণী"তেও কোন স্থায়িভাব নাই। রচনার মাধুর্যগুণে গল্পটি মনোহারী হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি রোমাঞ্চন। আমরা বীর ও অদ্ভুত রসে সহজে মুগ্ধ হই। মহাভারতে বিরাটপর্ব এই ভাবে বিরাটই বটে। বোধ হয়, এই কারণে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় বিরাট-পাঠের বিধি হয়েছে।

যাঁর কবিতা স্বভাবজ নয়, তিনি গল্প লিখলে দুই একটি পারেন, বেশী পারেন না। ঔপাধিক গুণপ্রকাশের ক্ষেত্র অল্প। তথাপি কেহ কেহ একটি গান, একটি পদ্য-কাব্য, একটি উপন্যাস, একটি গল্প লিখে যশস্বী হয়েছেন। একটিতেই তাঁদের অনুভূতির উৎস নিঃশেষ হয়েছে। এমন গল্পের একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। সন ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় "আগন্তুক" নামে এক গল্প লিখেছিলেন। আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। গল্পের বস্তু যৎসামান্য। এক গ্রামের চক্রবর্তীর এক জামাই বিবাহ পরে বিদেশে চাকরি করতে গেছলেন। কয়েক বৎসর পরে ছুটি পেয়ে শ্বশুরমশায়কে না জানিয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত। সেদিন দৈবাৎ চক্রবর্তী গ্রামান্তরে গেছলেন, বাড়ীতে পুরুষ কেহ ছিল না, শাশুড়ী ও বনিতা, কমল, মাত্র ছিলেন। চাকরো যুবা; বেশে অবশ্য ভদ্রলোক। বাড়ীর এক কৃষাণ ধান ঝাড়ছিল, কলিকায় তামাক সেজে ভদ্রলোককে তামাক ইচ্ছা করতে দিলে। লোকটি তামাক খায় না, চক্রবর্তী বাড়ীতে নাই শুনেও উঠল না! চক্রবর্তীনীর এমন বিপদ কখনও ঘটে নি। স্নানের বেলা হ'লে আগন্তুক এমন কাণ্ড করলেন যে চক্রবর্তীনী স্তম্ভিত। কমল ঘড়া ও তেলের বাটী পুকুর ঘাটে রেখে সইকে ডাকতে গেছে, ভদ্রবেশী যুবকটি সে বাটীর তেল নিয়ে মেখে স্বচ্ছন্দে স্নান করলেন। এমন

আস্পর্ধা সইবার নয় ; এ যে দিনে ডাকাতি ! আগন্তুক সব শুনতে পেলেন। মধ্যাহ্ন হ'ল, লোকটাকে অভুক্ত রেখে গৃহস্থ খেতে পারে না। অগত্যা চক্রবর্তীনী ঘোমটা টেনে ভাতের থালা রেখে গেলেন। আহারান্তে পাড়ার গিন্নীবান্নীর সভা ব'সল, ডাকাতকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবার পরামর্শ হ'ল। কিন্তু মারে কে ? সন্ধ্যার সময় চক্রবর্তী বাড়ী এসে জামাই দেখে খুসী। ভিতরে গিয়ে গিন্নীকে বলতেই তাঁর যে কি দশা হ'ল, তিনিই জানেন। লজ্জা, বিস্ময়, ক্রোধ, ব্যস্ততা, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাবের সমাবেশে হাস্যরস ঘনীভূত হয়েছে। গল্প-কার পরে "প্রবাসী"তে দুই তিনটা গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু একটাও ভাল হয় নাই।

গল্পের ক্ষেত্র ছোট, উপন্যাসের বড়। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্র অসংখ্য, উপন্যাসের অল্প। অধিকাংশ উপন্যাসে নিয়তির জয় ঘোষিত হয়। সংসারে তাহাই বটে। কথাই আছে, মানুষের ভাগ্য দেবতাও জানেন না। সোনার মৃগ হয় না, হ'তে পারে না, জেনেও রামচন্দ্র সে মৃগ অনুসরণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির এত জ্ঞানী ; তবু কপটদ্যূতে আসক্ত হ'লেন ; নীতিজ্ঞ হয়েও দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন। মহাভারতে অদৃষ্টের ফল পুরুষকারকে হারিয়ে দিয়েছে। অদৃষ্ট, পূর্বজন্মার্জিত ফল ; পুরুষকার এ জন্মের। বহু প্রাচীন কাল হতে এ দুই নিয়ে বহু বিচার হয়ে গেছে। কেহ কেহ 'কাল', আর এক কারণ বলেছেন। কাল অনুকূল না হলে মানুষের যত্ন সফল হয় না। এ ত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছি। সেইরূপ দৈব অনুকূল না হ'লে কাল ও যত্ন কিছুই করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষে" তিনই দেখতে পাই। নগেন্দ্রনাথ নৌকায় যেতে যেতে ঝড়ে পড়বেন, অনাথা কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দিবেন, এ ত দৈবের ঘটনা। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর "অভিশপ্ত সাধনা" উপন্যাসে দৈববল ও কর্মবলের পরীক্ষা করেছেন। কুন্দনন্দিনী স্বপ্নে জেনেছিল, কে তার

বিপদের কারণ হবে, তথাপি সে বিপদেই পড়েছিল। "অভিশপ্ত সাধনায়" কর-রেখা ও জন্ম-কোষ্ঠী দ্বারা নায়িকাও তার দয়িতকে প্রাণ-সংহারক জানতে পেরেছিল, তথাপি তার হাতেই প'ড়ল! মনে হ'তে পারে, এ সব কল্পনা। কিন্তু কে না জানে প্রতিদিন নিয়তির খেলা চলছে। চলছে বলেই লোকে ফল-জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। গান্ধীজী মহাত্মা হ'লেন; কই আর কেহ হ'তে পারলেন না। তিনি তপস্যাই বা কেন করতে গেলেন? এই প্রবৃত্তি কোথা হ'তে এল? উপন্যাসের বন্ধ, নিয়তির বন্ধ। আমরা অ-প্রত্যাশিত ফল দেখে মুগ্ধ হই, বিমূঢ় হই। কোথা হ'তে কি যে হয়, বিশ্বকর্ত্রীই জানেন।

এক গল্প-কীট বলতেন, "গল্প চারি প্রকার। যথা, কোনটা দৈবাৎ ঘন আবর্তিত দুগ্ধ; খেলে বুঝতে পারি, হাঁ, কিছু খেয়েছি, অনেক দিন মনে থাকে। কোনটা জলো দুধ, পানসে' ঠেকে, এ বেলা খেলে ওবেলাকে মনে থাকে না। কোনটা পিঠালীর গোলা, দুধের গন্ধও নাই, কেবল দেখতে শাদা। কোনটা পচা ছেনার জল, গন্ধেই বমি উঠে।" গল্পের সমালোচনা হ'লে গল্প-কার দোষ-গুণ বুঝতে পারতেন। "সাহিত্যে" অল্প-স্বল্প সমালোচনা থাকত, লেখক ও পাঠকের উপকার হ'ত। সমালোচক, বিচারক। অর্থী লেখক; প্রত্যর্থী পাঠক। স্বীয় রচনার প্রতি সকলের মমতা হয়, বন্ধুজনের প্রতি বিচারকেরও মমতা হয়। কিন্তু উভয়েই মমতা ত্যাগ করতে না পারলে পাঠকের প্রতি অবিচার হয়। আমি গল্প কদাচিৎ পড়ি। গল্পের আরম্ভ ভাল লাগলে পড়ি, নইলে সেখানেই ছাড়ি। এত অল্প জ্ঞান নিয়ে গল্পের সমালোচনা সাজে না। দু-একটা দোষ চোখে ঠেকেছে, লিখি। দেখি, কোনটার আরম্ভ বেশ, বন্ধও বেশ, কিন্তু শেষে হত-ইতি-গজঃ। মনে হয় যেন লেখক পাতা গণছিলেন, হঠাৎ দেখলেন পাতা বেড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সমাপ্তি করে ফেলেন। এর ফলে ভাব-ভঙ্গ ঘটে। দ্বিতীয় দোষ, গল্পের

অনাবশ্যক বাহুল্য। স্বগতোক্তি অল্প হ'লেই ফলোৎপাদক হয়। মনের বিতর্ক দীর্ঘ হ'লে পাঠকের ধৈর্য লোপ হয়। পদ্যকাব্যে অলঙ্কার-বাহুল্য ঘটে, গদ্য-কাব্যেও ঘটে। তখন প্রতিমার রূপ দেখতে পাই না, কিঙ্কিণীর ঠুন্-ঠুন্ ধ্বনি-মাত্র কর্ণগোচর হয়। তৃতীয় দোষ, অশিষ্টেরা বলে, "বিদ্যা ফলানা"। বিদ্যার পরিপাক না হ'লে, উদ্গার ওঠে। পাঠক এ দোষ সইতে পারেন না। দৃষ্টান্ত ও উপমার নিমিত্ত বাঙ্গালী পাঠককে বিলাতে যেতে হ'লে তিনি পর্যাকুল হয়ে পড়েন। চতুর্থ দোষ, 'ধান ভান্তে শিবের গীত,' প্রসঙ্গ-বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র "ইন্দিরা"র শেষে এই দোষ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এ পরিচ্ছেদটি না লিখলেও লিখতে পারতাম।" তাঁকে বরের "বাসর ঘরের একটি চিত্র দিবার বাসনা" ভ্রান্ত করেছিল। তিনি এ বাসনা অন্যস্থলে মিটাতে পারতেন।

তিনি রসিক ছিলেন, কিন্তু কুত্রাপি অশ্লীলতা করেন নাই। যে বাক্যে শ্রী শোভা লক্ষ্মী নাই, সেটা অশ্রীল, অশ্লীল। যে বাক্য শুনলে লজ্জা ও ঘৃণা হয়, সেটা সমাজের অমঙ্গল-জনক। 'সাহিত্য' শব্দের অর্থেই প্রকাশ, এতে অ-সামাজিকতা থাকবে না, পরন্তু সমাজের হিতেচ্ছা থাকবে।* প্রত্যেক সমাজেই ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সুপ্রবৃত্তি-

* সাহিত্যের লক্ষণ নিয়ে কলহ হয়। এর কারণ কেহ সাহিত্য শব্দের সংস্কৃত অর্থ ধরেন, কেহ "সাহিত্য দর্পণ" অনুসরেন, কেহ ইংরেজী literature শব্দের এক বিশেষ অর্থ স্মরণ করেন। কোন্ পথে চলেছেন ব'ললে, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে না। আমি সাহিত্য শব্দের মূলার্থ ভাবছি, কারণ সে অর্থ ধরলে বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। "সাহিতে'র ভাব, সাহিত্য। 'সহিত' শব্দের দুই অর্থ আছে। (১) সমভিব্যাহৃত, (company, association)। পূর্বে বলা হ'ত, 'লোকের সমভিব্যাহারে,' (গ্রাম্য) 'সমিভ্যারে'। আমরা এখন বলি, 'লোকের সহিত'। 'সহিতে,' সঙ্গে; পূর্ববঙ্গে বলে সাথে। 'সহিত' সঙ্গী, সেথো। "শূন্যপুরাণে"

কুপ্রবৃত্তির ভেদ আছে। গল্পে সে ভেদ না মানলে গল্পটা সমাজ-বিদ্বেষ্টা হয়; পাঠকের অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয়। গল্প পড়ে জুগুপ্সার উদয় হ'লে গল্প নিষ্ফল। সে গল্পে রচনাশক্তি থাকলে পাঠক ভাবতে থাকেন, লেখকটি কে, তাঁর চরিত্রই বা কিরূপ। পদ্যকাব্যে ও গদ্যকাব্যে এমন কি তুচ্ছ গল্পেও লেখক স্বচিত্তই প্রকাশ করেন, তাঁকে চিনতে কষ্ট হয় না। কলার জন্যে কলা-চর্চা,—এটা আত্ম-বঞ্চনা।

"প্রবাসী"-সম্পাদক ১৩৩৬ সালে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত গল্পের ভাল তিনটি বাছতে গ্রাহকগণকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, পাঠকেরা কি প্রকার গল্প ভালবাসেন। তাঁর কামনা সফল হয় নাই, মাত্র সাতাত্তর জন নিজের নিজের মত জানিয়েছিলেন (১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী")। এই ঔদাসীন্যের নানা কারণ থাকতে পারে। হয়ত অল্প গ্রাহক গল্প পড়েন। হয়ত যাঁরা ভাল-মন্দ বিচার করতে পারেন, তাঁরা পড়েন না। হয়ত বা কোন গল্প তাঁদের ভাল লাগে নি। কারণ যাই হ'ক, ঐ সালের তিনটি গল্প আমার মনে আছে। তন্মধ্যে দু-টি পুরস্কৃত হয়েছে। একটি পরশুরামের "গল্পিকা," অন্যটি "রাণুর প্রথম ভাগ"। পুরস্কৃত তৃতীয় গল্প, "চাপা আগুন"। এটি

"সহিতর দানপতি" লেখার কর্তা। অর্থাৎ, সহিত, সমাজ, গোষ্ঠী। সাহিত্য, মাঠে গোঠে জন্মে না। কতকগুলি সমধর্মী লোকের গোষ্ঠী নিমিত্ত সাহিত্য। এরা অবশ্য নিজের হিতেচ্ছায় 'সহিত,' সংযুক্ত হয়। সে হিত যে কি, তারাই জানে, কেহ মিছামিছি দল বাঁধে না। দৈবাৎ 'সহিত' শব্দ হ'তে এ অর্থও আসে। স হিত, সহ-হিত্য হিতযুক্ত। অতএব বলতে পারি, জ্ঞানীর জ্ঞান-সাহিত্য, রসিকের রস-সাহিত্য, ধার্মিকের ধর্ম-সাহিত্য, তরুণের তরুণ-সাহিত্য, গাণিতিকের গণিত-সাহিত্য, ইত্যাদি। সাহিত্য শব্দের বিশেষ অর্থে কাব্য-সাহিত্য। কিন্তু কবি না হ'লেও সাহিত্যিক আখ্যা লাভ হ'তে পারে। সমাজে যাঁর রচনা আদৃত, তিনি সাহিত্যিক। কবি-সমাজে যিনি সাহিত্যিক, তিনি অন্য সমাজে অ-সাহিত্যিক হ'তে পারেন।

পড়ি নাই। এখন পড়ে দেখলাম। বোধ হয় এর প্রথম 'পেরা' পড়েই ছেড়েছিলাম। এ যে ভাবের মাথায় লাঠি মারা। রচনা স্বাভাবিক নয়, আগা-গোড়া কৃত্রিম, কলা-হীন। এই দোষে "আগুন" খুঁজে পাওয়া যায় না। যে তৃতীয় গল্প আমার মনে আছে, সেটির নাম "সন্ধ্যামণি" (দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯০ পৃষ্ঠা)। গল্পটি 'সত্যাকৃত' (realistic), আদিরসেরও বটে। কিন্তু লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ধর্মাধর্ম-বিবেককে পরাভূত করে নাই। এই কারণে করুণরসে পাঠকের চিত্ত দ্রব হয়।

এত যে গল্প লেখা হ'চ্ছে, পড়ে কে ? বৃদ্ধ বৃদ্ধা পড়েন না, প্রৌঢ় প্রৌঢ়াও পড়েন না। তাঁরা সংসারে অনেক সত্য গল্প দেখেছেন, ভুগেছেন, মিথ্যা গল্পের প্রয়োজন পান না। পড়ে, যুবা বয়সের নরনারী।

এর কারণ আছে। গল্পে মানব-চিত্তচাতুর্য বর্ণিত হয়। দক্ষতা, নিপুণতা চাতুর্য বটে, চারুতা রমণীয়তাও চাতুর্য। যৌবনের ধর্মে মানুষ পরচিত্ত-চকোর হয়, সুপেয় রস অন্বেষণ করে। সংসার-জ্ঞান নাই, গল্প পড়ে' জ্ঞান-পিপাসাও তৃপ্ত করে। ভুক্তান্ন-রস সর্বদেহে চরলেও হৃদয়ে তার স্থান। চিত্ত-রসের স্থানও হৃদয়। তরুণের হৃদয় আছে; কাব্য সহৃদয় পাঠকের নিমিত্ত রচিত হয়। তরুণ অপেক্ষা তরুণী কাব্য-রসে অধিক আকৃষ্ট হয়। কারণ, তার জ্ঞান-বৃত্ত হ্রস্ব, বাইরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে পায় না। এদের নিমিত্ত গল্প লিখতে হ'লে সবিশেষ ভাবতে হয়। যে গল্প পড়লে চিত্তের প্রসাদ ও প্রসার হয়; ক্ষণিক উদ্দীপনা নয়, পবিত্রভাব স্থায়ী হয়; অবসাদ নয়, উৎসাহ হয়; সে গল্পের অসংখ্য ক্ষেত্র আছে।

বৎসর গণে' তারুণ্য নিরূপিত হয় না। কারও অল্প বয়সে তারুণ্য আরম্ভ হয়, কারও পঞ্চাশ বৎসরেও শেষ হয় না। না হ'লেও যৌবনকাল পঁচিশ ত্রিশ বৎসর। কবির কবিতার বয়সেরও এই সীমা। আমাদের

দেশে এ সীমা কদাচিৎ অতিক্রান্ত হয়। কালিদাস কত বয়সে "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" লিখেছিলেন? আমরা সে বয়স জানি না বটে, কিন্তু বলতে পারি পঞ্চাশের অনেক আগে, ত্রিশের সময়ে। পঞ্চাশের পরে যদি তিনি কোন কাব্য লিখে থাকেন, সেটা অভ্যাসের গুণে, হৃদয়ের রস-প্রভাবে নয়। *

পুরানা গল্প

নূতন গল্প করেছি। একটু পুরানা গল্প করি।

গল্প শুনবার দিন চলে গেছে, সে পাট উঠে গেছে। পুরানা গল্প এখন বই পড়ে' শুনতে হ'চ্ছে। পুরানা গল্পের বই কলিকাতার কলেজ-ষ্ট্রীটে পাওয়া যায় না, "বঙ্গবাসী," "হিতবাদী," "বসুমতী"র সাহিত্য-প্রচার আপিসেও না। পেতে হ'লে কলিকাতার বটতলায় যেতে হয়, অন্য নগরে মণিহারীর দোকানে খুজতে হয়। বটতলার প্রকাশকেরা দেশের যে কি উপকার করেছেন, করছেন, তা আমরা ভুলে যাচ্ছি। তাঁরা কীট-দংশন হ'তে কত পুথী রক্ষা করেছেন, তা বলবার নয়। সেকালে বইর এত দোকান ছিল না, আর, কে বা কলিকাতা গিয়ে বই আনবে? গাঁয়ে গাঁয়ে বই বিক্রির লোক ফিরত, যার ইচ্ছা হ'ত, সে দশখানা দেখত, খানিক খানিক প'ড়ত, তার পর কিনত। এখানে ওখানে জাত ব'সত, বইর দোকানও ব'সত। গ্রাম্য জন দু-আনা চারি আনা আট-আনা পয়সা নিয়ে জাত দেখতে যেত, বইর পাতা উলটে বই কিনত। যারা গাঁয়ে বই বেচতে আসত, তারা

* প্রবন্ধটি ১৩৩৮ সালের পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ছাপা বইর বদলে গাঁ হ'তে পুথী নিয়ে যেত। এমনই করে' বটতলার প্রকাশকেরা নূতন নূতন পুথী পেতেন, ছাপাতেন। তাঁরা সংস্কৃত পুথী বাংলা ছন্দে অনুবাদও করাতেন। কাগজ খারাপ, ছাপায় ভুল থাকে। তা থাক। কে এত সস্তায় বই দিতে পারত? কে বা রামায়ণ মহাভারত পড়তে পেত? কাগজ খারাপ হ'লেও দু' পুরুষ টেকে। গরীব গাঁয়ে পাকা ঘর নাই, পাকা ঘরেও উই আর ইঁদুর খলতা ছাড়ে না।

আমার গল্পের "ধুকড়ি" এখন জীবিত থাকলে প্রায় এক-শ বছর দেখতেন। তখন "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "বত্রিশ সিংহাসন" পয়ারে ছাপা হয়ে থাকবে।* কিন্তু "দশকুমার চরিত" পয়ারে দেখিনি। "ধুকড়ি"র একটা গল্প এক কুমারের চরিত। সেটা দুষ্টা স্ত্রীর গল্প। তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? হয়ত সে গল্প অন্য বইতেও ছিল। গ্রামে "শতস্কন্ধ রাবণবধ" পুথী পড়তে দেখতাম। রামচন্দ্র রাবণবধ করতে পারেন নি, সীতা কালীরূপা হয়ে রাবণের মুণ্ড ছেদন করেন। বিদ্যাপতিকৃত "পুরুষ পরীক্ষা" হ'তেও গল্প শুনেছি। যখন শুনেছি তখন অবশ্য এ সকল বইর নাম জানতাম না। আর একখানি বই হ'তে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। বইখানির নাম "শুক বিলাস," বাংলা ছন্দে রচিত। "শুক সংবাদ" নামে না কি একখানি সংস্কৃত

* দেখছি, "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" হ'তে প্রকাশিত "মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী"র মধ্যে "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" প্রবেশ করেছে। একি ভ্রমের কর্ম না কিম্বদন্তী আছে? অন্য বহু প্রমাণ অগ্রাহ্য করলেও সপ্তমোপাখ্যানে "হেমাদ্রি প্রতিপাদিত দানখণ্ড" দেখলেই বুঝি, "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" হেমাদ্রির পরে রচিত। হেমাদ্রি বিখ্যাত দাক্ষিণাত্য ধর্ম-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ "চতুর্বর্গচিন্তামণি" ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল। অতএব "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" চতুর্দশ শতাব্দের পূর্বে কিছুতেই হ'তে পারে না, কালিদাসের পারে না।

বই আছে। আমার কাছে যে "শুক বিলাস" আছে তাতে লেখা আছে, "শুক বিলাস অর্থাৎ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের লীলা-বর্ণন এবং শুক-সংবাদ।" সন ১৩২০ সালে সপ্তম সংস্করণ হয়েছিল। শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য, শ্রীচুণীলাল দাসের আদেশে রচেছিলেন। পুস্তকশেষে লিখিত আছে,

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে আজ্ঞা পায়।
বিক্রমাদিত্যের কথা বিরচিল তায়॥
নিবাস ধুলুক সুদমণি অধিকারে।
সদা আশীর্বাদ করি সভাতে যাহারে॥
শরীরে বাহন মাস দিয়া পারাবার।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ লোকচক্ষু বার॥
নৈত্র পৃষ্ঠে বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ।
সাঙ্গ কৈল ইতিহাস স্মরি জনার্দন॥

লিপিকারেরা শকাঙ্ক লিখতে ভুল করতেন। এখানেও ভুল করেছেন। 'শরীরে বাহন মাস' না হয়ে, হবে 'শরের বাহন মাস'। খেলারামের ধর্মমঙ্গলেও 'শরের বাহন মাস' আছে। এর অর্থ শরাসন, ধনুমাস। "দিয়া পারাবার'—দিনে পারাবার, সপ্তম দিবসে। 'নৈত্রপৃষ্ঠে' না হয়ে, হবে 'মৈত্রপৃষ্ঠে', মৈত্র—১৭। অতএব নন্দকুমার ১৭৫১ শকে, প্রায় এক শ বৎসর পূর্বে, বিক্রমাদিত্যের লীলা বর্ণন করেছিলেন। আর ছাপা হবার পাঁচ সাত বছরের মধ্যে বইখানা দূরগ্রামে গিয়ে পঁহুছেছিল।

"শুকবিলাসে" বিক্রমাদিত্যের কীর্তিকাহিনী আছে। কীর্তিকাহিনী-গুলি বড়, শেষ করতে সময় লাগে। বেতালের প্রশ্ন ও পুত্তলীর কথা ছোট। শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু গল্প শোনার তৃপ্তি হয় না। ছোট গল্পের দোষই এই। কমলিনীর কাহিনীতে বিক্রমাদিত্য পশ্চিম সমুদ্রের সে পারে শাল্মলী দ্বীপে গেছলেন। সে দ্বীপে কঙ্কাল পুরে 'কেলি' নামে নরাধিপ ছিলেন। কমলিনী তাঁর কন্যা। কাহিনী থাক, দেখা

যাচ্ছে শুক-সংবাদ-লেখক পুরাণের শাল্মল-দ্বীপ ঠিক স্থানে বুঝেছিলেন, এক অসম্ভাব্য দেশ মনে করেন নি। সংস্কৃতে কি রূপ আছে জানতে ইচ্ছা হয়। নৃপতির নাম 'কেলি', এ নামও যেন ইতিহাসে পাবার। এখন বিখ্যাত স্বনামধন্য মুস্তাফা-কেমাল-পাষা শাল্মল-দ্বীপের অধিপতি।

আমি ভানুমতী ও ভোজরাজার অসাধারণ ইন্দ্রজালবিদ্যার কাহিনী সম্পূর্ণ কোথাও পাইনি। ইন্দ্রজাল-বিদ্যা নূতন নয়। বহুকাল হ'তে এই বিদ্যা চলে আসছে। বোধ হয়, অসুররা এই বিদ্যায় পাকা ছিল, আর্যেরা হতভম্ব হ'তেন। এর প্রাচীন নাম মায়া। অসুররা মায়াবী ছিল। তাদের গুরু শুক্রাচার্য মায়া-বিদ্যা জানতেন, দেবতার গুরু বৃহস্পতি জানতেন না। সম্বর নামে এক অসুর মায়া-বিদ্যায় বিখ্যাত হয়েছিল। মহাভারতে শাল্বরাজা মায়াতে নিপুণ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পেরে উঠতেন না। রাক্ষসেরাও জানত। রাক্ষসীপুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া করতেন। অবশ্য সকলেই জানত না। মারীচ রাক্ষস জানত। সে-ই মায়া-মৃগ হয়ে সীতা ও রামচন্দ্রকে ভুলিয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ মায়া-বলে ইন্দ্রকে বন্দী করেছিলেন। কেহ কেহ মায়া ও ইন্দ্রজালে প্রভেদ করতেন। মায়া, কুহক, সর্বৈব মিথ্যা; ইন্দ্রজাল কৈতব, "চালাকি"। ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রের জাল চোখে পড়লে, রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মে। ভেল্‌কি এই। সেকালে মায়া ও ইন্দ্রজাল, দুই-ই যুদ্ধের অঙ্গ ছিল, কৌটিল্য দুই-ই লাগাতেন। তাঁর কালে ইন্দ্রজাল নাম হয় নাই। ইদানীর যুদ্ধেও মায়া প্রকাশ চলছে।

আশ্চর্য ব্যাপার নানা রকমে হ'তে পারে। যেটা নূতন দেখি, যার কারণ খুজে পাই না, সেটাই আশ্চর্য। অন্যে সে ব্যাপার ঘটালে তাকে ঐন্দ্রজালিক ভাবি। বিজ্ঞানে কত শত ইন্দ্রজাল আছে, যে বারম্বার দেখেছে সেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়, যে না দেখেছে তার ত কথাই নাই। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চলে' যাওয়া, কি অঙ্গার ফাব্‌ড়া-ফাব্‌ড়ি করা,

আশ্চর্য কথা বটে, কিন্তু ভেলকি নয়, সত্য। এখানে বাঁকুড়া নগরের উপকণ্ঠে একুতেশ্বর শিবের গাজনে প্রায় প্রতিবর্ষে অগ্নি-সন্ন্যাসীকে আগুনের উপর চলতে দেখা যায়।* আমি পুরীতে এক কুন্‌বী বামুনকে (মাদ্রাজের) কচ্-কচ করে কাচ চিবিয়ে খেতে, লোহার পেরেক গিলতে দেখেছি। সে সাপ খেতে পারে, বিষও খেতে পারে, কিন্তু কে এই মারাত্মক পরীক্ষা করতে চাইবে। একবার আমার গ্রামের বাড়ীতে সকাল বেলায় এক পশ্চিমা ও তার স্ত্রী সাত-আট বছরের এক সিপ্-সিপে' লেঙ্গটি-পরা মেয়েকে দিয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়েছিল। মেয়েটি চোখ মুদে যোগাসনে এক আঁঠুর নীচে ছোরার ডগায় বসেছিল, এক মিনিট হবে। প্রথমে তিন স্থানে তিনটি ছোরা ছিল, পরে দুটা খসিয়ে নেয়। ছোরার অগ্রস্পর্শ নাম মাত্র। কোথায় বা মাধ্যাকর্ষণ, কোথায় বা ভারকেন্দ্র! হস্ত-লাঘব নয়, ইন্দ্রজালও নয়। যোগের লঘিমা কিনা, জানি না। সে এই একটি বিদ্যা জানত। কেহ কেহ পাকা দোতলার ঘরে সাপ দেখায়। হস্ত-লাঘব নয়, যোগও নয়, মায়া বলতে হয়। মনসার ঝাঁপানে দুই দলের মায়া পরীক্ষা হ'ত, বহু লোকের মুখে শুনেছি। এক দলের গুনিন অন্য দলের গুনিনের

---

* রোগ-পীড়িত হয়ে লোকে মানসিক করে। কেহ বিশ হাত, কেহ দশ হাত মানসিক করে। রোগমুক্ত হ'লে শিবের মাড়োতে এসে অঙ্গনে চুলী কেটে অঙ্গারের আগ ন করে। চুলীর দুই দিকে পুকুরের গুঁড়া শেঅলা (যে শেঅলা দিয়ে গুড় হ'তে দলুয়া করা হয়) ও এক গর্তে কলাপাতা দিয়ে দুধ রাখে। দুধে পা ভিজিয়ে শেঅলায় দাঁড়িয়ে গন্‌গনে আগুনের উপর দিয়ে চলে' যায়। সেখানে আবার শেঅলায় ও দুধে পা দেয়, আবার আগুনের উপর দিয়ে চলে' আসে। অনেকে একেবারে বিশ হাত পারে না, দশ হাত দশ হাত দুবারে চলে। অনেকে তাও পারে না, পাঁচ হাত চলে, থামে, চলে। কেহ কেহ তাও পারে না, আড়াই হাত, চারিবার চলে' দশ হাত করে। আশ্চর্য এই, পায়ে ফোস্কা পড়ে না।

গায়ে মুড়কি ছুঁড়ে দিত, গুনিনকে ভীমরুলে কামড়াত ; ঝেঁটাকাটি ছুঁড়ে দিত, সাপ হয়ে আক্রমণ করত।* কিন্তু দুই-ই মিথ্যা। শুনলে বিশ্বাস হয় না। দেখলেও হ'ত না। আত্মারাম-সরকার মায়াবিদ্যায় প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি একালের সম্বর-সিদ্ধ ছিলেন। একবার আমাদের গ্রামে এক বিদেশী মায়িক খেলা দেখাতে এসেছিল। লোকে দেখছে, শূন্যে দোড়ী ঝুলছে, এক ছোকরা দোড়ী বেয়ে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় গুনিনের মুখ শুখিয়ে গেল, খেলা বন্ধ হ'ল। পরে জানা গেল সেখানে আত্মারাম-সরকারের এক শিষ্য ছিল, গুরুকে নমস্কার করলে না দেখে, গুনিনকে অপদস্থ করেছিল। আমি দেখিনি, কিন্তু অবিশ্বাসও করি না। কারণ যা দেখেছি, যা শুনেছি, তা না-কে হাঁ-করাই বটে। "রত্নাবলী" নাটকের ঐন্দ্রজালিক রাজার অন্তঃপুর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, একজন নয় চারি পাঁচ জন আগুন ও ধুঁআ দেখেছিল। বিদ্যাপতি তাঁর "পুরুষপরীক্ষা"য় ইন্দ্রজালে মেঘ ও কুক্কুট-যুদ্ধ দেখিয়েছেন। ইদানী ইন্দ্রজাল-বিদ্যা লোপ পাচ্ছে। এখন ভোজ-বিদ্যা ও ভানুমতী-বিদ্যার দুই সম্প্রদায় আছে। প্রত্যেকের একটি একটি খেলাই, সে বিদ্যা। আর যে সব, সে সবের কোনটা হস্তলাঘব, কোনটা কৈতব। দক্ষিণের নিজাম হাইদারাবাদে এক সম্প্রদায় ভোজ-বিদ্যা দেখায়, জালে-বাঁধা পেঁড়ায়-পোরা বালককে অদৃশ্য করায়। মধ্যভারতে এক সম্প্রদায় ভানুমতী-বিদ্যা দেখায়, আমের আঁঠি পুঁতে গাছ করে' আম ফলায়।

ভোজ-বিদ্যার দেশে সে বিদ্যা যে গল্পের বস্তু হবে, তাতে আশ্চর্য কি ? শুক-বিলাসের কাহিনী বলি। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সভায় প্রিয় মন্ত্রী-স্বরূপ শুককে জিজ্ঞাসলেন "এখন রাণী ভানুমতী কি

---

* ১৩৩৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মেদিনীপুরের ঝাঁপানের বর্ণনায় এইরূপ কথা আছে।

করছেন ?" "রাণী বিনা স্থতায় হার গাঁথছেন।" রাজা অন্দরে লোক পাঠিয়ে জানলেন, তাই বটে। তিনি পুনরপি জিজ্ঞাসলেন "হার গাঁথবার কারণ কি ?" শুক বললে, "আজ রাত্রে ভানুমতীর ভগিনী তিলোত্তমার বিবাহ, ভানুমতী বরের গলায় হার পরিয়ে দেবেন।" রাজা ও সভাজন শুনে অবাক্, উজ্জয়িনী হ'তে ভোজপুরী মাসেকের পথ, রাণীর যাওয়া যে অসম্ভব। "দুই ডাকিনী গাছ চালিয়ে ভানুমতীকে নিতে আসবে।" রাজা রাত্রে শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করে' মটকা মেরে শুয়ে রইলেন। রাজা ঘুমিয়েছেন ভেবে ভানুমতী অন্য ঘরে হার আনতে গেলেন, রাজা চুপি চুপি গাছের এক ডালে চড়ে' বসলেন। পরে ভানুমতী গাছের যথাস্থানে বসলেন, গাছও নিমেষে ভোজপুরের অন্দরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াল। রাণী ভিতরে গেলেন। রাজা অতঃপর কি করবেন, ভাবছেন, এমন সময় মল্ল-অধিপতি ভূরিমল্লের পুত্র বর-বেশে রাজ-ভবনে আসছিলেন।* বিক্রমাদিত্য বরযাত্রীর দলে মিশে যাবার বুদ্ধি করলেন। কিন্তু সে বুদ্ধি ঘ'টল না, বরযাত্রীরা মারতে গেল। মল্ল-অধিপতি বিবাদ মিটাতে গিয়ে বললেন, "বাপু, এক কাজ করতে পার ? আমার পুত্র, কুৎসিত, কুব্জ। তাকে দেখলে ভোজরাজা কন্যা দিবেন না। তুমি বর-বেশে চল, বিবাহ হয়ে গেলে, রা'ত থাকতে চলে' যাবে, তখন আমি বউ নিয়ে দেশে চলে' যাব।" রাজা সম্মত। বরের রূপ দেখে সবার আহ্লাদ। বিবাহ হ'ল। বাসর-ঘরে ভানুমতী ভগিনীপতির সহিত কৌতুক করলেন। রা'ত থাকতে রাজা হারটি নিয়ে গাছে চড়ে' বসলেন, ভানুমতী পরে এলেন, গাছ চলল। উজ্জয়িনীর রাজপুরীতে এসে রাণী বস্ত্র পরিবর্তন করতে গেলেন, সেই অবসরে রাজা নিজের ঘরে শয্যায় শুয়ে পড়লেন। রাণী দেখলেন,

---

* ভূরিমল্ল কি বিষ্ণুপুরের রাজা বীরমল্ল ?

রাজা ঘুমাচ্ছেন। রাজা বাসর-ঘর হ'তে চলে' আসবার সময় তিলোত্তমাকে বলেছিলেন, "দেখ, আমি বর নই, তোমার বর ভোরবেলায় আসবে।" ভোর হ'লে কুব্জ বাসর-ঘরে ঢুকবার উপক্রম করলে। তিলোত্তমা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ঘরের ওল-তলায় ফেলে দিলে। সে কেঁদে উঠল। মল্ল-ভূপতি ভোজের কাছে তার তনয়ার অত্যাচারের প্রতিকার চাইলেন, মেরে পিঠে কুব্জ করে' দিয়েছে! ভোজরাজ কন্যাকে জিজ্ঞাসলেন। সে বললে, "এই কুব্জের সঙ্গে বিবাহ হয়নি, বর চলে' গেছেন।" এই কলহের বিচার কে করে? অগত্যা দুই রাজা কন্যা ও পুত্রসহ উজ্জয়িনীতে গিয়ে বিক্রমাদিত্যকে বিচার করতে বললেন। বিক্রমাদিত্য সুযোগ পেলেন, শ্বশুরকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করলেন, "কন্যার বিবাহ দিলে, মোরে নাই নিমন্ত্রিলে, কহ রাজা কিসের কারণ। এক ঘোড়া বড় আর, কি ক্ষতি হইল তোমার, ভয় হৈল করিতে বরণ॥" * তিলোত্তমাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। "শুনি তিলোত্তমা কয়, ও পতি কখন নয়, কুব্জ ও কুচ্ছিত অতিশয়। বিবাহ করিল যেই, পরম সুন্দর সেই, তনু তার অতি রসময়॥" কিছু নিশান আছে? রাজা নিজেই বিনা সূতার হার দেখালেন, সব প্রকাশ হয়ে পড়ল। ভানুমতীর লজ্জার সীমা রইল না।

ভানুমতীর এই গাছ-চালার গল্প আরও কোথায় আছে। কিন্তু গাছ-চালা ডাকিনী-বিদ্যা। যেখানে যত অ-চেনা গাছ আছে, সে সব অ-জানা দেশ হ'তে ডাকিনীর আনা। যেতে যেতে রাত পুইয়ে গেছল, গাছ রয়ে গেছে। ডাকিনী-বিদ্যা ইন্দ্রজাল নয়। আমি যে গল্প শুনেছি

---

* অর্থাৎ "জামাই বরণ করতে একটা ঘোড়া দিতে হ'ত, সেটা আর বড় কথা কি।" শত বৎসর পূর্বে গাঁয়ে গাঁয়ে দল-টাটু দেখা যেত। এখন শহরেও ঘোড়-সওয়ার দেখতে পাই না। মোটরের কল্যাণে রথের অশ্বও অদৃশ্য হচ্ছে।

সেটা আশ্চর্য ইন্দ্রজাল। রাজা বিক্রমাদিত্য চরমুখে শুনলেন, ভোজরাজা তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ভানুমতীর স্বয়ংবরে বিবাহ দিবেন, কিন্তু কি কারণে বিক্রমকে নিমন্ত্রণ করলেন না। ইতিপূর্বে ভোজের জ্যেষ্ঠা কন্যা তিলোত্তমার সহিত বিবাহ হয়েছে। রাজা মৃগয়া-ছলে তিলোত্তমাকে না জানিয়ে ভোজপুরের দিকে যাত্রা করলেন, এবং যথাদিবসে ছদ্মবেশে ছদ্মনামে ভোজ-সভায় উপস্থিত হ'লেন। নানা দেশের অনেক রাজপুত্র এসেছেন, বিক্রমও তাঁদের কাছে বসলেন। অপরাহ্ণ হ'ল, ভোজরাজা ভানুমতীকে সভায় আসতে বললেন। কিন্তু এক ভানুমতী নয়, শত ভানুমতী! সকলের এক রূপ, এক বেশ, এক চলন, এক ভঙ্গি! ভোজ বললেন, যিনি ভানুমতীর গলে মালা দিবেন তিনিই কন্যা পাবেন। রাজপুত্রেরা কন্যা নিরীক্ষণ করে, পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে। বিক্রম বিহ্বল হয়ে বেতালকে স্মরণ করলেন। এই সঙ্কেত হ'ল, বেতাল যার মুখের কাছে ভ্রমরগুঞ্জন করবে, সে-ই ভানুমতী। এখন আর চিন্তা নাই। বিক্রম ভানুমতীর গলায় মালা দিলেন, তৎক্ষণাৎ অপর উনশত ভানুমতী অদৃশ্য!

রাজপুত্রেরা অধোবদন হয়ে স্ব স্ব দেশে যাত্রা করলেন। ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিক্রমের সহিত ভানুমতীর বিবাহ হ'ল। রাত্রি হ'লে তিলোত্তমা দাস-দাসীর অগোচরে গাছ চালিয়ে ভোজপুরীতে এলেন, বরের সহিত হাসি-তামাসা করলেন, রাত্রি-শেষে ফিরে গেলেন। পরদিন প্রাতে বিক্রম স্বীয় পরিচয় দিলেন, তাঁর মৃগয়ার অনুচরেরা এসে জুটল। বর-কন্যা বিদায় হ'লেন। ভোজের দুই প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ছিল, কুব্জ ও কুব্জী। ভানুমতী সে দু জনকে যৌতুক চেয়ে নিলেন। কিন্তু রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হ'লেন। রাজ-মহিষীর দাস-দাসী কিনা কুব্জ ও কুব্জী! ভানুমতীর ইঙ্গিতে কুব্জ কুব্জী রথে চ'ড়ে বসল, রাজা রথ চালাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কুব্জ কুব্জীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তিনি চটে' উঠেন,

কিন্তু ভানুমতীর ভয়ে কিছু বলতে পারেন না। কুব্জ কুব্জী বুঝতে পারলে, রাজা তা-দিকে সামান্য লোক মনে করেছেন, শিক্ষা দিতে হবে। ভানুমতী সম্মত হ'লেন। বেলা এক প্রহর। রাজা দেখলেন, চতুরঙ্গ দলে পূর্ব দিনের মনোহত রাজপুত্রেরা যুদ্ধং দেহি করতে করতে তাঁর পথ ঘিরে দাঁড়িয়ে। রাজার সেনার সহিত ঘোর যুদ্ধ। সে যুদ্ধে রাজার যাবতীয় সেনা, সেনা-নায়ক হত হ'ল। তিনিও যুদ্ধ করলেন, তাঁর তূণীরের শর ফুরিয়ে গেল। তখন হতাশ হয়ে শোকে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। কুব্জ বললে, "মহারাজ, একি, কাঁদছেন কেন? বিবাহের পরদিন কান্না? এমন অমঙ্গল কর্ম করবেন না।" এই উপহাসে রাজার শোক দ্বিগুণ উথলে উঠল। চোখ মুছলে দেখেন, কোথাও কিছু নাই, পথে জনমানব নাই! তাঁর নিক্ষিপ্ত শর পথে ছড়িয়ে আছে, অনুচরেরা পেছুতে বহুদূরে আসছে। তাঁর এমন ভ্রম কখন হয়নি। তিনি লজ্জায় হেটমুখ হ'লেন। কুব্জ কুব্জী বুঝলে, শিক্ষা হয় নাই, আরও কিছু চাই। মধ্যাহ্ন হ'ল, স্নানের সময়। রাজা দেখলেন এক রমণীয় সরোবর, কত জলচর বিহঙ্গ, কত পদ্ম ও সুঁদী শোভা পাচ্ছে। তিনি রথ থামিয়ে, জলে অবগাহন করতে গেলেন, জলে নামতেই তাঁর অঙ্গ রক্তাক্ত হ'তে লাগল। ভাবছেন, কি আশ্চর্য। এমন সময় কুব্জ বললে, "মহারাজ, করছেন কি? শরবনে এ কি করছেন?" রাজা দেখলেন, সত্যই ত শরবন! তিনি সসাগরা পৃথিবীর মহারাজাধিরাজ, ভোজরাজ যাঁর এক সামান্য সামন্ত ভূপ। তাঁর কন্যা রাজার বুদ্ধির পরিচয় পেলেন! কুব্জ কুব্জীও উপহাস করলে! তিলোত্তমাও শুনতে পাবেন! সন্ধ্যার সময় উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হ'লেন। তিলোত্তমা শুনলেন, রাজার মৃগয়া নয়, বিবাহ-যাত্রা। তাঁর অভিমান হ'ল। কিন্তু ভগিনীকে দেখে, যার বিবাহে তিনিও বরের সহিত হাস্য পরিহাস করেছেন, তাঁর অভিমান আহ্লাদে মিশিয়ে গেল। রাজা কুব্জ কুব্জীকে দাস দাসীর ঘর দেখিয়ে

দিলেন। ভানুমতী বললেন, তা হবে না, তারা তাঁর আবাসের পাশে থাকবে, কুব্জ সভায় গিয়ে বসবে। রাজা চটে' আগুন। পথে যা হবার হয়েছে, এখানে এত আদর চলবে না। আবার মন্ত্রণা হ'ল, রাজার শিক্ষা হয়নি। পরদিন রাজা সভায় বসেছেন, পাত্র-মিত্র-সভাসদ সকলে বসেছেন, সভা গম্-গম্ করছে, এমন সময় এক বৃহৎ অশ্বে এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে সমুখে বসিয়ে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত এক বীর এসে বললেন, "মহারাজার জয় হউক। আপনার যশঃ-কীর্তি ন্যায়-বিবেক ও ধর্ম-বুদ্ধি অবগত হয়ে আপনার নিকট এক প্রার্থনা করতে এসেছি। আমি পৃথিবী ঘুরে এলাম, একজন বিশ্বাসী রাজা দেখতে পেলাম না, যাঁর আশ্রয়ে আমার এই বনিতাকে একদিনের নিমিত্তে রাখতে পারি। ইন্দ্র আমায় যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তাঁর দর্প অবশ্য চূর্ণ করব। আপনি দয়া করে' আমার বনিতাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিন।" সভাসহ রাজা বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'লেও তথাস্তু বলে' যুবতীকে অন্দরে পাঠিয়ে দিলেন। "আপনার কোন চিন্তা নাই, দেবী তিলোত্তমা স্বয়ং ওঁর তত্ত্বাবধান করবেন।" "মহারাজার জয় হউক," এই বলে' অশ্বারূঢ়-শূর শূন্যমার্গে অন্তর্হিত হ'লেন। রাজা ও সভাজন অবাক্ হয়ে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বিস্ময় লঘু হ'তে না হ'তে অশ্বের এক কাটা পা সভার সমুখে পড়ল। কি কি করতে না করতে আর এক পা, ক্রমে শূরের রক্তাক্ত বাঁ হাত, ডা'ন হাত, মাথা ধড় পড়ল! এতক্ষণে পাত্রমিত্রের মুখে কথা ফুটল। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ! উন্মাদগ্রস্তই বটে! সভায় ঘোর কোলাহল। সে কল-কল শব্দ অন্দরে পঁহুছিল। "কি হ'ল, কি হ'ল" আর্তনাদ করে' যুবতী ছিন্ন দেহের উপরে লুটিয়ে পড়ল। কিয়ৎকাল পরে শোক সম্বরণ করে' যুবতী রাজাকে সহমরণের ব্যবস্থা করে' দিতে বললেন। তা ত অবশ্য কর্তব্য। নগর-প্রান্তে সহমরণ হয়ে গেল। সভাজন ও পুরবাসী এক দুঃস্বপ্ন বোধ করতে লাগলেন। এমন সময় আকাশে অশ্বের হ্রেষণ

শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বীর সভায় নেমে এলেন। "মহারাজার জয় হউক। ইন্দ্রের রণ-বাসনা মিটিয়ে এসেছি। এখন অনুমতি করুন, বনিতাকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করি।" সভায় বজ্রাঘাত হ'ল, সকলে অধোমুখে নিঃশব্দ। "মহারাজ, বিলম্ব করবেন না, অনুমতি করুন। আপনার দয়া ও দাক্ষিণ্য জগদ্‌বিখ্যাত। আপনার ন্যায় ধর্মবীর অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদি প্রত্যুপকার গ্রহণ করেন আমি যথাসাধ্য নিশ্চয় সম্পাদন করব। আমার বনিতাকে ডাকতে পাঠান। আমি ক্লান্ত হয়েছি।" "একি সকলে নীরব কেন ? মহারাজ, আপনি নীরব কেন ?" রাজা বজ্রাঘাত আর সইতে না পেরে সহমরণ পর্যন্ত সব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বললেন। অশ্বারোহী শুনে হা-হা-হা হাস্য করে' বললেন, "মহারাজ, আমি অনেক জনপদ, অনেক রাজপুরী দেখেছি, এমন বাতুলপুরী কোথাও দেখিনি। আমি যুদ্ধে হত হয়েছি! অহো সভাজনকে ধিক্, আপনার ধর্মবুদ্ধিকে ধিক্। আমার বনিতাকে অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখে আপনি বলছেন, তিনি সহমৃতা হয়েছেন!" রাজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। "অন্তঃপুরে রয়েছেন, আপনি যেয়ে দেখুন।" "মঞ্জুলা এস, এই অবিশ্বাসী রাজার ঘরে ক্ষণকালও থাকা নয়।" যেমন আহ্বান, নূপুর গুঞ্জন করতে করতে মঞ্জুলা সভায় এসে অশ্বে আরোহণ করলেন। তৎক্ষণাৎ সব অদৃশ্য! সকলে বলতে লাগল, মহৎ আশ্চর্য মহৎ আশ্চর্য। কেবল কুব্জ ও কুব্জীর মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

পরদিন হ'তে বিক্রমাদিত্যের সভায় কুব্জের আসন পড়ল। তাঁর সভায় ঐন্দ্রজালিক ছিলেন না, নবরত্নে দশমরত্ন যুক্ত হ'ল।

কথকের গুণে এই কাহিনী চিত্তচমৎকারিণী হয়। অথচ ইন্দ্রজালের আশ্চর্য ব্যাপারে অসম্ভব কিছু নাই। কাল-মাহাত্ম্যে আশ্চর্যের দিন চলে' গেছে। মণি-মন্ত্র-ওষধির গুণ হ্রাস পেয়েছে, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য লুপ্ত হয়েছে। গ্রামে নূতন নূতন গল্পের আলম্বন আর কই ? রাজা

বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ ছিলেন, তিনি অলৌকিক কর্মও করেছিলেন। দুই একজন পিশাচ-সিদ্ধ কিছুদিন পূর্বেও ছিলেন। আমি বহুকাল পূর্বে একজনকে দেখেছিলাম, তাঁর বিদ্যার পরিচয় নেবার বুদ্ধি তখন ঘটেনি। এফ-এ পরীক্ষার পর দেশের বাড়ীতে ছিলাম। একদিন বেলা ১১টা ১২টার সময় কোথা হতে এক রুক্ষকেশ, শীর্ণ-দেহ, মলিন-বেশ লোক এসে উপস্থিত হন। গলায় পইতা দেখে বসতে আসন দেখিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই আসনে বসলেন না, মাটিতে বসলেন, কি অভিপ্রায়ে এসেছেন তাও কিছু বললেন না। শুধু বললেন, কোন বিদ্যা জানি, চিন্তা নাই। আমি ইতিহাসে কাঁচা ছিলাম, মাঝে মাঝে এই নিয়ে চিন্তা হ'ত। তিনি একটু পরেই উঠে চলে' গেলেন, অর্থ কি ভোজ্য প্রার্থনা করলেন না। আমার পাশে গ্রামের একজন ছিলেন, তিনি উঠে বাইরে খুজে এলেন, দেখতে পেলেন না। ইনি পিশাচ-সিদ্ধের লক্ষণ জানতেন। সিদ্ধেরা সর্বদা শঙ্কিত মাটি-ছাড়া কখনও থাকেন না। আমাদের গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পিশাচ-সিদ্ধ ছিলেন। তিনি ফাঁড়িদারি কর্ম করতেন, রাত্রে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতেন। নদীতে প্রবল বন্যা, খেয়া বন্ধ; ফাঁড়িদার খড়ম পায়ে দিয়ে নদী পেরিয়ে যেতেন। অনেকদিন পরে কটকে এক পিশাচ-সিদ্ধের অলৌকিক শক্তির গল্প শুনি। এক প্রৌঢ় ডেপুটি বলেছিলেন। তিনি পুরীতে ছিলেন, সন্ধ্যার পর আটদশ জন বন্ধু জুটেছিলেন। এমন সময় একজন এসে কিছু বিদ্যা জানি বলে' পরিচয় দিলে। পুরীতে পান কিছু দুষ্প্রাপ্য। এঁরা পান চাইলেন। একখানি বস্ত্র দ্বারা ঘর বিভক্ত করা হ'ল। সিদ্ধ ভিতরে ঢুকলেন, আর, কোথা হ'তে এক থালা পান সুপারী মসলা তাঁদের সামনে উপস্থিত হ'ল। ডেপুটি বাবুর পরিবার সে পান মসলা দুতিন দিন ধরে' খেয়েছিলেন।

যোগী ও সিদ্ধ পুরুষ দেখতে পাই না। যাঁরা আছেন তাঁরা ভক্তের

নিকটেই দর্শন দেন। ভক্তেরা গুরুর মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন না। এখানে শুনি, ভদ্রঘরের এক বিধবা আজ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কিছুমাত্র পানাহার না করে' কাল কাটাচ্ছেন। গৃহস্থালির সকল কর্ম করেন। অনেকে চরকর্ম করে'ও তাঁকে কখনও কিছু খেতে দেখেন নি, জলও না।*

গ্রামে আর কবি নাই, ভাবুক নাই। গল্প বাঁধবার লোক নাই। কিন্তু এখনও রোমাঞ্চন লিখবার উপাদান আছে। কত রাজার গড় আছে, অসুরের কীর্তিও আছে, বড় বড় দীঘি ও বড় বড় পাথর। কিছুদিন পরে কিম্বদন্তীও থাকবে না। † বাঁধনি না পেলে কিম্বদন্তী স্থায়ী হয় না। এখন যাঁরা গল্প লিখছেন, তাঁরা ইংরেজী-পড়া, অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না। ইংরেজী-পড়া পাঠকও করেন না। বিজ্ঞানের প্রবল বন্যায় হাথীও থল পায় না, হাবু-ডুবু খেয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। যৌবন-কালে 'রাসেলাসে"র কাহিনী পড়বার সময় মনে হ'ত, যদি মানুষ সত্য সত্য উড়তে পারে, তা'হলে অন্তঃপুরের 'অন্তঃ' কাটা যাবে, লোককে লোহার জাল দিয়ে ছাদ ঘিরতে হবে। এখন গ্রাম্যজনও দেখছে, পক্ষী-যান মাথার উপর দিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আদি, বীর, করুণ ও অদ্ভুত রস, এই চারি রস নিয়ে কাহিনী। কিন্তু বীর ও অদ্ভুত রস মনকে সহজে মুগ্ধ করে। এই দুই রসের বস্তু দুষ্প্রাপ্যও বটে। সংসারে অন্য দুই রসের অভাব নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে আদিরসের পরাকাষ্ঠা হয়ে গেছে। তার উপরে উঠা সোজা নয়। এখন করুণরস একমাত্র

* এই বিধবার নিবাস বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাসের দিকে। বার্তাপত্রেও এঁর সম্বন্ধে একবার কিছু বেরিয়েছিল। এখন শীর্ণ হয়ে গেছেন। কিন্তু কর্মে অপটু হন নাই। বর্তমান বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর। নাম, দে-জাতা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

† বেত্রগড়ে (গড়বেতায়) বকদ্বীপের বকাসুরের হাড় আছে। অনেক দিন হ'ল, সে বৃহৎ হাড়ের এক টুকরা পেয়েছিলাম। কুড়াল দিয়ে কাটতে হয়েছিল। হাড়খানি শিলাভূত বৃক্ষস্কন্ধ।

রসে ঠেকেছে। নানা কারণে গল্পকের বহির্মুখ শূন্য, যা কিছু কৃতিত্ব অন্তর্মুখে। এই কারণে গল্প-রচনা ভারি কঠিন হয়েছে।

গল্প হ'তে দেশের আচার ব্যবহার জানতে পারা যায়। মনের গতিও বুঝতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখ এই, দেখতে বসলেই গল্পের রস শুখিয়ে কাঠ হয়ে যায়। ব্যবচ্ছেদ কর্মটাই নিষ্ঠুর, মধু-র কি, ফুলেরই বা কি? ব্যবচ্ছেদে মধু-র মিষ্টতা নষ্ট হয়, ফুলের শোভা নষ্ট হয়। কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা করতে দেখলেই কবির তরে দুঃখ হয়, সেটা যে কবিকে ব্যবচ্ছেদ। পুরাতন কাব্যের দীর্ঘ ব্যাখ্যা আবশ্যক হ'তে পারে, কিন্তু পাঠকের সমকালীন কাব্যের রস-ব্যাখ্যা করলে তাঁকে রসাস্বাদ হ'তে বঞ্চিত করা হয়। পরের মুখে ঝাল খেলে তৃপ্তি হয় কি?

বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা

১। প্রথম কর্তব্য

এককালে আশা ছিল, বাংলা ভাষা ভারতরাষ্ট্র-ভাষা হইতে পারিবে। ক্রমশঃ সে আশা নির্মূল হইয়াছে। বাঙ্গালী উদাসীন না হইলে হিন্দীর বিরুদ্ধে লড়িতে পারিত। হিন্দী-ভাষীর সংখ্যাধিক্য, এই একটি গুণ ছিল। বাংলা-ভাষী দ্বিতীয় স্থান পাইত। আর, বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার বহু যোগ্যতা ছিল। ইহার সোজা ব্যাকরণ, ইহার প্রচুর সংস্কৃতসম শব্দ, ইহার বিপুল সমৃদ্ধ সাহিত্য হিন্দী-ভাষার নাই। অনেক

বাংলা পুস্তক হিন্দী ভাষান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীর তুলসীদাসী রামায়ণ ব্যতীত আর কোন পুস্তক বাংলা ভাষান্তরিত হয় নাই।

বাংলা অক্ষরশিক্ষা কঠিন না হইলে ভাল ভাল বাংলা বই অন্য প্রদেশে প্রচারিত হইতে পারিত। শুনিতেছি, "বিশ্বভারতী" রবীন্দ্রনাথের পুস্তক নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছে। ইহা উত্তম কল্পনা। যদি কোন বঙ্গভাষা-হিতৈষী গ্রন্থপ্রকাশক বাংলা উত্তম সাহিত্যের অন্যান্য বই নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করেন, বাংলা ভাষার প্রসার হইতে পারিবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বিষবৃক্ষ, মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস, স্বামী বিবেকানন্দের "যোগ" ও বক্তৃতা, শরৎচন্দ্রের দুই-একখানা বই নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে পারিলে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর পড়িবার সুবিধা হইবে। এই সকল বই সংক্ষেপ করিয়া লইতে হইবে এবং আবশ্যকস্থলে বাংলা শব্দের অর্থ লিখিয়া দিতে হইবে। বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক আছে কিনা জানি না। পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক চলিবে না। যিনি সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু কিংবা ইংরেজী জানেন তিনি বই পড়িয়া যাহাতে নিজে নিজে বাংলা শিখিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে বই লিখিতে হইবে। বাংলা অক্ষর পরিচয়, বাংলা পাঠ ও বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ, এই কয়েকটি বিষয় লইয়া একখানি বই, আর, সংস্কৃত শব্দ না দিয়া কেবল বাংলা শব্দের একখানি ছোট কোশ চাই। আমি জানি, বর্তমানে এইরূপ পুস্তক না থাকিলেও অন্য প্রদেশবাসী বাংলা শিখিয়া বাংলা বই পড়িয়া থাকেন। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষেও এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে। দুঃখের বিষয়, বাংলা মুদ্রাকরেরা এখনও সেই পুরাতন যুক্ত-ব্যঞ্জনাক্ষর চালাইতেছেন। কলিকাতায় বাংলা-প্রসার-সমিতি আছেন। তাহাঁরা সচেষ্ট হইলে বাংলা ভাষা-প্রচার কঠিন হইবে না। অন্যপ্রদেশবাসী দেখিলে বাঙ্গালী

হিন্দীতে কথা কহিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যবহারের দোষ আছে। ইহা দ্বারা বাংলা-প্রচার ব্যাহত হইতেছে। অন্যপ্রদেশবাসীর সহিত বাংলায় কথা কহা উচিত।

২। বাংলা ভাষার স্বরূপ-রক্ষা

ইহার পর অন্য কর্তব্য আছে। যে যে গুণ হেতু ভারতে বাংলা ভাষার আদর হইয়াছে, যাহাতে সে সে গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাংলা ভাষার স্বরূপ পরিবর্তিত না হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের সর্বদা অবহিত থাকা উচিত। এক্ষণে বাঙ্গালী দুর্বল, অন্যপ্রদেশে নগণ্য। একমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর পূর্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারিবে।

বর্ষে বর্ষে নানাবিধ বাংলা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, বারমাসিক পুস্তক (Magazine) ও সামিতিক পুস্তক, এই ত্রিবিধ পত্র ও পুস্তক বর্তমানে ৩৬৯ খানি প্রচারিত হইতেছে। ভারত-পরিষদের এক প্রশ্নের উত্তর হইতে এই সংখ্যা জানিতেছি। বোধহয় বর্তমানে বাংলা-লেখক দেড় হাজার, দুই হাজার হইবেন। সমিতি-বিশেষ দ্বারা প্রচারিত পুস্তক অতি অল্প। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিজ্ঞান পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক পুস্তক ও এইরূপ অন্যান্য পুস্তককে আমি সামিতিক পুস্তক বলিতেছি। ইহাদের পাঠক সংখ্যা অল্প। সংবাদপত্র অবশ্য পত্র, বাঁধা পুস্তক নয়। বারমাসিক পুস্তক (স°বার—সমূহ ; সমূহের নিমিত্ত মাসিক পুস্তক) বদ্ধ পত্র। এই কারণে আমি ইহাকে পুস্তক বলিতেছি। সংবাদপত্র ও বারমাসিক পুস্তক দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারিত হইতেছে। এমন বিষয় নাই যাহা বাংলা ভাষা দ্বারা জনসাধারণের

নিকট প্রচারিত হয় না। বাংলা গল্পের বই অগণ্য। প্রতি বৎসর নূতন নূতন গল্পের বই ছাপা হইতেছে।

বর্তমান লেখকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত। কেহ কেহ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রবীণ ; কেহ বা সর্বদা ইংরেজী সাহিত্য, সংবাদপত্র, বার-মাসিক ইত্যাদি পড়িয়া থাকেন। ইহাঁদের বাংলা শিক্ষার অবসর হয় না। কেহ বা বাল্যকালে সংস্কৃত ভাষা অল্প শিখিয়াছিলেন, এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন ভাবেন নাই। এইরূপ স্থলে তাহাঁদের রচনায় ইংরেজীর অনুকরণ আসা বিচিত্র নয়। শব্দ বাংলা, কিন্তু প্রকাশ বাংলা নয়। উদাহরণ দিতেছি।

ভদ্রতা শিক্ষার উপর 'নির্ভর করে'। পরিশ্রমের উপর সাফল্য 'নির্ভর করে'।

আপনার উপস্থিতি 'প্রার্থনীয়'।

বৌদ্ধ যুগে নারীর 'স্থান'। শিশুশিক্ষায় শিল্পের 'স্থান'। এম-এ পরীক্ষায় প্রথম 'স্থান' অধিকার করিয়াছে।

হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্মের 'দান'। বাংলা সাহিত্যে ইসলাম সংস্কৃতির 'দান'।

সভার কার্য 'সাফল্যমণ্ডিত করিবেন'।

'ভাষার কার্য হইতেছে মনের ভাব প্রকাশ করা'।

আচার্য যদুনাথ সরকারের বয়স ৭৮ বৎসর 'পূর্ণ হওয়ায়' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'পক্ষ হইতে' তাহাঁকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। 'এই উপলক্ষ্যে' আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা 'সমবেদনা জানাইতেছি'।

মাতৃভাষার 'মাধ্যমে' শিক্ষা দান।

'দৃষ্টিকোণ' পরিবর্তন করিতে হইবে। মাতৃভাষা শিক্ষার 'বাহন'।

'কাজে যোগদান, গানে যোগদান, প্রার্থনায় যোগদান'। ইত্যাদি।

মনে মনে এই সকল বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ না করিলে অর্থবোধ হয় না। এই সকল উদাহরণের বাক্যের ভাব বাংলা ভাষায় অক্লেশে প্রকাশ করিতে পারা যায়। এইরূপ বাক্য বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে না।

কেহ কেহ ঋজু পথে চলিতে পারেন না। ঋজু ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তাহাঁদের ভাষা জটিল হইয়া পড়ে। কেহ বা বাগ্‌ভঙ্গি না করিয়া, কেহ বা একই বিষয় ঘুরাইয়া পাঠককে অকারণ কষ্ট না দিয়া লিখিতে পারেন না। ইংরেজী সংবাদপত্রের ভাষা ফাঁপা। বাংলা সংবাদপত্রেও তাহার অনুকরণ ঘটিতেছে। কিন্তু যিনি যাহাই লিখুন রচনায় প্রসাদগুণ ও মাধুর্য না থাকিলে পাঠক পড়িতে ইচ্ছা করেন না।

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি॥"

বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ এখানে স্পষ্ট হইয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও এইরূপ। আরও পুরাতন বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমন মধুর। ইংরেজী আমলেও প্রথম প্রথম বাংলা ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল পদ্যের ভাষা নয়, গদ্যের ভাষাও বাংলা ছিল। সেকালের সংবাদপত্রের ও পত্রপ্রেরকদিগের ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল 'সীতার বনবাস' লেখেন নাই। তিনি 'কথামালা' লিখিয়াছিলেন। বালপাঠ্য পুস্তকে কথামালার ভাষার লালিত্য কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় নানাবিধ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কয়খানি ইতিহাসের ভাষায় মাধুর্য আছে? কালীসিংহের মহাভারত পড়ুন, তাহাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য ও লালিত্য কয়খানা বাংলা ইতিহাসের বইতে আছে?

কেহ কেহ মনে করেন, রচনায় মৌখিক ভাষার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বর্ণনার বিষয় অতিশয় সুবোধ্য হয়। ইহা এক বিষম ভ্রম। হইতেছে স্থানে হচ্ছে, করিতেছে স্থানে কচ্ছে, দেখিয়াছিলাম স্থানে দেখেছিলাম, লিখিলে বাক্য সুগম হয় না। বাক্য ছোট ছোট হইলে কচ্ছে হচ্ছে কটু শোনায়, পড়িতে ইচ্ছা হয় না। "মহান্ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে"—এখানে 'গড়ে' পীড়িত করিতেছে। তদুপরি 'মহান্' প্রতিষ্ঠান শুনিলে হতাশ হইতে হয়। কেহ কেহ 'বলে চলে গেল' লিখিয়া মনে করেন ভারি সোজা ভাষা লিখিলেন। কিন্তু এই ভাষা পড়িয়া বুঝিতে হইলে অন্ততঃ দুইবার পড়িতে হয়। কেহ কেহ 'ব'লে চ'লে গেল' লিখিয়া পাঠককে সাবধান করিয়া দেন, 'বলে চলে' নয়, 'বলিয়া চলিয়া' বুঝিতে হইবে। ব ও চ এর পরে উৎকলা (') লেখার কোনও যুক্তি নাই। হইত স্থানে হ'ত, হইল স্থানে হ'ল; উৎকলা হএর পরে ঠিক বসিয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে হয়, একটি ই লুপ্ত বা গ্রস্ত। সেই নিয়মে "চ'লে ব'লে" পড়িতে হয় "চইলে বইলে"। ইহা কি পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিতের "চইল্যা বইল্যা"? করিয়া, সংক্ষেপে আমরা বলি কর্যে, 'কইর্যে' বলি না। এখানে করে' লিখিলে বুঝি য়-ফলা গ্রস্ত হইয়াছে। কবিকঙ্কণে 'রান্ধ্যা বাড়্যা' আছে। তখনকার উচ্চারণে ঠিক বানান হইয়াছে। এখন আমরা বলি, 'রেঁধে বেড়ে'। উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক বানান করি।

সেদিন "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ কর্তৃক বিতরিত" একখানা 'কথাবার্তা' নামক পত্রে 'খাদ্য পরিস্থিতি' পড়িতে-ছিলাম (১৯শে জানুয়ারী)। "অসামরিক সরবরাহ সচিব প্রদেশের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন, মাথাপিছু দু সের চালের বরাদ্দ যদি চালিয়ে যেতে হয় তবে সরকার এ বৎসর যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছেন তাহলেও পঞ্চাশ হাজার টন চাল ও গম ঘাটতি পড়বে।"

আর একখানি 'কথাবার্তা'য় (১৬ই ফেব্রুয়ারী) পড়িলাম, "সৌন্দর্য জিনিসটা স্বাস্থের ওপরই বেশী করে নির্ভর করে। আয়ত টানা টানা দুটি চোখ, সুঠাম টিকোলো একটি নাক এবং ফ্যাকাশে রকমের ফর্সা রঙের অধিকারী মানুষটিকেও ঠিক সুন্দর বলা চল্‌বে না—জ্যোতিহীন চোখের গড়ন যত ভালোই হোক সে চোখ, স্বাস্থ্যের লক্ষণযুক্ত উজ্জ্বল চোখের তুলনায় কম সুন্দর," ইত্যাদি। এইরূপ ইংরেজী-বাংলা ভাষার পাঠক সহজে পাওয়া যাইবে না। মুসলিম-লীগ-মন্ত্রিত্বকালে "জানবার কথা" নামে একখানা পত্র বিতরিত হইত। তাহার ভাষা মন্দ ছিল না; পড়িতে ও বুঝিতে পারা যাইত। তাহাতে চিত্রে একজন গ্রামবাসী স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রসূতিতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইত। কিন্তু লোকটিকে মেলেরিয়া-ভোগী, প্লীহারোগী দেখাইত। 'কথাবার্তা'য় একখানি চিত্র আছে; সে চিত্রের মর্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। এক ঘরের উঠানে এক বৈঠক হইয়াছে। এক কথক এক মুসলমানকে কি বলিতেছে। একজন উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছে। একজন ঊর্ধ্বজানু হইয়া বসিয়াছে। আর, দুইজন মারোআড়ীর একজন গা ভাঙ্গিতেছে, আর একজন বোধ হয় তাহার নিজের ধন্দা ভাবিতেছে। এক দ্বারপিণ্ডে দণ্ডায়মানা নারীও শুনিতেছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কথাবার্তার শ্রোতা পাওয়া যাইবে কি? এমন অশিষ্ট বাঙ্গালী আছে কি যে এক ভদ্রলোকের পাশে ঊর্ধ্বজানু হইয়া বসে? এখানে ভাষা দেখিতেছি, সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ ছাড়িয়া দিলাম।

অনেকদিন পূর্বে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় একবার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এক গল্প পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক গল্প নয়। গবর্মেণ্টের এক বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে, কেন তত খরচ হইয়াছে, তাহার যুক্তি দেখান হইয়াছে। প্রচারক ঠিকই বুঝিয়াছেন, গল্প না হইলে কেহ পড়িবে না। ঔষধ তিক্ত, মধুমিশ্রিত না হইলে কেহ সেবন করিবে না। কিন্তু ব্যাপারটি হাস্যকর

হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পের পরে স্বাস্থ্য-বিভাগের এক বিজ্ঞাপন আছে। অনাড়ম্বর বিজ্ঞাপন, কিন্তু কাজের হইয়াছে। "স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে অমুক ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বেঙ্গল গবর্মেণ্টের নাম গন্ধও নাই।

দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন, জ্ঞানপ্রচার করুন, কিন্তু জ্যেঠামি করিবেন না। কেহ কাহারও জ্যেঠামি সহিতে পারে না। দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা, ভাষার ভঙ্গিমা, গল্পের ছলনা পাঠকের বিরক্তি সঞ্চার করে। পাঠককে মূর্খ, নির্বোধ না ভাবিলে কেহ জ্যেঠামি করে না।

এতদিন বাংলা ভাষার বাগ্রীতি প্রসন্না ছিল। যথা—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। কিছুকাল হইতে আর দুই রীতি আবির্ভূত হইয়াছে। (১) প্রচণ্ডা। যেমন জ্বর-বিকারে রোগীর হাত-পায়ের আক্ষেপ হয়, ইহা সেইরূপ। যথা—ফুটেছিল হাড় একদা এক বাঘের গলায়। (২) প্রলীনা। যেমন অবসন্ন দেহে ক্লান্তি আসে, দেহ সোজা থাকে না, এলাইয়া পড়ে, ইহা সেইরূপ। যথা—এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, একদা।

প্রচণ্ডা ও প্রলীনা রীতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু যেখানে সেখানে প্রচণ্ডা রীতি দেখিলে রঙ্গমঞ্চে ভীমসেনের গর্জন মনে হয়। কেহ কেহ প্রলীনা রীতিতে কবিত্ব দেখিতে পান। বাস্তবিক, কবিত্ব নয়, জ্যেঠামি। যথাস্থানে যথাযোগ্য শব্দ বিন্যাস দ্বারা চিন্তা ও মনের ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে রচনা সার্থক হয় না। বাঙ্গালা দেশকে গল্পরূপ ভূত পাইয়া বসিয়াছে। গল্প নয়, কিন্তু বহির নাম গল্প রাখা হইতেছে। গীতার গল্প, চণ্ডীর গল্প, রামায়ণের গল্প, কালিদাসের গল্প, শরীরের গল্প ইত্যাদি নাম হইতে বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালী পাঠক গল্প পড়িয়া পড়িয়া তরলমতি হইয়া পড়িতেছে। যে রচনা বুঝিতে হইলে ধীরে ধীরে পড়িতে হয়, প্রত্যেক শব্দ বুঝিয়া যাইতে হয়, তাহা

পাঠকের প্রীতিকর হয় না। প্রত্যহ লঘু আহার করিলে দেহের পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়, গল্প পড়িয়া পড়িয়া পাঠকের চিত্তও তরল হয়। পরে গল্প পড়িতেও তাহার ধৈর্য্য থাকে না। গল্পলেখক কত স্থানে কত অলঙ্কার আনিয়াছেন, মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ভাষার বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু পাঠক এ সকল বিষয় লক্ষ্য করেন না। তিনি গল্পের বহির পাতা উলটাইতে থাকেন; আর, তারপর কি, তারপর কি, খুজিতে থাকেন। এক বিশেষ কারণে আমাকে এক গল্পের বই পড়িতে হইয়াছিল। লেখক মহাশয় ভাষার চাতুর্যে ও ইতিহাসজ্ঞানে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ৪।৫টি গল্পের সমষ্টি; পড়িতে দুই দিনে চারি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। সেই বই এক বি-এ পাস তরুণ দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়াছিল। গল্পের এই পরিণাম লেখক মহাশয়েরা অবগত আছেন কিনা জানি না।

বিষয় যাহাই হউক, ভাষায় ভুল থাকিলে পাঠক বিরক্ত হন। ভুল অনেক প্রকার হইতে পারে। শব্দের বানান ভুল, প্রয়োগ ভুল, অর্থ ভুল এবং বাক্যের ব্যাকরণ ভুল, বারমাসিক পুস্তকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সে রকম ভুল লেখকের পুস্তকেও ঘটে। দুই-এক খানা বারমাসিকের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কতকগুলি ভুল দেখিয়াছি। উদাহরণ দিতেছি।

সংবাদপত্র-প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা বঙ্গের সর্বত্র লৈখিক ভাষার সমতা আসিয়াছে। শব্দের বানান দ্বারা শব্দের রূপ স্থির থাকে। উচ্চারণ সর্বত্র সমান নয়, হইতে পারে না। কোথাও অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-উচ্চারণ প্রচুর, কোথাও নাই। কোথাও ড় ঢ় অক্লেশে উচ্চারিত হয়, কোথাও হয় না। সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল হইলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভাষা এক সামাজিক উপায়। ইহার একরূপতা রক্ষা না হইলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কালান্তরে অল্পে অল্পে পরিবর্তন হইলে

সামাজিক অপর ব্যবস্থার তুল্য ভাষা-ব্যবস্থাও সমাজের হিতকর হয়। শব্দের বানান হঠাৎ পরিবর্তন করিলে কিম্বা কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা গণের উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান পরিবর্তন করিলে ভাষা-বিপ্লব ঘটে। যেমন জীবজাতির পরিণাম শ্রেয়স্কর কারণ তদ্দ্বারা সে দেশ ও কালের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তেমন ভাষার হয়, ভাষার যাবতীয় অঙ্গেরও হয়। ব্যাকরণ ভাষার পরিণাম স্বীকার করিবেন, কিন্তু বিবর্তন স্বীকার করিবেন না। ব্যাকরণ পরিণামের সূত্র রচনা করিবেন, ভাষার রূপ বাঁধিয়া দিবেন, কোশে সে সূত্র অনুযায়ী শব্দের বানান, অর্থ, প্রয়োগ পাওয়া যাইবে। কদাচিৎ বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া এই তিনেরই ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু সাধারণতঃ ভাষাকে রক্ষণশীল হইতেই হইবে।

এতকাল জানিতাম, ক বর্গের অনুনাসিক ঙ, চ বর্গের ঞ, ট বর্গের ণ, ত বর্গের ন, প বর্গের ম, এবং য র ল ব শ স ষ হ, এই আট অবর্গ বর্ণের অনুনাসিক ং (অনুস্বার)। এখন দেখিতেছি, অনুনাসিক ঙ স্থানে ং লেখা হইতেছে। পূর্বে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে কোন কোন শব্দে ং লেখা হইত। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে আমি একখানা বইতে 'সংখ্যক' লিখিয়াছিলাম। মুদ্রাকর আমার বানান কাটিয়া 'সঙ্খ্যক' করিয়াছিলেন। তৎকালে সংখ্যা, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংক্ষেপ বা সংক্রান্তি ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি শব্দে ং দেখা যাইত। সংস্কৃত পুস্তকে ক বর্গের পূর্বে একটা শব্দেও থাকিত না। এখনও থাকে না। পাঁচ-সাত বৎসর হইতে নব্য লেখকেরা অনুনাসিক ঙ বর্জন করিয়া সকল শব্দেই ং লিখিতেছেন। শংকা, কলংক, মংগল, সংগীত, সংঘ ইত্যাদি শব্দের বহু প্রচলিত ঙ স্থানচ্যুত হইতেছে। ইহার একটা কারণ, কএর মস্তকে শয়ান ঙ অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সকলে লিখিতেও পারেন না। গ অক্ষরের মস্তকে ঙ পরস্পর যুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলে

ঙ্গ লিখিতেও পারেন না। তাহাঁরা স্পষ্ট ঙ লিখিয়া পাশে ক কিম্বা গ স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারেন। ঙ্খ, ঙ্ঘ, সেইরূপই লেখা হইয়া থাকে। দিঙ্‌নির্ণয়, দিঙ্‌মুখ শব্দেও ঙ স্পষ্ট। এইরূপ ঙ্ক, ঙ্গ লিখিলে ং লিখিবার কোন হেতু থাকে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে, কিম্বা বাংলা ব্যাকরণে ঙ স্থানে ং, এই বিকল্প বিধি নাই। বিকল্প বিধির দোষ এই, লেখককে অকারণ ভাবনায় পড়িতে হয়। কেহ দিল্লী যাইতেছেন; কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, দিল্লী যাইবার আর এক পথ আছে। তখন তাহাঁকে ভাবিতে হয়, তিনি কোন্ পথে যাইবেন। বুদ্ধিমান্ হইলে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ", অর্থাৎ বহুজন যে পথে গিয়াছে সেই পথই পথ, ধরিবেন। 'বাংলা', এই বানান ঠিক। কিন্তু বাঙলা লিখিবার কি যুক্তি আছে? বঙ্গ হইতে বঙ্গাল, বঙ্গালা, বাঙ্গালী। অপর প্রদেশে আমরা বঙ্গালী নামে পরিচিত। তাহাঁরা বাঙালী জানেন না। প্রায় সাত কোটি বাংলাভাষীর কয় জন 'বাঙলা বাঙালী' উচ্চারণ করিতে পারেন? সত্য কথা বলিতে কি, 'বাঙালী' দেখিলে আমি 'বাঙঁআলী' পড়ি। কারণ, বাঙন (বামন), শাঙন (শ্রাবণ), কুঙার (কুমার), কাঙর (কামরূপ), "পাখীজাতি যদি হঙ, পিয়াপাশে উড়ি যাঙ", "ধামসা ধাঙ ধাঙ" ইত্যাদি উদাহরণে ঙ অক্ষরের উচ্চারণ স্পষ্ট হইয়াছে। সুখের বিষয়, সকলে "বাঙলা বাঙালী" লেখেন না।

সংস্কৃত যে সকল শব্দে অনুনাসিক আছে, বাংলা রূপান্তরে সে সকল শব্দে চন্দ্রবিন্দু লেখাই বিধি। যেমন, দন্ত দাঁত, অঙ্ক আঁক। দুই-একটা ব্যতিক্রম আছে। যেমন, লম্ফ লাঁফ নয়, লাফ। কিন্তু দেখি, বিমান'ঘাঁটি'। ঘট্ট হইতে ঘাট, ঘাটি, ঘাটিয়াল বা ঘেটেল, ঘাটোয়াল শব্দ আসিয়াছে; একটাতেও চন্দ্রবিন্দু নাই। নূতন কলসীতে জল চুইয়া পড়ে, 'চুঁইয়া' পড়ে না। ভাত চুঁইয়া যাইতে পারে। জোয়ার-'ভাঁটা' নয় 'জোয়ার-ভাটা। সংস্কৃত খুজধাতু হইতে বাংলা খুজধাতু।

পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য লোক 'খুজি, খোজাখুজি' বলে, 'খুঁজি, খোঁজাখুঁজি' বলে না। বোঝার উপরে শাকের আঁটি হইবে 'বোঝার উপরে শাগের আটি' (বাংলা শাগ ও সংস্কৃত শাক এক দ্রব্য নয়)। কিন্তু, আমের আঁঠি, পায়ের আঁঠু।

অন্তঃস্থ-ব (ৱ) পরে থাকিলে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। কারণ ং অবর্গবর্ণের অনুনাসিক। এইরূপে সংস্কৃতে 'কিংবা', 'বশংবদ', 'সংবাদ' লিখিত হয়। কিন্তু বাংলায় অন্তঃস্থ-ব উচ্চারিত হয় না। আমরা বর্গীয়-ব জানি। ম ইহার অনুনাসিক। সেই হেতু লিখি, সম্বৎসর, সম্বরণ, সম্বলিত, সম্বাদী, সম্বর্ধনা। পূর্বে 'সংবাদ' ছিল না, সম্বাদ ছিল। কিম্বা, বশম্বদ এখনও আছে। কিংবা, বশংবদ লেখা পাণ্ডিত্যমাত্র।

ইংরেজী andএর নানারকম বাংলা বানান দেখিতে পাই। এগু, বানান প্রচলিত আছে। কিন্তু atom শব্দের বাংলা বানান য়্যাটম, অ্যাটম, এ্যাটম, এইরূপ দেখি। আমি এ্যাটম লেখা সঙ্গত মনে করি। কিছুদিন হইতে 'মাস্টার', 'স্টেশন' দেখিতেছি। কিন্তু আমরা বলি, মাষ্টার, এষ্টেশন, ষ্ট্রীট ; এই বানানই ঠিক। ইংরেজী কি অপর ভাষার শব্দের উচ্চারণ আমরা সে সে ভাষা অনুযায়ী করি না। আমরা ইস্তেহার, গোমস্তা, খোসামোদ, তমশুক, নোটিশ, পুলিশ ইত্যাদি বলি ও লিখি। এ পর্যন্ত কেহ আমাদের উচ্চারণ-দোষ ধরেন নাই।

সেদিন দেখিতেছিলাম, কেহ লিখিয়াছেন, 'তাদেরকে পাঁচ টাকা দিও'। 'তাদেরকে' 'আমাদেরকে' ইত্যাদি স্থানবিশেষের গ্রাম্য প্রয়োগ শুদ্ধ ভাষায় চলিতে পারে না। 'তাদের বলে ধরে এনো'। এই বাক্যের কি অর্থ হইবে কে জানে ? সে বল্লো, আমি যাবো, দেখবো ; সে যেতো, দেখতো ; দেখলো, হলো, ইত্যাদি বারমাসিকের পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। 'মশারা জলে ডিম পাড়ে', 'গাছেরা রোদে পাতা মেলিয়া দেয়', এইরূপ ভাষা দেখিলে মনে হয় বাংলা প্রেসে প্রুফ-রীডার অর্থাৎ

প্রুফ-শোধকও নাই। থাকিলে, সাধু ভাষায় ওপর, ভেতর, বের ইত্যাদি স্থান বিশেষের ভাষা দেখিতাম না। "তাদের ভেতর কেহ সাহসী ছিল না," "দশ দিনের ভিতর দেখা করিবে," "ছোট বেলায় দেখিয়াছি," "অনেকগুলি বই পড়িতে হয়," "সব কিছু বাকি আছে," "অনেক কিছু করিবার আছে," "তাদেরকে ডাক" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থানবিশেষের ভাষা বাংলা নয়। "একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন" "একটা ভয় বোধ করিলেন" ইত্যাদি প্রয়োগ ইংরেজী না বাংলা, বুঝিতে পারা যায় না। হাজার হাজার ছাত্র পরীক্ষা 'দিতেছে'। কেহ পাস 'করে', কেহ ফেল 'করে'। কেহ ট্রেন মিস 'করে'। কাহারও হার্ট ফেল 'করে'। এইরূপ ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, লেখকেরা চিন্তা করেন না। ছাত্রেরা পরীক্ষা 'দেয়' না নেয় ? ছাত্রেরা আপনাদিকে পাস করে ফেল করে, না পরীক্ষক করেন ? বাংলা ভাষায় ইংরেজী ক্রিয়াপদ বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। হার্ট ফেল হয়, ট্রেন মিস হয়, কেহ পাস হয়, কেহ ফেল হয়, ইত্যাদি। পরীক্ষকেরা পরীক্ষা দেন, ছাত্রেরা তাহা গ্রহণ করে।

আমরা বাংলা ভাষার গৌরব করি। যাহাতে সে ভাষা স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ না করে, লেখক মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নূতন শব্দ আসুক, দেশী বিদেশী শব্দ ও ভাব আসুক, তদ্দ্বারা বাংলা-সাহিত্য পুষ্ট হইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে, বাংলা ভাষার ধাতুর সহিত, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের সহিত মিশিতেছে। নচেৎ অন্য প্রদেশের পাঠকের নিকট বাংলা ভাষা অপাঠ্য হইয়া থাকিবে।

৩। ইংরেজীর বাংলা

বঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্রের বিস্ময়কর ক্ষমতা জন্মিয়াছে। কেহ সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন, পরদিন সকাল বেলায় দেখি,

দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার বাংলা ভাষান্তর বাহির হইয়াছে। বক্তৃতার পরেই বাংলা অনুবাদ হইয়াছে, রাত্রে রাত্রে ছাপা হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ, কেহ সন্ধ্যাবেলা বাংলায় বক্তৃতা করিলেন, পরদিন প্রাতে সে বক্তৃতা ইংরেজীতে পড়িতেছি। ইংরেজী যেমন তেমন ভাষা নয়, আর বক্তৃতাও এক বিষয়ে নয়। অনুবাদে কোথাও কোথাও ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা অনুবাদকের ক্ষমতার লঘুতা হয় না।

দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও বাংলা অনুবাদক ভাবিবার সময় পান না। অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিতেছেন। অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ করিতেছেন, ভ্রমক্রমে সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটাইতেছেন। দেখি, গণ-পরিষদ্, গণতন্ত্র, গণশিক্ষা, গণসমিতি। 'গণ' শব্দ সংস্কৃত এবং ইহার সংস্কৃত অর্থ বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত আছে। যেমন, বালকগণ, অর্থাৎ বালক নামে যে গণ- (group বা genus) আছে তাহাকে বুঝায়। অতএব 'জন' শব্দের পরিবর্তে 'গণ' বলিতে পারি না। লৈখিক ভাষায় ভ্রম একবার প্রবেশ করিলে তাহার সংশোধন অতিশয় দুঃসাধ্য হয়। যাঁহারা পুস্তক রচনা করেন ও বার-মাসিক পুস্তকে প্রবন্ধ লেখেন তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিবার অবকাশ পান। তাঁহাদের ভুল নিন্দনীয়, স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরেজী ভাষা অতিশয় সমৃদ্ধ। তাহার তুলনায় বাংলা কিছুই নয়। দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিভাষা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য সংসার-যাত্রা-নির্বাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নাম এবং দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার ভেদবাচক শব্দ এত আছে যে, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার শতাংশও নাই। Plan, scheme, design, project শব্দগুলির অর্থ এক নয়। কিন্তু বাংলায় এক 'পরিকল্পনা' আশ্রয় হইয়াছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষার শব্দ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা সে সুযোগ পাইতেছি না। হঠাৎ নদীর বন্যার মত নানাজাতীয়

ভাব ও ক্রিয়াবাচক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষার প্রসার করিতে হইলে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন ও রচনা করিতে হইবে। কয়েকজন বিজ্ঞ এই কর্মে রত থাকিলে অল্পে অল্পে বাংলাভাষার বর্তমান দৈন্য দূরীভূত হইতে পারিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্ বাংলাভাষার পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইতে পারেন।

ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দুই প্রকারে রচনা করিতে পারা যায়। (১) শব্দান্তর; (২) শব্দের ভাবানুবাদ। যে শব্দ দ্বারা ইংরেজী শব্দের ভাব রক্ষিত হয় সেই শব্দই শুদ্ধ। ইংরেজী Use শব্দের বহু অর্থ আছে। বাংলায় সর্বত্র 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হয় না। আমরা ভাত খাই, কাপড় ও জুতা পরি, চশমা পরি, গাড়ীতে চড়ি ইত্যাদি স্থলে 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা হয় না। এইরূপ প্রত্যেক শব্দের ভাবানুবাদ করিয়া লইতে হয়। এখানে কয়েকটা ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিচার করিতেছি।

॥ Situation—পরিস্থিতি ॥ শব্দটি মন্দ নয়, কিন্তু অনাবশ্যক। অবস্থা শব্দ বহু প্রচলিত। Food Situation—খাদ্য পরিস্থিতি। অর্থাৎ বলিতেছি, খাদ্যের অবস্থা। কিন্তু বলিতে চাই, অন্নকষ্ট।

॥ Damodar Valley Project—দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা ॥ ইহা অপেক্ষা 'দামোদরের আড়বাঁধ প্রযুক্তি' ভাল মনে হয়। Plan উপায়-কল্পনা, উপায়-সন্ধান। Ten year Plan দশ বৎসরের উপায় নির্দেশ। Scheme, আমি প্রকল্প করিয়াছি।

॥ Inflation—মুদ্রাস্ফীতি ॥ মুদ্রা স্ফীত হইবে কেমন করিয়া ? মুদ্রা শূন্যগর্ভ হইলে স্ফীত হইতে পারিত। Inflation মুদ্রাবাহুল্য। কলিকাতায় হিন্দীভাষী বাংলাভাষার রূপান্তর ঘটাইতেছেন। কাপড় ধোলাই, মদ চোলাই, কাগজওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদি বাংলা শব্দ নয়। 'চাহিদা' কোথা হইতে আসিল ? শব্দটির

বাংলা রূপ দিলে চাহ (প্রার্থনা)+তি=চাহতি, বা চাহতা হইতে পারে। Demand and Supply, চাহতি ও যোগানি, চলিতে পারে।

॥ Vitamin—খাদ্যপ্রাণ ॥ ইহা এক অদ্ভুত আবিষ্কার। খাদ্যের প্রাণ, না খাদ্য-রূপ প্রাণ, না আর কিছু? আশ্চর্যের বিষয়, বালকের পাঠ্যপুস্তকেও বহুকাল হইতে 'খাদ্যপ্রাণ' চলিয়াছে। কে এই শব্দের জনক, জানি না। নিশ্চয়, তিনি ডাক্তার নহেন। তিনি জানেন, প্রাণ সুলভ নয়, দুই এক আনায় কিনিতে পাওয়া যায় না। বহুকাল পূর্বে আমি পললীয় (পলল হইতে পালো, carbohydrate), পলীয় (পল মাংস, protein), স্নেহ (fat), পার্থিব (mineral), এই নাম চতুষ্টয় প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এইরূপ শব্দের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভাইটামিন শব্দের 'পোষ', এই নাম রাখা যাইতে পারে।

॥ Basic Education—বুনিয়াদী শিক্ষা ॥ ইহা আর এক আশ্চর্য শব্দ। বনিয়াদী ঘর জানি, বুনিয়াদী ঠাট জানি। বনিয়াদী (বাংলায় বুনিয়াদী নয়) সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Basic Education সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নয়। বনিয়াদী শিক্ষা বলিলে বুঝি যে শিক্ষার বনিয়াদ বা মূল আছে। কিন্তু Basic Education তাহা নহে। যে শিক্ষা প্রথম বা আগ্য, যাহার পরে অন্য শিক্ষা আসে, সেই শিক্ষা বুঝায়। অতএব Basic Education প্রাথমিক শিক্ষা বা আদ্যশিক্ষা। এই শিক্ষার রূপ কি হইবে, বিদ্যাশ্রয়ী অথবা কলাশ্রয়ী হইবে, সে কথা ভিন্ন। গান্ধিজীর শিক্ষাপ্রকল্পে এই প্রশ্নের একটা উত্তর ছিল। তিনি চাহিতেন, শিশুকে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণ শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাকে আধার করিয়া শিশুকে সুশীল ও জ্ঞানবান্ করিতে হইবে। শিশু বুঝিবে, সে এমন দ্রব্য নির্মাণ করিতেছে যাহা লোকে চায় ও কেনে। অর্থাৎ, তাহার মনে এমন ভাব জাগাইতে হইবে যে সে মানুষ হইয়াছে। সে চরকায় সুতা কাটিবে কি শাগপাতা রুইবে তাহা শিক্ষক বিবেচনা

করিবেন। ছাত্রছাত্রীদের নির্মিত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে। তাহাঁর প্রকল্পে ইহাও উদ্দেশ্য ছিল।

॥ Scheduled Caste—তপশীলী জাতি ॥ 'অনুন্নত জাতি' এই সংজ্ঞায় উদ্দিষ্ট জাতি বুঝিতে অসুবিধা হইত না। ব্রিটিশরাজ Scheduled Caste বলিয়া এই নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'অনুন্নত' সংজ্ঞা অপেক্ষা 'তপশীলী' আরও অবজ্ঞা-জনক। এই নামে বুঝায়, এই জাতি হিন্দুসমাজের বহির্ভূত। মহাত্মা গান্ধীর "হরিজন" সংজ্ঞা করুণা প্রকাশ করে। বঙ্গদেশে ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য, এই পাঁচ জাতিতে হিন্দুসমাজ বিভক্ত। 'সামান্য জাতি' common people ; এই সংজ্ঞা নির্দোষ মনে হয়।

॥ Chief guest of a meeting—সভার প্রধান অতিথি ॥ দশ বার বৎসর হইতে সভায় বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত Chief guest বা Guest-in-chief নামক এক নূতন পদের আবির্ভাব হইয়াছে। সভা করিতে গেলে একজন উদ্‌বোধক চাই। তিনি সভাপতি নহেন। আর একজন Guest চাই, তিনি সভার উদ্দেশ্যের ও কৃতকার্যের প্রশংসা করিবেন। বোধ হয় পূর্বকালে মাগধ সূত বা ভাটেরা এই কর্ম করিতেন। তাহাঁরা বৃত্তিভোগী ছিলেন। Chief guest বৃত্তিভোগী নহেন ; তিনি ভাটক পান না, তিনি অবৈতনিক বক্তা। তিনি যাহাই হউন, অতিথি নহেন। যতদিন বঙ্গদেশে অতিথিশালা, অতিথিসেবার নিমিত্ত ভূমি আছে, ততদিন সভার প্রধান বক্তা অতিথি হইতে পারেন না। আমি জানি, পূর্ববঙ্গে গৃহে অভ্যাগত, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদি সকলকেই অতিথি বলা হয়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ইহাঁদিগকে অতিথি বলিলে ইহাঁরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইবেন। Chief guest আমন্ত্রিত।

॥ Pre-historic—প্রাগৈতিহাসিক। পণ্ডিত শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রবাসীতে এই প্রাক্‌ শব্দের অপপ্রয়োগ দেখাইয়াছিলেন। তিনি আরও

কতকগুলি শব্দের ভুল ধরিয়াছিলেন। যেমন, অর্ধবাৎসরিক। কিন্তু কার কথা কে শুনে? ইতিহাসের পূর্ব যুগে, চৈতন্যদেবের পূর্বে, লেখাই ঠিক।

গঠনমূলক কর্ম, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ইত্যাদির 'মূলক' বর্জন না করিলে বাংলা পুষ্ট হয় না। গঠনমূলক কর্ম, গঠন কর্ম ভিন্ন আর কি? বাধ্যতামূলক শিক্ষা, Compulsory Education, আমার মতে আবশ্যক শিক্ষা বলা ভাল।

বস্তুতান্ত্রিক, এই নবনির্মিত শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র বুঝি। চরক আয়ুর্বেদ তন্ত্র, আর্যভট জ্যোতিষতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। শাক্ততন্ত্র প্রসিদ্ধ। তন্ত্র শব্দের প্রথম অর্থ তাঁতের টানা। তাঁতে যেমন টানা পড়িয়ান দিয়া বস্ত্র নির্মিত হয়, সেইরূপ, যে শাস্ত্রে সূত্রের পরস্পর যোগদ্বারা কোন বিদ্যা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সে শাস্ত্রের নাম তন্ত্র। তন্ত্র Systematic knowledge. System না থাকিলে তন্ত্র বলা চলে না। এই মূল অর্থ হইতে তন্ত্র শব্দের বহুবিধ অর্থ আসিয়াছিল। সেখানেও system অন্তর্নিহিত আছে। বস্তুতন্ত্র বলিলে কি অর্থ দাঁড়ায়, বুঝিতে পারি না।

এইরূপ নূতন নূতন অসংখ্য শব্দ রচিত হইতেছে। ইংরেজী শব্দের ভাবার্থ লক্ষ্য রাখিয়া নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইবে। শব্দান্তররীতি গ্রহণ করিলে বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ইংরেজীতে অনুবাদ না করিয়া যে নবরচিত শব্দ বুঝিতে পারা যায় সেই শব্দই টিকিবে। যেমন, প্রতিক্রিয়াশীল যে অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে শব্দ হইতে সে অর্থ আসে না। নৈতিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, পাঠ্যজীবন, কর্মজীবন, কবিজীবন, জাতীয় জীবন ইত্যাদি এক জীবনে কত অতিদেশ করা যাইবে? অনুকরণদ্বারা কোন ভাষা শক্তিশালী হইতে পারে না।

৪। সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা

ভারত স্বাধীন হইবার পর পশ্চিমবঙ্গরাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন, অতঃপর বাংলাভাষায় রাজকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশ পালন করা সোজা নয়। অসংখ্য রাজকর্মচারী, অসংখ্য পদ, এ যাবৎ আমরা ইংরেজীতে শুনিয়া আসিতেছি। এখন হঠাৎ বাংলা শব্দ কোথায় পাওয়া যাইবে? এক পরিভাষাসংসদ আবশ্যক পরিভাষা নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার প্রথম স্তবক দেড় বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ শব্দ উত্তম হইয়াছে। সংসদের বিদ্যাবত্তা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়।

এই স্তবকে প্রায় আট শত শব্দ আছে। তন্মধ্যে প্রায় চল্লিশটি ফার্সী ও চল্লিশটি ইংরেজী। অর্থাৎ সাত শতের অধিক শব্দ সংস্কৃত। পরিভাষা যে সংস্কৃত হইবে, ইহাতে নূতন কিছুই নাই। বাংলা ভাষাই ত সংস্কৃত ভাষার এক প্রাকৃত রূপ। কিন্তু প্রথম চিন্তা আসিতেছে, এত যত্নের পরিভাষা টিকিতে পারিবে কি? দেখিতেছি, ভারতরাষ্ট্র ভাষা হিন্দুস্থানী অথবা উর্দূ-হিন্দী হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। তখন মন্ত্রী মহাশয় উজীর হইবেন কি আর কিছু হইবেন, গবর্ণর থাকিবেন কি সুবেদার হইবেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়তঃ সকল প্রদেশে Judge, Magistrate, Commissioner, Superintendent of Police ইত্যাদি অসংখ্য পদ থাকিবে। উচ্চ পদের একই নাম না থাকিলে এক প্রদেশের বার্তা অন্য প্রদেশে বুঝিতে পারা যাইবে না। কথাটা দাঁড়াইতেছে, পদের নামের অথবা অধিকৃতের নামের সমতা কে রক্ষা করিবে? এই ক্ষমতা ভারতরাষ্ট্রের আছে, রাষ্ট্রের অধীন রাজ্যের নাই। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হইলে পরিভাষার যে আকার হইত, হিন্দুস্থানী বা উর্দূ-হিন্দী হইলে সে আকার থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ রাজত্ব

গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব ও লক্ষণ আমাদের অন্তরে বাহিরে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। উচ্চ শিক্ষিতেরা আধা-ইংরেজ, বাংলায় ভাবিতে পারেন না। বাংলায় কিছু লিখিতে হইলে প্রথমে ইংরেজীতে লেখেন। শিক্ষিত মহিলা ইংরেজী শব্দ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন। তাহাঁর বেশে তাহাঁর ভূষণে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রকটিত আছে। ফলে কি দাঁড়াইবে, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তথাপি সংসদ-কৃত পরিভাষা সম্বন্ধে দুই পাঁচটা টিপ্পনী করিতেছি।

সপ্তশতাধিক সংস্কৃত শব্দের মধ্যে 'সরকার' শব্দ 'হংসমধ্যে কাকো যথা' হইয়াছে। বহুকাল হইতে 'সরকারী' শুনিয়া আসিতেছি, যেমন, সরকারী রাস্তা, সরকারী উকীল, সরকারী ডাক্তার ইত্যাদি। কিন্তু সরকার যে কে, তাহা অব্যক্ত থাকিত। গ্রামে পাঠশালার গুরুমশায় সরকার, কলিকাতায় বাজার সরকার, শিপ সরকার ইত্যাদি আছে। পরিভাষাসংসদ রোক সরকার, আদায় সরকার, করিয়াছেন। ইহাদের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিরূপ মানাইবে ?

অনেক কাল পূর্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক ভদ্রলোকের ছেলে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। কারার এক বিধি ছিল, কর্তাকে দেখিলে কয়েদীকে দাঁড়াইয়া "সরকার সেলাম" বলিতে হইত। ছেলেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। এখানে 'সরকার' অর্থে প্রভু, এবং তাহাই সরকার শব্দের মূল অর্থ। আর এক অর্থ প্রদেশ; যেমন, ভারতের উত্তর সরকার। গ্রামবাসী গবর্মেণ্ট জানে বুঝে, কিন্তু সরকার অদ্যাপি শুনে নাই। কোন কোন সংবাদপত্রে সরকার শব্দ দেখিয়াছি, এই পরিভাষা প্রকাশের পর হইতে এই ব্যবহার দেখিতেছি। পূর্বে গবর্মেণ্ট (গবর্ণমেণ্ট নয়) লেখাই রীতি ছিল। সরকার শব্দে আর এক গুরুতর আপত্তি আছে। এই শব্দের সহিত Govern, Governor, Governing body ইত্যাদির কোন সংশ্রব

নাই। রাজকার্যে সরকার শব্দ একক থাকিবে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে না।

মহামহিম (His Excellency) গবর্ণরকে 'দেশপাল' বলিলে তাহাঁকে অপর নানাবিধ 'পালে'র এক পাল, অর্থাৎ রক্ষক মনে হয়। কোট্টপাল (কোতোয়াল), দিকপাল (দিগার, বর্তমান চৌকীদার), ঘট্টপাল (ঘাটোয়াল) ইত্যাদি শব্দের পাল অর্থে রক্ষক। আর পরিভাষা সংসদও অনেক প্রকার 'পাল' আনিয়াছেন। পরিষৎপাল Speaker of an Assembly, নগরপাল Commissioner of Police, বনপাল Conservator of forests ইত্যাদি। ভূপাল নৃপাল শব্দে রাজা বুঝি, কিন্তু নামে তাহাঁরা একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা নহেন। গবর্ণরকে রাজা না বলিলে কাহার মন্ত্রী, কাহার রাজস্ব, রাজপুরুষ, রাজকর্মচারী, রাজভৃত্য, রাজমার্গ, রাজকোষ ইত্যাদি ? স্বরাজ, রামরাজ, ব্রিটিশরাজ, রাজনীতি, রাজভাষা ইত্যাদি শব্দ কোথায় পাই ? রাজা বলিতে না পারিলে দেশপালক বা রাজ্যপালক বলা যাইতে পারে। কলিকাতা কি পশ্চিম-বঙ্গের রাজধানী নয় ? নগর অনেক আছে, কলিকাতাকে শুধু নগর বলিলে চলিবে না। Police Commissioner নগরপাল, না রাজধানী পাল ? Government রাজ, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। রাজকার্য, রাজকীয় কার্য, Official business, Non-official business লৌকিক কার্য। সরকারী শব্দ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অন্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস হইবে।

Minister মন্ত্রী, ঠিক। কিন্তু secretary সচিব না হইয়া 'কর্মসচিব' কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। সচিব সহায়, তিনি নিশ্চয় কোন কর্মের নিমিত্ত নিযুক্ত। কেহ অকর্মসচিব থাকিলে অন্যকে কর্মসচিব বলিতে পারা যাইত। বাংলা ভাষায় সাচিব্য শব্দও গ্রামে প্রচলিত

আছে। সেখানে অর্থ, ক্রেতার সাহায্য। যেমন, গুড় সাচিব্য হইয়াছে, অর্থাৎ গুড়ের দাম কমিয়াছে।

॥ Home Department—স্বরাষ্ট্র বিভাগ॥ কিরূপে হইল? রাষ্ট্র বলিলে ভারতরাষ্ট্রই বুঝিতেছি। যেমন, রাষ্ট্রভাষা। পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র, না রাজ্য? Home Minister কি করেন জানি না, বোধ হয় দেশশাসন তাহাঁর মুখ্য কর্ম। অতএব Home Department শাসনবিভাগ বলা সঙ্গত।

॥ Engineer (Civil and Irrigation) বাস্তুকার॥ ইহা চলিতে পারে না, ভুলও হইয়াছে। বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রগ্রাহী Engineer তিনি 'সর্বকর্মবিশারদ, সূত্রদণ্ডপ্রপাতজ্ঞ, মানোন্মানপ্রমাণবিৎ' ইত্যাদি। যাহাতে লোকে বাস করে তাহা বস্তু বা বাস্তু। যে ভূমিখণ্ডে বাস করে তাহা বাস্তু। তদুপরি নির্মিত যাহা কিছু, সে সব বস্তু, Structures. এইরূপে কৌটিল্য তাহাঁর অর্থশাস্ত্রে বাস্তু শব্দের অর্থ গৃহ, ক্ষেত্র, আরাম, সেতুবন্ধ, তড়াগ ও আধার করিয়াছেন। এই সকলের নির্মাণের নাম শিল্প ছিল। তদনুসারে শ্রীকুমার শিল্পরত্ন নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যাহারা নির্মাণ করে তাহারা শিল্পী। শিল্পী চতুর্বিধ,—স্থপতি, সূত্রগ্রাহী, তক্ষক ও বর্ধকী। প্রতিমা নির্মাণ ও চিত্রকলাও শিল্প। শুক্রনীতি-সারেও সেই অর্থ। যথা—"প্রাসাদ প্রতিমারামগৃহবাপ্যাদি সৎকৃতিঃ," যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার নাম শিল্পশাস্ত্র। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে, যেমন বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, শিল্পজীবী নয় জন,—কর্মকার, স্বর্ণকার, কাংসকার, চিত্রকার ইত্যাদি। উত্তর-ভারতে, যেমন আলমোড়ায় শিল্পকার শব্দ প্রচলিত আছে। সেখানে শিল্পকার অর্থে বঙ্গদেশের ছুতার। অতএব Engineer শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। Engineer নানাপ্রকার আছেন। Mechanical Engineer, Chemical Engineer, Electrical Engineer ইত্যাদি সকল Engineerই

শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। বাস্তকার নামে আর এক আপত্তি আছে। বাস্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ, গৃহ নির্ম্মাণযোগ্য ভূমি। এই অর্থ অমরকোশে আছে, অন্য অর্থ নাই। বাস্তকার বলিলে বুঝাইবে, যিনি গৃহনির্মাণযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করেন।

এই সঙ্গে Industry শব্দেরও একটা প্রতিশব্দ চাই। Industry কেবল শিল্প নহে। Agricultural Industry, Fishing Industry, Mining Industry প্রভৃতিকে শিল্প বলিতে পারি না। শিল্প বস্তু-নির্মাণে। কিন্তু কৃষিকর্মে শিল্প কোথায়? Industry কেবল manufacture নয়, occupation, business বা tradeও বুঝায়। সংস্কৃতে অবিকল 'ব্যবসায়'। ব্যবসায় কেবল বাণিজ্য নয়। আমরা Trade অর্থে ব্যবসা বা ব্যবসায় বলি বটে, কিন্তু manufactureও বুঝি। Manufacture অর্থে কলা শব্দ প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিদত্ত পদার্থের রূপান্তর-করণের নাম কলা। শুক্রনীতিসারে কলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কলা অসংখ্য। যেমন, কাচ-কলা glass manufacture, বস্ত্রবয়ন কলা textile industry ইত্যাদি। Cottage Industry শব্দের সংস্কৃত নাম কৌটকলা। পাণিনিতে কৌট শব্দ আছে। কৌটতক্ষ স্বাধীন ছুতার। কলা art. Manufacture মাত্রেই art. সমুদ্র-জল শুকাইয়া লবণ পৃথক করা একটা art, শিল্প নয়। নৃত্যগীত বাদ্য শিল্প নয়, কলা। Fine arts ললিতকলা না বলিয়া কান্তকলা বলিলে ভাল হয়।

॥ Labour শ্রম ॥ এখানে Labour শব্দ দ্বারা নিশ্চয় Labourer বা Labouring class উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলেই শ্রম করি, আমরা সকলেই শ্রমিক, কিন্তু labourer নই। বাংলায় বেরুনিয়া শব্দ প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, অদ্যাপি বাঁকুড়ায় আছে। ভরণীয় শব্দ হইতে বেরুনিয়া; wages ভরণ। কাজেই যে ভরণ করে

সে ভর্তা, employer. ধনিক ও ভৃতিক, দুইটি শব্দ একত্র না পাইলে, ভৃতিক যে labourer, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভৃতি, ভাতা pension, allowance ইত্যাদি। ভূমি, ভর্তা, ভৃতিক বা ভরণীয়, এই তিন ভ কার পণ্য-উৎপাদনের ত্রিপাদ। ইহাদের সহিত সমাযোগ (organization) পাইলেই পণ্য-উৎপাদন চলিতে থাকে। কিন্তু বাংলায় ভর্তা শব্দ চলিবে না। অতএব ধনিক ও ভৃতিক, অথবা ধনিক ও শ্রমিক, রাখাই ঠিক হইবে। কর্মী worker, কার্মিক workman, কারু Artisan.

॥ Librarian গ্রন্থাগারিক ॥ গ্রন্থপাল বলা ভাল।

৬০।৭০ বৎসর পূর্বে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবাণু ইত্যাদি নাম চলিতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞান দ্রুত বাড়িয়াছে। এখন এ সকল শব্দ আমাদের জ্ঞানের অনুগামী হইতেছে না। রাজাজ্ঞা দ্বারা এইরূপ নাম বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য হইবে না। ॥ Chemist প্রাণরসায়নী ॥ ॥ ॥ পড়িলে প্রাণ-রসায়নী বটিকা মনে আসিবে। শ্রুতিরসায়নী ভাষা, নেত্ররসায়নী শোভা বলা অপ্রচলিত নয়। শুধু রসায়ন বলিলে আয়ুর্বেদের রসায়ন মনে হয়। রসায়নবিদ্যা বলিলে রস (পারদ) হইতে কোন রকমে টানিয়া chemistry বুঝাইতেছে। তেমনই পদার্থবিদ্যা না বলিয়া শুধু পদার্থ বলিলে অন্য অর্থ হইয়া যায়। তখন Physicist অর্থে পদার্থী বলাও চলে না। প্রাণ কি কোন বস্তু যে তাহার রসায়ন থাকিবে?

॥ Pathology বিকারতত্ত্ব ॥ ঠিক মনে হইতেছে না। কিসের বিকার? বোধ হয় রোগতত্ত্ব। Pathogenic রোগজনক।

॥ Professor অধ্যাপক ॥ অধ্যাপক টোলের। তাঁহারা ধনবানের শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হন। তাহাঁদের এই সামান্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করা উচিত হইবে না। এতকাল Professor শব্দে অধ্যাপক চলিতেছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে রাজানুমোদিত হইয়া উপাধিস্বরূপ হইতেছে। অমুক

কলেজের অধ্যাপক বলা যে কথা, অধ্যাপক অমুক বলা সে কথা নয়। Professor অধিশিক্ষক।

॥ Lecturer উপাধ্যায় ॥ উপাধ্যায় বৃত্তিভোগী ছিলেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষা শিখাইতেন না। Lecturer বরং অন্ত্যশিক্ষক Secondary school teacher মধ্যশিক্ষক, Primary school teacher আগুশিক্ষক।

॥ Post and Telegraph প্রৈষ ও তার ॥ Post-master General মহাপ্রৈষাধিকারিক ; বড় ডাক কর্তা ॥ প্রৈষ শব্দ চলিবে না, ঠিকও হয় নাই। ডাক শব্দ রাখিতেই হইবে। কিন্তু Post office, Post-master কই ? Post office ডাকঘর ; Post-master ডাক কর্তা ; Post-master General ডাকের অধিকর্তা।

দেখিতেছি কয়েকটা সামান্য শব্দও পারিভাষিক হইয়াছে। যেমন, ॥ Bearer বাহক, বেয়ারা ॥ Bearer বাহক বটে, কিন্তু বেয়ারা নয়, বেহারা। ॥ Peon পিয়ন, চাপরাশী ॥ সকল পিয়ন চাপরাশ রাখে না। যাহারা চাপরাশ রাখে, তাহারাও পিয়ন নামে তুষ্ট হয়। Bottle washer বোতল ধাবক ; কুপী ধাবক ॥ এই শব্দে সংস্কৃত প্রীতির আতিশয্য হইয়াছে। আমি বলি, বোতল-ধুইয়ে। ॥ Telegraphic তারিক ॥ এখানে বাংলা শব্দে সংস্কৃত ইক প্রত্যয় হইয়াছে। যদি এইরূপ শব্দ রচিতে বাধা না হয়, তবে Constable পাহারাওয়ালা না হইয়া পাহারী (প্রহরী) হইতে পারে। Gasman গ্যাসী। যেমন, দপ্তরী, কাগজী ইত্যাদি।

॥ Officer আধিকারিক ॥ কিন্তু office কই ? বোধ হয় এই শব্দের প্রতিশব্দ অধিকার। যদি তাহাই হয়, তবে officer অধিকারী করিলে দোষ কি ? কিন্তু অধিকার শব্দ এত অধিক প্রচলিত যে তদ্দ্বারা office বুঝাইবে না। Government office রাজকার্য, রাজকার্যালয়। Officer

কার্যচারী। কর্মচারী শব্দ বহু প্রচলিত। Clerk করণিক না করিয়া করণী করিলে ভাল হয়। সংস্কৃতে করণ = কায়স্থ = clerk আছে।

এইরূপে তালিকার শব্দ বিচার করিবার অবসর নাই, স্থানও নাই। সামন্তরাজ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যাইবে। ওড়িস্থায় দেখিয়াছি রাজার ব্যবহর্তা, চলিত ভাষায় বেঅর্তা, আছেন। তিনি রাজার Secretary. ছামুকরণ অর্থাৎ সম্মুখকরণ রাজার জমাখরচ লেখেন। গঁতাঘর Treasure house ; সংস্কৃত গ্রন্থ (ধন) শব্দ হইতে গঁতা। বাঁকুড়ায় গাঁতাইত রাজার Store keeper, ইত্যাদি।

পরিভাষাসংসদ সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া মনে মনে আশা করিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত হইবে। কিন্তু বহু প্রচলিত কোন কোন ইংরেজী নাম রাখিতেই হইবে। বিশেষতঃ, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ হ্রস্ব নয়, সুখোচ্চার্য নয়, সুবোধ্য নয়, সে সকল শব্দ চলিবে না।

বাঙ্গলা নবলিপি

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি আমার "বাঙ্গালা ব্যাকরণে" দেখাইয়াছিলাম বাঙ্গলা ভাষা শেখা সোজা। ইহা অক্লেশে কহিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এখানে আমি সাধুভাষার কথা বলিতেছি। সে ভাষাই প্রামাণিক ও লৈখিক। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গাক্ষর অক্লেশে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায় না। এই ভাষায় পঞ্চাশৎ মূলধ্বনি অর্থাৎ বর্ণ আছে। কিন্তু পঞ্চাশৎ আকৃতি অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা সকল শব্দ লিখিতে পারা যায় না।

লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর আবশ্যক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি নূতন অক্ষর। ইহা মনে রাখিতে, লিখিতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাস ছাত্র দেখিয়াছি যাহারা হ্ব, গু, শু, ণ্ড, জ্ঞ, হ্ম ও এইরূপ অপর দুই একটা অক্ষর লিখিতে পারে না।

আমরা পাঠশালায় লিখিতে লিখিতে অক্ষর পড়িতে শিখিতাম। প্রায় দুই বৎসর লাগিত। সমুদয় অক্ষর ছয় ভাগ করা হইত। যথা—

(১) অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ।

(২) ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ।

(৩) ক কা কি ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত করিবার স্বরাক্ষর।

(৪) ক কিঅ (ক্য) অর্থাৎ য র ল ব ম ন ফলা এবং রেফ।

(৫) আঙ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের পাঁচ বর্গের পাঁচ অনুনাসিক যোগ। য র ল বা দি অবর্গীয় ব্যঞ্জনে অনুস্বার যোগ।

(৬) আস্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনাক্ষরে অপর ব্যঞ্জনাক্ষর যোগ।

এই মূল ভাগের বহু ব্যতিক্রম হইয়াছে। কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি।

ক+ু=কু ; কিন্তু গু, ত্ত (যেমন স্তু), শু, ত্রু, দ্রু, ধ্রু, ভ্রু, রু, হু।

ক+ূ=কূ ; কিন্তু দ্রূ, ধ্রূ, ভ্রূ, রূ।

ক+ৃ=কৃ ; কিন্তু হৃ।

বলিতেছি য-ফলা, কিন্তু ‘য’ অক্ষরের পূর্ণ আকার নাই। ইহাকেও নূতন শিখিতে হয়।

র-ফলা যোগে গ্র ; কিন্তু ক্র, ত্র, ত্র, ভ্র।

ক্‌ম—ক্ম ; কিন্তু হ্‌ম—হ্ম। হ্‌ন—হ্ন, যেমন চিহ্ন।

ঙ্‌ক—ঙ্ক ; ঙ্‌গ—ঙ্গ ; ঞ্‌চ—ঞ্চ।

গ্‌ধ=গ্ধ ; দ্‌ধ=দ্ধ ; ন্‌ধ=ন্ধ ; ব্‌ধ=ব্ধ।

ন্‌থ=ন্থ ; স্‌থ=স্থ ইত্যাদি।

দেখা যাইবে, এক উকারের পাঁচ রকম আকার আছে। উকার ও ঋকারের দুই, ক-কারের তিন, গ-কারের দুই, ঙ কারের তিন রকম আকৃতি আছে। এই প্রকারে বাঙ্গলা অক্ষরসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। উকারের পাঁচ রকম আকার বলা ঠিক হইল না; কারণ যে-কোন রূপ যে-কোন ব্যঞ্জনে যোগ করা চলে না।

আমার "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" ও "শব্দ কোশে" সংযুক্ত স্বরাক্ষরের অনাবশ্যক অতিরিক্ত রূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর স্পষ্ট ও পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। রেফ-যুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে। এইরূপ অক্ষর-সংস্কার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। অক্ষরের আকার চিরকাল এক ছিল না। অধিক নয়, শত বৎসর পূর্বের লিখিত পুথীর সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় না। সকল স্থানের পুথীর অক্ষরও অবিকল এক ছিল না। আমার প্রদর্শিত প্রণালীতে ১৪টি স্বরাক্ষর ও ৮টি রেফদ্বিত্ব ব্যঞ্জনাক্ষর কমিয়াছে। ইহা অল্প লাভ নয়। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, লিখিবার ও পড়িবার সুবিধা হইয়াছে।

এই ক্রমে "আনন্দবাজার পত্রিকা" মুদ্রিত হইতেছে। প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক পড়িতেছেন, বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন না। "পত্রিকা" আরও অগ্রসর হইয়াছেন, ি, ু, ূ, ৃ, ঁ, এই কয়েকটি চিহ্ন ব্যঞ্জনাক্ষরের সহিত না জুড়িয়া পৃথক মুদ্রিত হইতেছে। এই পরিবর্তনে অগণ্য টাইপ কমিয়াছে। কিন্তু র-ফলাটি পৃথক হয় নাই। এ কারণ ১৫।১৬টা টাইপ রাখিতে হইয়াছে। এখন বই ছাপার দিন, ছাপাখানার সুবিধাও দেখিতে হইবে।

অপর যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের একটি ছোট অপরটি বড়, অথবা একটি বড় অপরটি ছোট করিতে হইতেছে। দুইটিই সমান ছোট করিলে অক্ষর অস্পষ্ট হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক যুক্তব্যঞ্জনাক্ষর যদিও পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট,

একটি নূতন অক্ষর হইয়াছে, চিনিতে শিখিতে হয়। যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের সংখ্যা অল্প নয়। ফলার সংখ্যা রেফ সহ ৮; আঙ্কের ২২; আঙ্কের ৩০; একুনে ৬০ সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর শিখিতে হয়। বস্তুতঃ আরও অধিক। প্রত্যেকের কলেবর নূতন।

এই কারণেই শিশুর বর্ণ-ও অক্ষর-পরিচয় করিতে দুই বৎসর লাগে। ইহার কমে সে অক্ষর পড়িতে শিখিতে পারে, কিন্তু লিখিতে পারে না। কারণ লিখিবার সময় প্রত্যেক অক্ষরের আকার, কোথায় কোণ, কোথায় তরঙ্গ, কোথায় বক্ররেখা, কোথায় ঋজুরেখা আছে, তাহা স্মরণ করিতে হয়। হাতের অভ্যাসও অল্প সময়ে হয় না।

অক্ষর-যোজনার দোষও আছে। সংযুক্ত স্বরাক্ষর-যোগে স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক+া=কা; কিন্তু ক+ি=কি। ক+ী=কী, কিন্তু ক+ে=কে। আমরা বলি, ক্এ=কে; কিন্তু লিখি এ (ে) ক=কে। এই অনিয়ম হেতু সংযুক্ত স্বরাক্ষর ভাঙ্গিয়া লিখিতে পারা যায় না। 'বন্দ' শব্দ 'বন্‌দ' লিখিতে পারি, দোষ হয় না। কিন্তু 'বন্দে' শব্দ যদি 'বনে্‌দ' লিখি, প্রথমে ন্‌দ পড়িয়া পরে 'ে' যোগ করিতে হয়; অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বামে দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা অক্ষর শিক্ষার এক অন্তরায়। আর, হস্‌ চিহ্নই বা কত দেওয়া যাইবে? হস্‌ চিহ্ন দিয়া অক্ষর লিখিলে অসুন্দর দেখায়। বিশেষ দোষ, এই চিহ্ন লিখিবার সময় কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। অতএব দেখা যাইবে, অক্ষর-সংস্কার ও অক্ষর-যোজনার সংস্কার, দুই-ই আবশ্যক।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গরাজ দেশময় লেখাপড়া-বিদ্যাবিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছেন। দেশের সকল বালকবালিকাকে ও বয়স্ককেও লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। আদ্যশিক্ষা কলাশ্রয়ী হউক, আর বিদ্যাশ্রয়ী হউক্, উভয় স্থলেই লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। যাহাতে লিখন ও পঠন সহজ হয়, তাহাদের শ্রম লঘু হয়, আমাদিগকে সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে

হইবে। লিখন-পঠন-বিদ্যা জ্ঞান-ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা। লিখন ও পঠন উপায় মাত্র, উপেয় নহে। জনগণ যত সহজে সে কুঞ্চিকা পাইবে, দেশে বিদ্যা-বিস্তারও তত দ্রুত হইবে। এই কারণে বাঙ্গলা অক্ষর-সংস্কার আবার চিন্তনীয় হইয়াছে।

কিন্তু মানুষ অচেতন পুতুল নয়, তাহার রাগ-বিরাগ আছে, ইতিহাস-সংস্কার আছে। আমরা সুবিধা-অসুবিধা ভাবিয়া সকল কাজ করি না। তথাপি আমরা ইদানীং রেল গাড়ীতে চড়িয়া তীর্থ-দর্শনে যাইতেছি, পূর্বের মত পায়ে হাঁটিয়া যাই না। যে সংস্কার দ্বারা অক্ষরের দোষ ও অক্ষর-যোজনার দোষ সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু অক্ষর স্বীয় রূপ হারায় না, অক্ষর-যোজনার বিপর্যয় ঘটে না, সে সংস্কার বাঞ্ছনীয়।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি "ভারতবর্ষে" দেশে জ্ঞান-প্রচারের উপায় চিন্তা করিয়াছিলাম। সাতাইশ বৎসর পূর্বে "প্রবাসী"তে তৎকালের শিক্ষার দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন কামনা করিয়াছিলাম। কিন্তু পরাধীন জাতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। এক্ষণে শিক্ষামন্ত্রী সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন। যদিও ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমার আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হয় নাই। কেবল শিক্ষা-পরিপাটীর যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক মনে করিয়াছি। সম্প্রতি "শিক্ষা-প্রকল্প" নামে আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইতেছে। "বিশ্বভারতী" প্রকাশ করিতেছেন।

এখানে বাঙ্গলা লিপির সংস্কার চিন্তা করিতেছি। বাঙ্গলা স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্জনাক্ষর তিন ভাগে লিখিতেছি। (১) প্রচলিত অক্ষর, (২) সংস্কর্তব্য অক্ষর, (৩) উপন্যস্ত অক্ষর। সংস্কর্তব্য ও উপন্যস্ত অক্ষর সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুধীগণ নবলিপির প্রয়োজন, যোগ্যতা ও দোষ-গুণ বিচার করিবেন। ছাপাখানার এই দুই ভাগের

অক্ষর নাই। ১, ২, ৩ অঙ্ক-ক্রমে লিখিয়া পরে আকার প্রদর্শিত হইল। নবলিপির আদর্শও প্রদর্শিত হইল। পাঠক সহজে দোষ-গুণ বুঝিতে পারিবেন।

নবলিপি

১। স্বরাক্ষর—অসংযুক্তরূপ।

ক। প্রচলিত—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ। (১৪)

খ। সংস্কর্তব্য—ঈ (১)। দুই হ্রস্ব-ই যোগে দীর্ঘ-ঈ। একটি ই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরটি বিকৃত হইয়াছে। অক্ষরের দুইটি 'ই' দেখাইলে সহজে মনে রাখিতে পারা যাইবে।

গ। উপন্যস্ত—এা, ওা। ইংরেজী and শব্দের আদ্যস্বর লিখিবার বাঙ্গলা অক্ষর নাই। আমি এই ধ্বনির নাম বাঁকা-এ রাখিয়াছিলাম। আমি 'বাঁকা-এ' লেখা আবশ্যক বিবেচনা করি না। কারণ, এ, কোথাও আ দ্বারা সে অক্ষরের কাজ চলিতে পারে। একদিন হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট (D.L.) 'এফিডেবিট্‌' বলিতেছিলেন। আমি তাহাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি বলিলেন, আমরা বাঙ্গলায় এইরূপ বলি। তথাপি কেহ কেহ অ্যা, এ্যা, য়্যা লিখিতেছেন। স্বরবর্ণে য-ফলা কিম্বা অন্য ব্যঞ্জন যোগ অসম্ভব। য়্যা-র ধ্বনি 'ইআ'-ই রহিল; 'বাঁকা-এ' হইল না। 'এা,' এই যুক্তস্বর দ্বারা বাঁকা-একারের ধ্বনি প্রায় আসে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হইতে পারে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সন্ধি হইয়া অন্য স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব নূতন নয়। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে এা উপস্থিত করিয়াছিলাম।

ওা, যেমন পাওা (পাওয়া), পুরাতন পুথীতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত শব্দে 'য়' অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক আছে; যেমন, মায়া, বায়ু, প্রয়োগ। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দে 'য়' অক্ষর স্বরের বাহন হইয়াছে। 'অন্তঃস্থ-অ' এই নামই বর্ণের আধোগতি প্রকাশ করিতেছে। ইহাকে 'ইঅ' বলাই ঠিক। বাঙ্গলা ভাষায় 'য়' অক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়াছে। আমরা 'করিআ' না লিখিয়া 'করিয়া' লিখি; চেআর—চেয়ার। কিন্তু এতদ্দ্বারা বাঙ্গলা শব্দের 'য়' অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে। ইহারই ফলে প্রাকৃত জনে আউ (আয়ু), বাউ (বায়ু) বলে। 'ওা' এই যুক্তস্বর দ্বারা 'য়া' লেখা হ্রাস হইবে। অসংখ্য বাঙ্গলা শব্দে 'ওা' আছে। যেমন, ফেরী-ওালা, গাড়ীওালা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এা ওা নূতন অক্ষর নয়।

২। স্বরাক্ষর—সংযুক্তরূপ।

ক। প্রচলিত—া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ। (১০)।

খ। সংস্কর্তব্য—ি (২), ু (৩), ূ (৪), ৃ (৫), ে (৬), ৈ (৭)।

'ি' অক্ষরে একটি ধনুঃ, তাহাতে আর একটি ধনুঃ যোগ করিয়া দীর্ঘ 'ী' হইয়াছে। সেই সাদৃশ্যে ু অক্ষরে আর এক ু জুড়িয়া দীর্ঘ-উ করা হইল। ু ূ ৃ অক্ষরগুলির প্রচলিত রূপ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র করিবার কোন হেতু নাই। এগুলিকে ব্যঞ্জনাক্ষরের সমান বড় করিলে সুন্দর হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় সংযুক্ত দীর্ঘ ৠ কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহার নিমিত্ত একটা পৃথক অক্ষর না রাখিয়া দুইটা ৃ পরে পরে লিখিয়া দীর্ঘ জানাইতে পারা যাইবে।

সঙ্কেত—১। যাবতীয় সংযোজ্য স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পরে বসিবে, পূর্বে নয়। বর্তমানে ১০টি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের মধ্যে ৫টি (া, ী, ু, ূ, ৃ) ব্যঞ্জনের পরে বসিতেছে। ৩টি পূর্বে (ি, ে, ৈ) ও ২টি (ো, ৌ)

অর্ধেক পূর্বে অর্ধেক পরে বসে। আমরা ব্যঞ্জনের পরে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি। যথা—ক+ু=কু। অতএব পরে লেখাই ঠিক।

গ। উপন্যস্ত—'ৈ' (ঈষৎ-ই)। মৌখিক ভাষায় শব্দের স্বরসংক্ষেপ ও স্বরলোপ ঘটে। ইদানীং কেহ কেহ মৌখিক ভাষা লিখিতেছেন। কিন্তু ইহার শব্দের শুদ্ধ বানান প্রচলিত হয় নাই। এই কারণে ঈষৎ-ই জ্ঞাপনের চিহ্ন উদ্ভাবিত হয় নাই৲। 'কলিকাতা' সংক্ষেপে 'কইলকাতা' কিন্তু 'ই' পূর্ণ নয়, ঈষৎ। এইরূপ, সে বকিবে—সে বইকবে, এখানেও ঈষৎ-ই। বহুকাল পূর্ব হইতে আমি এই বর্ণ জানাইবার নিমিত্ত 'ই' অক্ষরের হ্রস্বীকৃত শৃঙ্গ লিখিয়া আসিতেছি। ইহার কোন দোষ দেখিতে পাই না। ছাপায় ইহা সংযুক্ত ৈ অক্ষরের দক্ষিণাংশের শৃঙ্গ। আকারের সহিত যুক্ত হইয়া 'ঈষৎ-ই' অসংখ্য শব্দে শুনিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাকে 'আই' বলা যাইতে পারে। ই ও উ স্বর সংক্ষেপে 'ঈষৎ-ই' রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, চাউল—চা৲ল। দালি—দা৲ল বা ডা৲ল। ধাতু—ধা৲ত। মারি ধরি—মা৲র ধ৲র। রামশালি—রামশা৲ল। এইরূপ, পূর্ববঙ্গের ইন্দ্রশা৲ল ধান। গ্রামের নাম শ্রীকালী—শ্রীকা৲ল, টাঙ্গালি—টাঙ্গা৲ল ইত্যাদি। অক্ষর অভাবে পূর্ববঙ্গে পূর্ণ-ই লিখিত হইতেছে। এবং পশ্চিম বঙ্গে উচ্চারণে 'ঈষৎ-ই' থাকিলেও বানানে লুপ্ত হইতেছে। যে ধ্বনি আছে, তাহা বানানে প্রদর্শিত না হইলে সে বানান অশুদ্ধ।

কেহ কেহ ঈষৎ 'ই' জ্ঞাপনের নিমিত্ত উর্ধ্বকমা দিয়া থাকেন। ইংরেজীর অনুকরণে উর্ধ্বকমা আসিয়াছে। ইংরেজীতে শব্দের অক্ষর ও ধ্বনি লুপ্ত হইলে সে স্থানে উর্ধ্বকমা বসে। যেমন can't। কিন্তু বাঙ্গলায় ধ্বনি আছে। অতএব তুল্য হইল না। 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত পদের মৌখিকরূপে অন্ত্য য়-ফলা (ইঅ) প্রায় লুপ্ত হয়। যথা, চলিয়া—চল্যা—চল্যে, অন্ত্য য়-ফলা (ইঅ) লুপ্ত হইলে থাকে চলে'।

এখানে ল পরে উর্ধ্বকমা লিখিয়া গ্রস্ত য়-ফলা স্থাপিত হইতে পারে। কেহ কেহ "চ'লে" গেলেন। কিন্তু চ-এর পরে কোন অক্ষর বা ধ্বনি লুপ্ত হয় নাই। অতএব পদের উর্ধ্বকমা লেখাই যুক্তিসঙ্গত। উর্ধ্ব-কমা না বলিয়া উৎকলা বলা যাইবে।

৩। ব্যঞ্জনাক্ষর

ক। প্রচলিত রূপ—ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ। য় ড় ঢ়। (৩৬)

খ। সংস্কর্তব্য,—ত (৮), ভ (৯), য (১০), র (১১), য় (১৩), ড় (১৪), ঢ (১৫)।

যে যে অক্ষর দ্বারা একটি শব্দ লিখিত হয়, সে সে অক্ষরের মাথায় রেখা অর্থাৎ মাত্রা দ্বারা পরবর্তী শব্দ পৃথক করিতে হয়। যেমন 'রাম বনবাসে গেলেন,' তিনটি পৃথক মাত্রা দ্বারা তিনটি পৃথক শব্দ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বর্তমান ছাপার ত ও ভ বৃন্তহীন ; মাত্রার নীচে নিরলম্ব থাকে। পূর্বে হাতে লেখা পুথীতে এরূপ ছিল না। অদ্যাপি কেহ কেহ সবৃন্ত ত ও ভ লেখেন। তাহাই ঠিক। অতএব ত-স্থানে সবৃন্ত ত এবং ভ স্থানে সবৃন্ত ভ হইলে যুক্তিসঙ্গত হয়। এই দুই অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষর যুক্ত করিতে হইলে মাত্রার সহিত যুক্ত হইবে। যেমন, তা, ভা। এ কারণেও ত ও ভ সবৃন্ত করা যুক্তিসঙ্গত।

যে 'য' হইতে য-ফলা (্য) আসিয়াছে, সে 'য' বর্তমান 'য' নয়। দুইটি অক্ষর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান 'যা'তে চারিটি ঋজুরেখা আছে। পূর্বকালের 'য'তে প্রথম দুই ঋজুরেখার স্থলে একটি তরঙ্গ থাকিত। ফলার 'য'তে এবং নাগরীতে সেইরূপ আছে। নবলিপিতে য-ফলা একটি নূতন অক্ষর থাকিবে না। 'য়' অক্ষর দ্বারাই য-ফলা

বুঝিতে পারা যাইবে এইজন্য ‘য’ অক্ষরের আকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইল।

র। পূর্বকালে ব-এ শূন্য র ছিল না, পেটকাটা র ছিল। সে র অক্ষরও ব-এর মত ছিল না, নাগরী র-এর মত ছিল। বোধহয় সে অক্ষরে পেটকাটা সহজে দেখিতে পাওয়া যাইত না, বিন্দুর আকার ধরিয়াছিল। সে বিন্দু এখন ব-এর তলে আসিয়াছে। ব ও র উচ্চারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন; আকারেও এই দুই মত ভিন্ন হয়, ততই ভাল। র-স্থানে নাগরী र অপর বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত মিশিতে পারে। এই কারণে আমি র-স্থানে নাগরী र গ্রহণ করিতে বলি। বিন্দু দিতে গেলেই কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়; এই দোষও সংশোধিত হইবে। এই দোষ য় ড় ঢ় এই তিন অক্ষরেও আছে। ইহাদের নীচের বিন্দু অক্লেশে ইহাদের অবয়বে জুড়িয়া দিতে পারা যায়। ড় ঢ় উচ্চারণ করিতে অসংখ্য নরনারী কষ্টবোধ করে। কালে ড় ঢ় উঠিয়া গেলে কোন ক্ষতি হইবে না। বস্তুতঃ, য়, ড়, ঢ় শত বৎসর পূর্বে ছিল না।

গ। উপন্যস্ত,—অন্তঃস্থ-ব (১২)। বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব আকারে ও উচ্চারণে এক হইয়া গিয়াছে। একটি কাটিয়া দিলে ভাষায় অভাব ঘটে না। কিন্তু ব-ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইলেও ব চাই। অন্তঃস্থ-ব-এর উচ্চারণ পুনরুদ্ধার করা কঠিন। কিন্তু নবলিপিতে অন্তঃস্থ-ব আনিতে হইতেছে। নচেৎ ফলার ব পাওয়া যায় না। ‘উদ্‌বাহু’ স্বচ্ছন্দে পড়িতে ও বুঝিতে পারি; কিন্তু ‘গৃহদ্‌বার’ লিখিলে পড়িতে ও বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী ও ইংরেজী শব্দ লিখিতে অন্তঃস্থ-ব আবশ্যক হয়। আসামীতে অন্তঃ-ব বর্গীয়-ব এর তলে রেখা দিয়া ৱ লেখা হয়। কিন্তু এই ৱ লিখিতে গেলে কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয় ও রেখা দিতে গেলেই অক্ষরটি কিছু ছোট হয়। নাগরী অন্তঃস্থ-ব বৃত্তাকার; ইহাতে বাঙ্গলা অক্ষরের কোণ নাই; সে ব অন্য অক্ষরের

সহিত মিশিতে পারে না। নাগরী অন্তঃস্থ-ব ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া বাঙ্গলায় সকোণ ব করিতে পারা যায়।

২। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর

ক্ষ (ক্খিঅ), জ্ঞ (গ্যঁ), ঙ্ক (ঙ্ক)। (৩)

বাঙ্গলা ভাষায় এই তিন অক্ষরের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর রাখিতে হইতেছে।

সঙ্কেত ২। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-মূলক ভাষায় একটি চমৎকার সঙ্কেত চলিয়া আসিতেছে ; ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত অকারান্ত। কিন্তু অন্য স্বরাক্ষর কিম্বা কোন ব্যঞ্জনাক্ষর যুক্ত হইলে সে অক্ষর হসন্ত হয়। যেমন, ক অকারান্ত, কিন্তু ক যুক্ত উ সন্ধি না হইয়া কু। ক যুক্ত ত কৃত। নবলিপিতে এই সঙ্কেত অবশ্যপালনীয়। মনে রাখিতে হইবে যাবতীয় সংযুক্তব্যঞ্জন স্বরান্ত। 'চন্দ্‌র' 'চন্দ্র' পড়িতে হইবে, 'চন্দর্‌' নয়। এই কারণে ইংরেজী park 'পার্‌ক্‌' লেখা উচিত, পার্ক বানান ভুল।

সঙ্কেত ৩। উক্ত তিন সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর ব্যতীত অন্য যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর লিখিবার সময় প্রথমাক্ষরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপরে একটি তির্যক্‌ যোগ-রেখা দিতে হইবে, যেন নীচের হস্‌ চিহ্ন উপরে বসিয়াছে। যেমন ভক্‌ত। এই যোগ-চিহ্নকে 'পাতী' বলা যাইবে, কারণ রেখাটি অক্ষরের মাথা হইতে নীচের দিকে আসে। ঙ, ছ, জ, ঞ, ত, ভ কয়েকটি অক্ষর ব্যতীত অন্য অক্ষর লিখিবার সময় কলমের এক টানে 'পাতী' আসিবে। কিন্তু ছাপায় একটি টাইপ পৃথক্‌ রাখিতে হইবে। পাতী নূতন নয় ; সংযুক্ত '৷' দেখুন।

নবলিপিতে 'ফলা' নাম নিরর্থক ও অনাবশ্যক 'য-ফলা' না বলিয়া 'ইঅ' বলাই ঠিক। 'তথ্য' বানান করিতে হইলে ত, থ, যুক্ত য় (ইঅ)

বলিতে হইবে। এইরূপ ত, ক যুক্ত র—তক্‌্র ; ত, র যুক্ত ক—তর্‌্ক, ইত্যাদি। বাঙ্গলায় কয়েকটি ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। ব্যঞ্জন ও ফলা সমান বড় লিখিলে উচ্চারণ-দোষ সংশোধিত হইতে পারিবে। ইহা অল্প লাভ নয়। য়-ফলা সর্বত্র নষ্ট হয় নাই। দামিন্‌্যা গ্রামে কবিকঙ্কণের নিবাস ছিল। তদ্দেশবাসী অদ্যাপি 'দামিন্‌্যা' বলে, দামিন্না বলে না। বাঁকুড়া জেলায় নিরক্ষর জনেও য়-ফলা স্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই কারণে অদ্যাপি বাঁকুড়ায় কেহ কেহ 'করিআ' লেখেন। উচ্চারণ শুদ্ধ হইলে শব্দের বানান সহজ হইয়া পড়ে।

কোন কোন শব্দে হস্‌ চিহ্ন আবশ্যক হইতে পারে, যেমন 'দৈবাত্‌'। ইহার বিপরীত, কোন কোন শব্দের শেষাক্ষর অকারান্ত লিখিত হইলেও হসন্ত পড়িবার আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণ নিমিত্ত সে অক্ষরের নীচে দক্ষিণ কোণে একটি বিন্দু বসিবে। যেমন স্বস্তিক.। ইহা 'স্বস্তিক্‌' নয়। এইরূপ কোন কোন বাঙ্গলা শব্দেও বিন্দু আবশ্যক হয়। যেমন, কট.মট. চোখ। বিন্দুর অন্য প্রয়োজনও আছে। অনুস্বারের নীচে হস্‌ চিহ্ন অনাবশ্যক, যেমন ক°।

এইরূপে ৬৩টি অক্ষর পাইলাম। ইহাদের সহিত শৃঙ্গ, উৎকলা, পাতী, হস্‌চিহ্ন, বিন্দু, এই ৫টি চিহ্ন পাইলে লৈখিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ লিখিতে পারা যাইবে। ফলে অক্ষর-সংখ্যা প্রায় তিন ভাগের এক ভাগে দাঁড়াইবে।

এক্ষণে এই নবলিপির দোষগুণ আলোচনা করি। প্রথম দোষ, প্রথম প্রথম নবলিপি পড়িবার সময় বর্তমান লিপিতে অভ্যস্ত পাঠকের বাধ.বাধ. ঠেকিবে। পাঁচটি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের (ি, ে, ৈ, ো, ৌ) স্থান পরিবর্তনই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু একবার সঙ্কেতটি জানিলে আর সে বাধা থাকিবে না। দ্বিতীয় দোষ, যদি কোন বালক নবলিপিতে অভ্যস্ত হয়, সে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত বই পড়িতে পারিবে কি ?

যে অগণ্য বাঙ্গলা বই ছাপা হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে অমূল্য সাহিত্য আছে, সে সব এই বালকের অনধিগম্য হইবে না কি? এই আশঙ্কা গুরুতর নয়। কারণ প্রচলিত ৬৩টি অক্ষরের মধ্যে ৭।৮টি ব্যতীত অপর সমুদয় অক্ষর তাহার পরিচিত। সে অনেক শব্দও শিখিয়াছে। প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত শব্দের দুই-একটি অক্ষর পড়িলেই সে অপর অজ্ঞাত অক্ষরও অনুমান করিয়া লইতে পারিবে। এই ক্রমে আমরা পুরাতন পুথী পড়িয়া থাকি। তাহার সাহায্যের নিমিত্ত তাহার পাঠ্যপুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ক কা কি, ক কিঅ, আঙ্ক ও আঙ্ক, এই চারি শ্রেণীর অক্ষর ছাপিলে সে অক্লেশে উভয় লিপির ঐক্য করিতে পারিবে। এই নিমিত্ত কেহ কেহ ঈ, ূ, য, ও র এই চারি অক্ষরের আকার-পরিবর্তন চাহিবেন না। কিন্তু তদ্দ্বারা অধিক সুবিধা হইবে না। সংস্কার করিতে গেলে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হইবেই।

ইতিমধ্যে পাঠক নবলিপির গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন। যে শিশু দুই বৎসরের কমে প্রচলিত লিপি পড়িতে ও লিখিতে পারে না, সে নবলিপি তিন মাসে পড়িতে পারিবে। আর তিন মাসে হাত বশ করিতে পারিবে। শিক্ষক উপযুক্ত হইলে তাহাকে অসংখ্য শব্দের বানান মুখস্থ করিতে হইবে না। ('শিক্ষক' শব্দ দ্বারা শিক্ষিকাও বুঝিতে হইবে।) তিনি শিশুকে বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইবেন। জ য, ণ ন মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্য বর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণ অল্প চেষ্টাতেই হইবে। তিনি য়-অক্ষরের নাম 'ইঅ' শিখাইবেন। শিশু 'এক' শুনিবে, 'এক' লিখিবে, 'এ্যাক' বলিবে না; 'সত্য' শুনিবে, 'সত্য' লিখিবে, 'সোত্ত' বলিবে না। 'পদ্ম' শুনিবে', 'পদ্‌ম' লিখিবে ইত্যাদি। সে বড় হইয়া শব্দের বিকৃত উচ্চারণ শুনিবে, কিন্তু প্রথম সংস্কার নিশ্চয় স্থায়ী হইবে। সে মৌখিক ভাষা শিখিবে না; কারণ মৌখিক ভাষার স্থিরতা নাই। স্থানভেদে, নরনারীভেদে, শিক্ষাভেদে, বৃত্তিভেদে

মৌখিক শব্দের রূপান্তর হয়। যেমন,—চিঁড়ে, পিঠে, হিসেব-নিকেশ, ভেতর-ওপর, গোণাগুণতি, চার (৪), বোঁচকা-বুঁচকী, নতুন, বাঙলা, বাঙালী, রাত্তির, চন্দর ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ছিনু, ছিলুম, ছিলেম, ছিল্যম, ছিলাম ইত্যাদি ক্রিয়াপদে প্রভেদ আছে। শিশু, 'সসী,' 'সস্ত', 'অতীৎ,' 'অমৃৎ', 'তৃণ' ইত্যাদি ভাষা-দোষ পরিত্যাগ করিবে।

আগুশিক্ষা অবশ্যক করিতে হইলে পূর্বকালের পাঠশালা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। শিশু ঘরের মেঝের তালচাটিতে বসিবে। কঞ্চির বা শরের কলম পাঁচ আঙ্গুলে মুঠা করিয়া ধরিবে, মসীতে তাল পাতায় লিখিবে। ছয় মাস পরে, কেহ বা এক বৎসর পরে কাগজ ধরিবে। তখন পাঠশালা হইতে শিশু একখানি পাতলা কাঠের মসৃণ পাটা পাইবে। পাটার উপরে কাগজ রাখিয়া পাটা কোলে ধরিয়া লিখিবে। অ আ লিখিবে, অ আ পড়িবে। প্রথম তিন মাস তাহার বই নাই; বর্ণ ও অক্ষর পরিচয়ের পরে ছাপা বই পাইবে। সে বইএ বড় ও মোটা অক্ষরে পুরু কাগজে নবলিপির অক্ষরমালা ও ছোট ছোট শব্দ থাকিবে। বলা বাহুল্য আগুশিক্ষার সমুদয় পুস্তক এই লিপিতে ছাপিতে হইবে। আমার "শিক্ষাপ্রকল্পে" আগুশিক্ষার কাল ৭ বৎসর।

নবলিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপাখানার অভূতপূর্ব উন্নতি হইতে পারিবে। ছাপাখানায় ৬৩টি অক্ষর ও ৫টি চিহ্নের (শৃঙ্গ, পাতী, উৎকলা, বিন্দু, হস্ চিহ্ন) জন্য মোট ৬৮টি টাইপ রাখিলেই লৈখিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ ছাপিতে পারা যাইবে। শুনিলাম বর্তমানে ছোট প্রেসেও ১৬৮ অক্ষরের টাইপ রাখিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি বিরামাদি চিহ্ন রাখিতে হইবে। সে সকল চিহ্নের ইংরেজী নামের পরিবর্তে বাঙ্গলা নাম রাখিয়া ভাষার অন্তর্গত করিতে হইবে। এখানে নাম উপন্যস্ত করিলাম। যথা—

,—কলা। (কলা অর্থে চন্দ্রকলা, আর কলা অর্থে অংশ। এই বিরাম চিহ্নের আকার চন্দ্রকলার তুল্য। এতদ্দ্বারা বাক্যের ক্ষুদ্রাংশ পৃথক করা হয়।)

;—কলা বিন্দু।

’—উৎকলা অর্থাৎ উর্ধ্ব কলা।

‘—ব্যুৎকলা (একটো বা দুটো)। ইহার দক্ষিণেরটি ’ উৎকলা।

।—দাঁড়ি।

॥—দু-দাঁড়ি।

?—খড়্গা।

!—তিলক।

—রেখ।

(-)—লিক (বা° লিকি, স° লিক্ষা)।

বেষ্টনীর চিহ্ন—

( )—চাপ।

{ }—দীর্ঘ চাপ।

[ ]—বাহু।

*—তারা। এইরূপ দ্বিতারা, ত্রিতারা।

গণিতের ১, ২, ৩...দশ অঙ্ক; ৵০, ৶০, ৷০, ।০, ॥০, ৷৷০ ইত্যাদি চিহ্ন।

গণিত কর্মের চিহ্ন—

+—বজ্র (বজ্র ও হীরা একই অর্থ)।

×—হীরা (ইহা হইতে বা° ঢেরা; যেমন ঢেরা সই)।

/—বিপাতী (ভাজন চিহ্ন)।

=—দ্বিরেখ।

চিহ্নসংখ্যা মোট ৩৩। অক্ষর চিহ্ন মিলিয়া মোট ১০২টি টাইপ

থাকিলেই প্রেস চলিতে পারিবে। আর, ছোট, বড়, মোটা, গোদা নানা প্রমাণের অক্ষর রাখা স্বল্পব্যয় হইবে। একটা গোদা টাইপের অভাব পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়াছি। নাগরীতে মানুষের নামের ও গ্রন্থের নামের আগ্রক্ষর গোদা টাইপে ছাপা হইতে পারে। এক্ষণে সেরূপ টাইপ অক্লেশে পাওয়া যাইবে।

এখন 'টাইপার' নির্মাণ সুসাধ্য ও স্বল্পব্যয় হইবে। অচিরে অসংখ্য ইংরেজী 'টাইপার' অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে। সে সকল যন্ত্রের ইংরেজী টাইপ তুলিয়া বাঙ্গলা টাইপ বসাইতে পারা যায় কিনা, কারিকর চিন্তা করিবেন। সাধারণ টাইপারে ৮২টি টাইপ থাকে। বোধ হয় ৮২টি টাইপ দ্বারাই আবশ্যক অক্ষর ও চিহ্ন পাওয়া যাইবে।

নূতন অক্ষর

(১) ঈ — ঈ। (২) ি — ী। (৩) ৎ — ৎ। (৪) এ — এ। (৫) ‹ — ২। (৬) ে — ে। (৭) ৈ — ৈ। ো — ো। ৌ — ৌ। (৮) ত — ত। (৯) ভ — ভ। (১০) য — য। (১১) র — র। (১২) অন্তঃস্থ ব — ব। (১৩) য় — য়। (১৪) ড় — ড। (১৫) ঢ় — ঢ। শৃঙ্গ — ং। পাতী — ˋ।

নবলিপির আদর্শ

(১)

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্॥
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

(২) গরাসিত অবনী উথলে সিন্ধু গরজে কাঁপে হিয়া।
গণ্ডুষ তরে কুসুমভরা কত তাণ্ডবে তাথিয়া থিয়া॥
এন্তী ফুল-শর সুন্দর মদমত্ত লম্ফে, কম্পে ধরা।
জাগি উঠে তায় সমর-পীসন্তুদন লোচন দহন-ভরা॥

বাজে বই

মৌখিক ভাষা,—

বছর সাত আট আগে এক আশ্চর্য্য কান্ড হয়েছীল। সেদীন ভারী গরম, বেলা ১টা, বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছীল। হঠাত্ নীকটের মাঠ হ'তে মড-মড শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কত লোক ছুটে দেখতে গেল। আমী ৪ টার সময় গেলাম। তখনও ১০/১২ জন লোক দাঁড়ীয়ে। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো ছীল। তার নাম হরিশঙ্কর পাত্তর, ঘর অনেক দূরে। সে ব'লে যে এ আর নতুন কী? যীনী এই রকম আশ্চর্য্য করেছীলেন তীনী চলে গেলেন, জানীয়ে গেলেন। তানইলে ঠীক ১টার সময়, ১২ টা নয়, ২টা নয়, ১টার সময়; সবার নীচের ডাল, উপরের নয়, মাঝের নয়; অশত্থ গাছের কাঁচা ডাল, এই বোশেখ মাসে আজ ভাঙবে কেন?

— × —

—শেষ—